আরব্য রজনীর গল্প

প্রথম খণ্ড

রকিব হাসান

আ লো কি ত মা নু ষ চা ই

আরব্য রজনীর গল্প

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ ও সম্পাদনা
রকিব হাসান

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩২০

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
দুইশত আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0319-4

ভূমিকা

আরবি সাহিত্যের এক অনবদ্য সম্পদ আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা, অর্থাৎ হাজার এক রজনী। উপন্যাস আকারে সাজানো হলেও আলিফ লায়লা আসলে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা অসংখ্য গল্পের সঙ্কলন। ঘটনাকাল মোটামুটি ৭৬৩ থেকে ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ। তৎকালীন আরব সভ্যতার একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় এই গল্পগুলোর মাধ্যমে।

আরব দেশের বাইরে এই গল্পগুলোকে একত্র করে গ্রন্থের আকারে প্রথম পরিবেশন করেন এক ফরাসি পণ্ডিত অন্তনি গ্যালান্ড। ১৭০৪ সালে মোট ১২ খণ্ডে আলিফ লায়লার গ্যালান্ড সংস্করণ প্রকাশিত হতেই গোটা শিক্ষিত বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এই অপূর্ব ভাণ্ডারের প্রতি। ১৮০০ সালে পরিচ্ছন্ন ও বিস্তারিত আকারে নতুনভাবে প্রকাশিত হয় এ কাহিনী। তারপর ১৮৪১ সালে তারচেয়েও বিস্তারিতভাবে, আবার প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে কেউ নাম দিলেন অ্যারাবিয়ান নাইটস, কেউ থাউযান্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটস।

১৮৮৫-৮৬ সালে, স্যার রিচার্ড বার্টন-এর অনুবাদ করা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ভাষায় আরও অনেকে অনুবাদ করেছেন এই কাহিনীসম্ভার, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে ড. জে. সি. মারদ্রুসের সঙ্কলনটি।

আমাদের দেশে বাংলায় এখন পর্যন্ত আরব্য রজনীর যে কয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রায় সবই সংক্ষিপ্ত আকারে, ছোটদের জন্য।

এই প্রথমবারের মতো ড. মারদ্রুস ও স্যার রিচার্ড বার্টন, দুজনের সঙ্কলন থেকে বাছাই করে বিস্তারিতভাবে ৪ খণ্ডে রচিত হল **'আরব্য রজনীর গল্প'**। আলিফ লায়লা মূলত বড়দের কাহিনী। যদিও এর মধ্যেই রয়েছে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, সিন্দবাদ নাবিক-এর কাহিনীর মতো অসাধারণ সব কাহিনী। বাঙালি রুচি যাতে আহত না হয়, আবার আসল রচনার স্বাদও ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে, যতটা সম্ভব মার্জিত ভাষায় বইটি অনুবাদ করা হল।

রকিব হাসান

বইমেলা ফেব্রুয়ারি, ২০১১

সূচিপত্র

সূচনা	৯
গাধা, গরু আর মুরগি	১৫
সওদাগর আর আফ্রিদি দৈত্য	২১
প্রথম শেখের কাহিনী	২৩
দ্বিতীয় শেখের কাহিনী	২৮
তৃতীয় শেখের কাহিনী	৩৩
জেলে আর দৈত্য	৩৬
সুলতান ইয়ুনান, তার উজির আর হকিম রয়ান	৪১
সিনবাদ আর বাজপাখি	৪৫
শাহজাদা আর রাক্ষসী	৪৮
রঙিন মাছ	৫৪
সুলতানজাদার কাহিনী	৫৯
কুলি আর তিন কন্যা	৬৬
প্রথম কালান্দরের কাহিনী	৭৬
দ্বিতীয় কালান্দরের কাহিনী	৮১
তৃতীয় কালান্দরের কাহিনী	৯৫
বড় বোন জোবেদার কাহিনী	১১৪
মেজো বোন আমিনার কাহিনী	১২৪
তিনটি আপেল	১৩৩
নূর আল-দিন আলি এবং তার ছেলে	১৪১
চিনের কুঁজো	১৮৬
খ্রিস্টানের কাহিনী	১৯৩

সূচনা

অনেকদিন আগের কথা। প্রাচ্যের এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন এক প্রবল প্রতাপ বাদশাহ। উজির-সভাসদ, পাত্রমিত্র, সৈন্য-সামন্ত, গোলাম নফর কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। শসন বংশের এই বাদশাহর ছিল দুই ছেলে।

বড় ছেলেটি লম্বা ও চওড়া, সুঠামদেহী। ছোটটি বেঁটেখাটো। দুজনেই যোদ্ধা। দুজনেই দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার। তবে ছোটর চেয়ে বড় ভাইয়ের বুদ্ধি কিছু বেশি। প্রজাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ দরদ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। কাজেই, প্রজারাও খুবই ভালোবাসে তাকে। তার নাম শারিয়ার।

ছোট ভাইয়ের নাম শাহজামান। শাসন করে সমরখন্দের আল-আজম প্রদেশ। তার প্রজারাও তাকে ভালোবাসে।

কেটে গেল রাজত্বের দীর্ঘ কুড়ি বছর। দুই ভাইয়েরই দারুণ নাম-ডাক, খ্যাতি প্রতিপত্তি। কিন্তু অনেকদিন ধরে দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ভাইকে দেখার জন্য এক সময় উতলা হয়ে উঠল শারিয়ারের মন। উজিরকে ডেকে ভাইয়ের কাছে যাবার আদেশ দিল সে। বলল, যেভাবেই হোক যেন শাহজামানকে নিয়ে আসে উজির।

লোকলস্কর, সিপাই-সান্ত্রী নিয়ে রওনা হয়ে গেল উজির। আল্লার রহমতে নিরাপদেই এসে পৌছুল শাহজামানের দরবারে। পেশ করল শারিয়ারের ইচ্ছে।

বড় ভাই দেখতে চান তাকে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল শাহজামান। সাজ সাজ রব পড়ে গেল তার প্রাসাদে। তাঁবু, উট, গাধা খচ্চর নেয়া হল। বাছাই করে সঙ্গে নেয়া হল গোলাম, নেয়া হল পালোয়ান। নিজের উজিরের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিয়ে রওনা হল শাহজামান।

অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। রাত দুই প্রহর। এই সময় শাহজামানের মনে পড়ল, ভাইয়ের জন্য বাছাই করে রাখা উপহারটা সঙ্গে নেয়া হয়নি। আবার ফিরতে হল প্রাসাদে। হারেমে ঢুকে সোজা চলে এল খাস বেগমের ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল শাহজামান। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। চোখের সামনে আঁধার হয়ে গেল যেন দুনিয়া। কুচকুচে কালো এক নিগ্রো গোলামকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে তার বেগম। শাহজামান ভাবছে হায় খোদা, একি দেখালে আমাকে! মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল প্রাসাদ ছেড়ে গেছি, এর মাঝেই এই কাণ্ড! আর সহ্য করতে পারল না সে। কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মেরে ফেলল দুজনকে। তারপর বেরিয়ে পড়ল আবার।

দুই দিন দুই রাত চলার পরে শারিয়ারের দরবারে পৌঁছল শাহজামানের কাফেলা। ভাইকে দেখে আনন্দে নেচে উঠল শারিয়ার। সোজা এসে বুকে টেনে নিল শাহজামানকে। উহ্ কতদিন পরে দেখা! কত কথা জমে আছে বুকের ভিতর। সব যেন একবারে উগরে দিতে চায় শারিয়ার। হৈ-চৈ কাণ্ড পড়ে গেল তার প্রাসাদে।

কিন্তু শাহজামানের মুখে হাসি নেই। ভাইয়ের আনন্দে ভাগিদার হতে পারছে না সে। কোনোরকমে হুঁ-হ্যাঁ করে বড় ভাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল। তার মনে এক চিন্তা, দুনিয়ায় বিশ্বাস-ভালোবাসার কি কোনো দাম নেই?

ভাইয়ের চিন্তিত শুকনো মুখ দেখে শারিয়ার ভাবল, দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে কাহিল হয়ে পড়েছে শাহজামান। কে জানে, দেশের জন্যও নানারকম চিন্তা হতে পারে। তাই শাহজামানকে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিতে বলে চলে গেল।

পরদিন সকালে এসে শাহজামানের অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখল না শারিয়ার। রাতে প্রায় কিছুই খায়নি। জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছে, শাহজামান? কাল থেকেই দেখছি, কী যেন ভাবছ। মুখ-চোখ শুকনো, হাসি নেই। কী ব্যাপার, আমাকে বল তো।

শাহজামান বলল, তোমাকে কী করে বলি ভাইয়া। বড় শরমের কথা।

ছোট ভাইয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা ভালো মনে করল না শারিয়ার। তাই চুপ করে গেল। ভাইকে খুশি করার জন্য বলল, এক কাজ করি। চল শিকারে যাই। দেখো, মন ভালো হয়ে যাবে।

হবে না, ভাইয়া। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। তুমি একাই যাও।

বেশি চাপাচাপি করল না আর শারিয়ার। দলবল নিয়ে একাই শিকারে বেরোল।

ঘরে বসে রইল শাহজামান। জানালার পাশে চুপচাপ বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছে। এখানে বসে ওপাশের বাগান দেখা যায়। নানা ফুলের গাছ বাগানে। মাঝখানে শানবাঁধানো বিশাল এক চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার মাঝখানে পানির ফোয়ারা। অনবরত পানি ঝরছে। চমৎকার দৃশ্য।

হঠাৎ প্রাসাদের পিছনের দরজা খুলে যেতে দেখল শাহজামান। হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে এল কুড়িজন দাসী, একুশজন দাস। তাদের সঙ্গে রয়েছে স্বয়ং বেগম, শারিয়ারের স্ত্রী। জোড়ায় জোড়ায় গিয়ে বাগানের এখানে ওখানে বসল দাসদাসীরা। বেগম ডাকল, মাসুদ, ও মাসুদ!

দৈত্যের মতো এক নিগ্রো গোলাম ছুটে এল বেগমের কাছে। দুহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল তাকে। বেগমের ইঙ্গিতে দাসদাসীরাও একই খেলায় মেতে উঠল।

অবাক হলেও এই দৃশ্য দেখে একটু সান্ত্বনা পেল শাহজামান। হায় হায়, ভাইয়ের কপালও তো দেখছি আমারই মতো, ভাবল সে। একাই সে দুর্ভাগা নয়, বুঝতে পেরে বুকের ভার একটু হালকা হল তার। চাকরকে ডেকে খাবার দিতে বলল। খেয়েদেয়ে গেলাসে মদ ঢেলে চুমুক দিতে লাগল ধীরে ধীরে।

শিকার শেষে ফিরে এল শারিয়ার। প্রথমেই ভাইয়ের কুশল জানতে গেল। দেখল, বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠেছে শাহজামান। দেখে খুশি হল বড় ভাই।

পরদিন সকালে নাস্তার পর কথা তুলল শারিয়ার। আচ্ছা, ভাই, এবার বলবে কী তোমার কথা? কেন এমন চিন্তিত ছিলে? কী করেই-বা হঠাৎ আবার ভাবনাটা কাটিয়ে উঠলে?

শাহজামান বলল, ঠিক আছে। না শুনে যখন ছাড়বেই না, তো শোন। তোমার উজিরের মুখে তোমার সংবাদ শুনে আনন্দে নেচে উঠলাম। সবকিছু গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়লাম। রাতে, হঠাৎ মনে পড়ল তোমার জন্য উপহার নেয়া হয়নি। আবার ফিরে গেলাম প্রাসাদে। যা দেখলাম ভাইয়া, কী আর বলব তোমাকে? আমার খাটে আমারই নিগ্রো চাকরের সঙ্গে শুয়ে আছে আমার বেগম। মাথায় খুন চেপে গেল। তলোয়ারের কোপে দুটোকেই খতম করে দিলাম। তুমিই বল ভাই, এরপর কারো মন ভালো থাকে?

স্তব্ধ হয়ে শুনল শারিয়ার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, এবার বল, মন ভালো হল কী করে?

সেকথা তুমি জানতে চেয়ো না, ভাইয়া। বলতে বাধছে আমার। শুনে তুমি আমারই মতো কষ্ট পাবে।

তবুও তুমি বল।

বলল শাহজামান। শুনে চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল শারিয়ার। কথা সরছে না মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, নিজের চোখে সব দেখতে চাই আমি।

আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না তুমি, ভাইয়া। বেশ, নিজের চোখেই দেখো। এক কাজ কর। ঘোষণা করে দাও, আবার শিকারে যাচ্ছো তুমি। রাতের বেলা কোনো এক ছুতোয় ফিরে আসবে প্রাসাদে। কেউ যেন জানতে না পারে।

আবার শিকারে চলল শারিয়ার। সঙ্গে নিল তার দুই বিশ্বস্ত গোলামকে। চলতে চলতেই রাত নামল। বিশ্রামের জন্য থামল সবাই। তাঁবু খাটানো হল। রাত নিঝুম হলে দুই চাকরকে ডেকে বলল শারিয়ার, আমি প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি। খবরদার, কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে। কেউ দেখা করতে এলে সোজা ভাগিয়ে দিবি। বুঝলি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিল দুই চাকর।

ফকিরের ছদ্মবেশে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল শারিয়ার। দ্রুত হেঁটে চলল। প্রাসাদের খিড়কির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কেউ নেই দেখে টুক করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। সোজা চলে এল শাহজামানের ঘরে। জানালার পাশে বসে বাগানের দিকে চেয়ে বসে রইল দুই ভাই।

রাত আরও গভীর হল। ওরা বেরোল। আগের বারের মতোই কুড়িজন দাসী আর একুশজন দাস। বেগমও এল। তারপর যা ঘটল, নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না শারিয়ার। ঘৃণায় রি রি করে উঠল সারা শরীর।

ভোর রাতের দিকে হারেমে ফিরে গেল দলটা।

ভীষণ মন খারাপ করে ভাইকে বলল শারিয়ার, এই নরকে আর এক মুহূর্তও না, ভাই। চল দেশান্তরী হই। চল, এমন কোথাও চলে যাই, যেখানে এসব অনাচার নেই, প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতা নেই। চল।

তাই চল। এইসব প্রতারণার শিকার হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো, শাহজামান বলল।

রাত পোহাবার আগেই খিড়কির দরজা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল দুই ভাই।

দিন যায়, রাত পোহায়। দুই ভাই চলছে, চলছে। খাওয়া আর বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া থামে না। এমনিভাবে চলে চলে এক সাগরের কূলে পৌঁছল তারা। আশপাশে লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। কাছেই একটা বটগাছ দেখে তার তলায় গিয়ে জিরোতে বসল।

হঠাৎই চোখে পড়ল তাদের, সাগরের মাঝখানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে বিশাল এক আফ্রিদি দৈত্য বেরিয়ে এল ধোঁয়ার ভিতর থেকে। ব্যাপার দেখে দুই ভাইয়ের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। তীরের দিকেই এগিয়ে আসছে দৈত্যটা। উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে গেল তারা।

তীরে এসে লম্বা লম্বা পা ফেলে গাছটার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল দৈত্যটা। ভয়ে বুক টিপ টিপ করছে দুই ভাইয়ের। আরও কাছে এলে দেখা গেল দৈত্যের মাথায় বিরাট এক বাক্স। গাছের তলায় এসে বাক্সটা নামিয়ে বসে পড়ল সে। বাক্সের ভিতর থেকে বের করল একটা লোহার সিন্দুক। সিন্দুকের ডালা তুলতেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক পরমা সুন্দরী যুবতী। তার রূপের ছটায় ঝলমল করে উঠল যেন গাছের তলাটা।

রূপসীর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল দৈত্যটা। আদর করে বলল, সোনামানিক আমার, তোমাকে নিয়ে কত মরুভূমি পাহাড় জঙ্গল সাগর ঘুরলাম। বড় কাহিল হয়ে পড়েছি। ঘুমে চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছি না। এস, তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমোই।

খানিক পরেই নাক ডাকানো শুরু হল দৈত্যের। একা বসে বসে উসখুস করছে মেয়েটা। এদিকে চায়, ওদিকে চায়। হঠাৎ গাছের ডালে বসা দুই ভাইয়ের ওপর চোখ পড়ল তার। আস্তে করে দৈত্যের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। ইশারায় ডাকল দুই ভাইকে। আকার-ইঙ্গিতে বোঝাল দৈত্যের ঘুম এখন ভাঙবে না। তারা নিশ্চিন্তে নামতে পারে গাছ থেকে।

আল্লাহ, এ কী বিপদে ফেললে। ভাবল দুই ভাই। হাতজোড় করে মাপ চাইল মেয়েটার কাছে। ইশারায় জানাল, নিচে নামতে পারবে না। তাহলে ওদের দুজনকেই মেরে ফেলবে দৈত্য।

আরও কিছুক্ষণ কাকুতি মিনতি করল মেয়েটা। কিন্তু নামতে রাজি হল না দুই ভাই। শেষে রেগে গেল যুবতী। বলল, এখুনি নেমে না এলে দৈত্যকে ডাকব। গলা টিপে মারবে তোমাদেরকে দৈত্য।

গাছের ডালে বসে অসহায়ের মতো পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই ভাই। কে আগে নামবে এই নিয়ে চলল তর্কাতর্কি।

অপেক্ষা করতে করতে শেষে খেপে উঠল যুবতী। চোখ পাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, জলদি আসবে তো এস, নইলে দিলাম দৈত্যকে ডাক।

আর ঠেলাঠেলি করল না দুই ভাই। দৈত্যের ভয়ে নেমে এল। যুবতী তাদেরকে যা করতে বলল, তা-ই করল।

সেমিজের পকেট থেকে একটা ছোট্ট থলে বের করল যুবতী। থলের ভিতর থেকে বের করল একটা আংটির ছড়া। বলল, এখানে একশো সত্তরটা আংটি আছে। এই ব্যাটা আফ্রিদিকে ফাঁকি দিয়ে যাদের যাদের আমার কথা শুনতে বাধ্য করেছি, সবার কাছ থেকেই একটা করে আংটি চেয়ে নিয়েছি। ওদের স্মৃতিচিহ্ন। তোমরাও দুটো আংটি দাও। রেখে দেব।

স্তব্ধ হয়ে গেল দুই ভাই। নীরবে একটা করে আংটি তুলে দিল যুবতীর হাতে।

মেয়েটা বলল, জানো, এই শয়তান আফ্রিদি বিয়ের আসর থেকে চুরি করে তুলে এনেছে আমাকে। তারপর লোহার সিন্দুকে বন্দি করে সিন্দুকটা বাক্সে ভরে আমাকে নিয়ে ঘুরেছে মরুভূমি-পাহাড়-জঙ্গলে। কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। শেষে চলে গেছে সাগরের তলায়। পানির তলায় গিয়ে পুরুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে আমাকে। কিন্তু পেরেছে কি? ওই হাঁদারাম তো জানে না, আমরা মেয়েরা যা চাই, ছলে-বলে-কৌশলে তা আদায় করে নিই।

হুঁশ হল দুই ভাইয়ের। আরে তাই তো! লোহার কারাগারে বন্দি হয়ে, সারাক্ষণ দৈত্যের পাহারায় থেকেও দিব্যি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই সুন্দরী। কিছুতেই তাকে আটকে রাখতে পারছে না দৈত্য। এর তুলনায় তাদের বেগমরা তো একেবারেই স্বাধীন। মনে মনে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়ে তখনি যার যার শহরে ফিরে চলল দুই ভাই।

প্রাসাদে ঢুকেই নিজের হাতে বেগমের কল্লা কাটল শারিয়ার। জল্লাদকে ডেকে বেগম সহ হারেমের সমস্ত দাস-দাসীদের ধরে কোতল করার আদেশ দিল। তারপর ডাকল উজিরকে। বলল, আজ থেকে রোজ সন্ধ্যায় একটা করে কুমারী মেয়ে এনে দিতে হবে আমাকে। এক রাতের জন্য বিয়ে করব তাকে। পরদিন সকালে নিজের হাতে তার গর্দান নেব, যাতে অন্য কোনো পুরুষের স্পর্শ আর না পায় কোনোদিন।

বাদশাহর হুকুম। রোজ সন্ধ্যায় একজন করে কুমারী মেয়ে ধরে আনে উজির। রাতে বাদশাহর ঘরে থাকে, সকালে উঠে মেয়েটার গর্দান যায়। এমনি করে পেরিয়ে গেল তিন-তিনটি বছর। সারা দেশে দারুণ আতঙ্ক। কুমারী মেয়ে যাদের ঘরে আছে

তারা দেশান্তরী হতে লাগল। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল। যারা পালাতে পারল না, তাদের মেয়েরা বাদশাহর নারকীয় নিষ্ঠুরতার শিকার হল। প্রজারা যাকে একদিন রীতিমতো শ্রদ্ধা করত, সেই বাদশাহর নাম শুনলে এখন ঘৃণায় থুতু ফেলে মাটিতে। তার সর্বনাশ, তার মরণ কামনা করে।

একে একে শেষ হয়ে গেল দেশের যত কুমারী কন্যা। শেষে একদিন সারা দেশ খুঁজেও একটা কুমারী মেয়ে জোগাড় হল না। শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে এল উজির। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, চেহারা মলিন। খালি হাতে বাদশাহর সামনে গেলেই গর্দান যাবে তার। বসে বসে ভাবতে থাকে উজির।

দুই কন্যা আছে উজিরের। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বড় মেয়েটির নাম শাহরাজাদ। বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ, শিক্ষিতা। নবাব বাদশাহদের ইতিহাস, কাহিনী তার মুখস্থ। হাজারো গল্প গাথা পড়েছে, শুনেছে। ব্যবহার অত্যন্ত নরম। গলাও তার খুবই ভালো, চমৎকার গান গাইতে পারে।

উজিরের ছোট মেয়ের নাম দুনিয়াজাদ।

বাপকে চিন্তিত দেখে এগিয়ে এল শাহরাজাদ। জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, আব্বাজান? আপনাকে বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে? কোনো বিপদ আপদ হয়েছে?

বিপদই মা, বড় বিপদ। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল উজির।

কী বিপদ,আব্বাজান, আমাকে খুলে বলুন। আপনিই-না আমাদের শিখিয়েছেন, সুখ-দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। বিপদে কাতর হয়ে ভেঙে পড়তে নেই।

মেয়ের কথায় একটু সান্ত্বনা পেল উজির। খুলে বলল সব কথা।

আল্লাহ ভরসা, আব্বাজান, শুনে বলল শাহরাজাদ। আজ রাতেই শারিয়ারের সঙ্গে আমার বিয়ে পড়িয়ে দিন। মরতে তো একদিন হবেই। আমার মওতের সময় হলে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। আর কপালে মরণ না থাকলে বাদশাহর সাধ্য নেই আমাকে মারে।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে দোয়া করল উজির। আল্লাহ তোর ভালো করবেন, মা। তবে একটা কথা, এই বিপদের সময় বাদশাহর কাছে তোর আসল পরিচয় দিস না।

ঠিক আছে, আব্বাজান, দেব না।

হ্যাঁ, একটা গল্প বলছি, মা, শোন, বলল উজির। গাধা আর গরুর গল্প...

গাধা, গরু আর মুরগি

অনেক, অনেক দিন আগে এক নদীর ধারে বাস করত এক ধনী চাষি। বিরাট বিশাল ফসলের ক্ষেতের মালিক ছিল সে। আর ছিল অনেক মেষ-ছাগল ইত্যাদি পশু। একটা গাধা আর একটা বলদও ছিল তার।

একদিন বলদটা গোয়ালে ঢুকে দেখে, যবের ভূষি মাখানো জাবনা খেয়ে পেটটা ঢাঁই করে, বিচালি পাতা গদির উপর শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে গাধা। তেমন কোনো কাজ নেই গাধাটার। রোজ তার পিঠে চড়ে খামারের চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে আসে মনিব, তারপরেই গাধার ছুটি। এরপর সারা দিন-রাত শুধু খাওয়া আর ঘুম।

বলদ ঘরে ঢুকতেই সাড়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল গাধার। দুঃখ করে বলদ বলল, কী সুখেই-না আছ তুমি, ভাই। খাচ্ছ দাচ্ছ আর ঘুমোচ্ছ আর খাও কী ভালো ভালো। এমন জিনিস চোখে দেখার ভাগ্যিও আমাদের নেই

এই সময় গোয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মনিব। পশু-পাখির ভাষা বুঝত সে। এক জিনের কাছে শিখেছিল। এ সব কথা কাউকে না জানাতে নিষেধ করে দিয়েছিল জিন। বলেছিল, অন্য কাউকে বলার সাথে সাথে মৃত্যু ঘটবে মনিবের। যাই হোক, বলদের কথা কানে যেতেই বাইরে বেড়ার আড়ালে কান পেতে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

বলদ বলছে, আমার মতো তোমাকে খেটে খেতে হয় না, ভাই। সারাদিন খেটে খেটে দেখো না কেমন হাড় জিরজিরে অবস্থা হয়েছে আমার। আর তোমার শরীরে যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে। তোমার তো সকালে শুধু একটুখানি কাজ। মনিবকে পিঠে নিয়ে ক্ষেতের চারপাশে ঘোরা। আর সেই ভোরে আমার কাঁধে যে জোয়াল চাপে, সাঁঝের আগে আর নামে না।

বলদের কথা শুনে গাধার খুব দুঃখ হল। বলল, শোন, এক ফন্দি শিখিয়ে দিই তোমাকে। কাল সকালে চাকরটা তোমাকে নিয়ে যেতে এলে কিছুতেই যাবে না। খুব মারবে তোমাকে ব্যাটা। তা মারুক। উঠবে না তুমি। শেষে জোরজার করে যদি নিয়ে যায়ও, মাঠে গিয়ে কিছুতেই ঘাড়ে জোয়াল চাপাতে দেবে না। হয়তো জোর করেই চাপাবে। ব্যস, দু-এক পা এগিয়েই ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবে। নিশ্চয়ই আবার মার খাবে। সহ্য করে যাবে, কিন্তু মাটি থেকে উঠবে না। ওরা ভাববে তোমার অসুখ-বিসুখ করেছে। ছুটি দিয়ে দেবে তোমাকে।

কান পেতে বলদ আর গাধার সব কথাই শুনল মালিক।

পরদিন সকালে গাধার কথামতো অভিনয় করে গেল বলদ। অনেক মার খেল, কিন্তু তাকে দিয়ে জোয়াল বাওয়াতে পারল না চাকর।

বলদের কাজ কারবার সবই দেখল মনিব। মুচকি হাসল। চাকরকে বলল, বলদটার বোধহয় অসুখ করেছে। এক কাজ কর, ওটাকে গোয়ালে রেখে গাধাটাকে দিয়ে জোয়াল বাওয়া।

গাধাটাকে এনে জোয়াল পরাল চাকর। সারাদিন ঠাঠা রোদে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটাল সে গাধাকে দিয়ে। দিনের শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে গোয়ালে ফিরে এল গাধা।

দোয়া করল বলদ, আল্লাহ তোমার ভালো করবেন, ভাই। তোমার বুদ্ধিতেই একটু সুখের মুখ দেখলাম আজ।

কোনো কথা বলল না গাধা। গম্ভীর হয়ে রইল। মনে মনে পস্তাচ্ছে। নিজের বোকামির জন্যই এই নিদারুণ কষ্টে পড়েছে।

পরদিন সকালে এসে আবার গাধাটাকে ধরে নিয়ে গেল চাকর। হালে জুড়ল। কড়া রোদে আবার সারাদিন সেই হাড়ভাঙা খাটুনি। অভ্যেস নেই। অসহ্য ব্যথা হয়ে গেল সারা শরীরে, জোয়ালের ঘষায় ঘাড়ের ছাল উঠে গেল। ক্ষোভে-দুঃখে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল গাধার। মনে মনে আবার ফন্দি আঁটতে আঁটতে দিনের শেষে গোয়ালে এসে ঢুকল সে।

গোয়ালে ঢুকেই আগের দিনের মতো কোনো কথা না বলে খেয়েদেয়ে চুপটি করে গিয়ে শুয়ে পড়ল গাধা।

মুখ বাড়িয়ে ডাকল বলদ, আরে, গাধা ভাই, এসেই শুয়ে পড়লে যে? এস না একটু গল্পসল্প করি...

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল গাধা, কী আর গল্প করব রে, ভাই। কাল থেকে তো আর তোমাকে পাব না। যা শুনলাম আজ...

কী, কী শুনলে? আঁতকে উঠে বলল বলদ। আমাকে জবাই-টবাই করে ফেলবে না তো আবার...কী শুনেছ বল না, ভাই!

বেচে দেবে। কসাইয়ের কাছে। চাকরকে ডেকে বলছিল মনিব, বলদটা বোধহয় বাঁচবে না। মরে গেলে অনেকগুলো টাকা লোকসান যাবে। তারচেয়ে কসাইয়ের কাছেই বেচে দিই। মোটা তাগড়া আছে এখনও, বেশ ভালোই দাম পাওয়া যাবে...চাকরটাকে বোধহয় এতক্ষণে কসাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে মনিব। কালই আসবে কসাই। খবরটা মুখ ফুটে কী করে যে বলব তোমাকে, ভাবছিলাম...

বলে আমার কী যে উপকার করেছ তুমি, ভাই, কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল বলদ। তোমাকে যে কী বলে শুকরিয়া জানাব...কাল সকালে চাকরটা এলেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াব। বোঝাব, অসুখ-টসুখ কিচ্ছু নেই আমার। একেবারে ভালো হয়ে গেছি।

বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনল মালিক আজও। সে তো হেসেই বাঁচে না। হাসতে হাসতে নিজের ঘরে এসে ঢুকল সে।

স্বামীকে এমন নিজে নিজে হাসতে দেখে অবাক হল তার বৌ। জিজ্ঞেস করল, তোমার হল কী গো? এমন একা একা হাসছ যে? পাগল-টাগল হয়ে যাওনি তো।

আরে না না, পাগল হব কেন? একটা দারুণ মজার ব্যাপার ঘটেছে। শুনলে তুমি হাসতে হাসতেই মরবে। বলেই জিনের কথা মনে পড়ল লোকটার। বৌকে যদি এখন গাধা আর গরুর কথা বলে, বৌ জানতে চাইবে তার স্বামী ভাষা বুঝল কী করে। এক কথা দু'কথায় সব কথা বলতে হবে তখন বৌকে। নইলে তার যা বৌ, কোনোমতেই ছাড়বে না। সাবধান হয়ে গেল স্বামী। কী কাণ্ড ঘটেছে, বার বার স্বামীর কাছে জানতে চাইল বৌ। কিন্তু স্বামীর সেই এক জবাব। শুনলে তুমি হাসতে হাসতে মরে যাবে।

এটা কোনো কথা হল? বৌ ভাবল, আসলে তাকে নিয়েই কোনো কারণে হেসেছে তার স্বামী, এখন ভয় পেয়ে গিয়ে আর বলতে চাইছে না। কথাটা মনে হতেই রেগে আগুন হয়ে গেল বৌ। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গাইতে লাগল, তুমি আমাকে দেখে হাসছ। আমাকে ঠাট্টা করছ। আমাকে অক্কেলে আর তোমার ভালো লাগে না। গলায় দড়ি দেব আমি। কুয়োয় লাফিয়ে পড়ে মরব

অনেক করে বোঝাতে লাগল চাষি। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, বিবিজান। তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছি না আমি। খোদার কসম, অন্য কারণ আছে। তোমাকে সব বললে হাসতে হাসতেই মরে যাবে, এই ভয়ে শুধু বলছি না। বুড়ো হয়ে গেছি আমরা। তোমাকে নিয়ে একশো কুড়ি বছর ঘর করেছি। তুমি আমার চাচার মেয়ে, আমার ছেলেমেয়েদের মা, আমার আদরের বিবিজান। প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি। আমার কলিজা তুমি।

কিন্তু কার কথা কে শোনে? চাষির বৌয়ের একই কথা, তাকে নিয়ে হাসছে তার স্বামী।

শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল চাষি, না শুনে যখন ছাড়বেই না, তো কী আর করব! এক কাজ কর, মৌলভিদের খবর দাও। পাড়াপড়শিদের ডাকো। তাদের সামনেই বলব সব কথা। শেষে আবার খুনের দায়ে পড়তে চাই না।

ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি, মৌলানা-মৌলভিরা অনেক করে বোঝাল বৌটাকে: তোমার স্বামী এই বুড়ো বয়েসে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে যাবে কেন? আর তা ছাড়া তুমি যদি সত্যিই হাসতে হাসতে মরে যাও, এতবড় সংসার, এতগুলো ছেলেমেয়ে কে দেখাশোনা করবে? তোমার স্বামী বুড়ো মানুষ, একা হাতেই সামলে উঠতে পারবে না।

কিন্তু চাষির বৌয়ের সেই এক গোঁ। সব না শুনে সে ছাড়বে না। কথা শুনে হাসতে হাসতে আবার মারা যায় নাকি লোকে? সব মিথ্যে কথা। আসলে তাকে নিয়েই হেসেছে তার স্বামী।

চাষি বেচারা শেষে লোক ডেকে আগে থেকেই বৌয়ের জন্য একটা কবর খোঁড়াল। মনে তার ভারি দুঃখ। তার আদরের বৌটা শেষকালে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

বিশাল এক তাগড়া মোরগ ছিল মালিকের। মোরগটার হারেমে পঞ্চাশটা মুরগি। পরিবারের সবাই বেশ হাসিখুশি। মোরগের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই মুরগিদের। পঞ্চাশ বৌকে নিয়ে বেশ সুখে নেচেকুঁদে বেড়ায় মোরগ, খায়-দায়-ঘুমোয়। মনিবের দুঃখের খোজ রাখে না।

মোরগের এই ব্যবহারে খেপে গেল চাষির কুকুরটা। রেগে গিয়ে বলল, তুমি কেমন মোরগ হে? এদিকে শোকে দুঃখে মালিকের আমাদের খাওয়া-ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আর তুমি তারই খেয়ে তারই পরে, বৌ নিয়ে নাচছ। বলি লজ্জা-শরম বলেও তো কিছু একটা থাকতে হয়।

কুকুরের বকাবকিতে অবাক হল মোরগ। কুকুরকে বলল, তাই তো ভাই, কী হয়েছে আমাদের মনিবের? জানি না তো! একটু খুলে বল না।

চুপচাপ কুকুরের মুখে সব শুনল মোরগ। তারপর বলল, ও, এই কথা? এর জন্য মন এত খারাপ মনিবের? আসলে বেশি সাদাসিধে লোক তিনি। নইলে একটা বৌকে বাগ মানাতে পারেন না। আর আমি দেখো না, পঞ্চাশটা মুরগিকে কবজা করে রেখেছি। কারো কোনো অভিযোগ, কোনো গোলমাল নেই। এখন মনিব জামের ডাল দিয়ে আচ্ছা কয়েক ঘা যদি লাগাতে পারেন মনিবানিকে, দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাছেই বসেছিল চাষি। মোরগের কথা কানে যেতেই হুঁশ হল তার। আরে, তাই তো! মোরগটা তো মন্দ বলেনি। ঘুরে ঢুকে বৌকে বলল, তুমি আমার ঘরে যাও। কেন হেসেছি, সব বলব। বলেই বাগানের দিকে চলে গেল সে।

মোটা দেখে একটা জামের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিয়ে এল চাষি। নিজের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। বৌয়ের কাছে এসে এক ঘুসিতে মাটিতে ফেলে দিল তাকে। তারপর জামের লাঠি দিয়ে পিটাতে লাগল।

ওরে বাবারে! মেরে ফেলল রে! বাঁচাও রে! তোমার পায়ে পড়ি গো! বলে সমানে চেঁচাতে লাগল বৌ। কিন্তু চাষি কানেও নিল না বৌয়ের চেঁচানি। পিটিয়েই চলল সে। আর সহ্য করতে পারছে না বৌ। শেষমেশ স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। দোহাই তোমার! আমাকে আর মেরো না। তোমার হাসির কারণ আর জানতে চাই না! শুধু আমাকে ছেড়ে দাও। আর মেরো না! আর বেয়াড়াপনা করব না।

আর করবি না তো! মনে থাকবে? হাঁপাতে হাঁপাতে শাসাল চাষি।

না না, না করব না! দেখো, আর করব না!

মনে থাকে যেন! লাঠিটা হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দুপদাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চাষি।

খানিক পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল বৌটা। পাড়াপড়শি, লোকজনকে জানাল, সে আর কোনো কথা শুনতে চায় না। স্বামীর প্রতি আর কোনো সন্দেহ নেই তার। খুব খুশি সে।

শুনে আর সবাইও খুশি। যার যার বাড়িতে ফিরে গেল তারা। এরপর আরও বহুকাল সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করেছিল দুজনে।

দুনিয়াজাদও এসে বসেছে বড় বোনের পাশ ঘেঁষে। সে-ও গল্পটা শুনেছে। উজিরের কথা শেষ হতেই বলে উঠল দুবোন, বাহ্, চমৎকার তো। হাসছে ওরা।

আসলে গুছিয়ে বলতে পারলে, সব গল্পই ভালো। গল্প শোনার নেশা সব মানুষেরই আছে, তবে শোনার মতো করে বলতে পারা চাই, বলল উজির। শাহরাজাদকে বলল, কেন, গল্পটা বললাম বুঝতে পারছিস তো, মা?

ঘাড় কাত করল শাহরাজাদ। হ্যাঁ, আব্বাজান। বুঝেছি। তুমি ওঠো, আর দেরি কোরো না। বাদশাহর দরবারে নিয়ে চল আমাকে।

মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজতে বলে দরবারে চলে গেল উজির। শারিয়ারকে জানাল, কুমারী মেয়ে পাওয়া গেছে।

ছোট বোনকে বুঝিয়ে বলল শাহরাজাদ, এক রাতের বেগম হতে চলেছি। আমি তোকে ডেকে পাঠাব। যাবি। আমার কাছে গল্প শোনার আবদার ধরবি। দেখি, এরপর কিছু করতে পারি কিনা।

শারিয়ারের সঙ্গে শাহরাজাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সাজে অপূর্ব দেখাচ্ছে শাহরাজাদকে। কিন্তু তার রূপের দিকে চেয়েও দেখল না শারিয়ার। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শাহরাজাদ।

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল শারিয়ার, আহাহা, কাঁদছ কেন, সুন্দরী? কী হয়েছে। বাদশাহর বেগম হয়েছ, তোমার ভাবনা কী? বল কী চাই?

ছোট্ট একটা বোন আছে আমার, জাঁহাপনা। একেবারেই ছেলেমানুষ। আমাকে ছেড়ে কোনোদিন থাকেনি। আমার সঙ্গে ছাড়া ঘুমোয়নি। তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। তাকে পাশে নিয়ে ঘুমাতে মন চাইছে।

ও এই কথা? এ আর এমন কী। এখনি লোক পাঠাচ্ছি, তোমার বোনকে নিয়ে আসবে, শারিয়ার বলল।

খানিক পরেই এসে গেল দুনিয়াজাদ। বড় বোনকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে লাগল। আদর করে, চুমু খেয়ে তাকে শান্ত করল শাহরাজাদ। বোনের গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বলল, আপা, আজ গল্প বলবে না? রোজ রাতেই তো তোমার গল্প শুনি। কী সুন্দর করেই-না বল, আপা, তুমি! বল না, আজও একটা বল না!

আড়চোখে শারিয়ারের দিকে একবার তাকাল শাহরাজাদ। তাদের দুবোনের দিকেই তাকিয়ে আছে শারিয়ার।

রোজ রাত আর আজকের রাতে তফাৎ আছে, দুনিয়া. শাহরাজাদ বলল। এতদিন স্বাধীন ছিলাম, আজ বাদশার বেগম। তাঁর অনুমতি ছাড়া তো কিছুই করতে পারি না। তবে জাঁহাপনা যদি দয়া করে অনুমতি দেন...চুপ করে গেল সে।

কৌতূহল হল শারিয়ারের। কী এমন গল্প বলে শাহরাজাদ, যা শোনার জন্য তার বোন পাগল? বলল, ঠিক আছে, বল গল্প। শুনি। তবে সকালের আগেই শেষ করে ফেলবে। ঘুমোতে হবে আমাকে।

তাই হবে, জাঁহাপনা, বলে গল্প শুরু করল শাহরাজাদ :

সওদাগর আর আফ্রিদি দৈত্য

এক সময়ে ছিল এক কোটিপতি সওদাগর। সে সময়ে তার সমান ধনী দুনিয়ায় আর কেউ ছিল না। একদিন, বাণিজ্যের কাজে ঘোড়ায় চেপে চলেছিল সে। দুপুর হয়ে এল। মাথার উপরে উঠে এসেছে সূর্য। মাঠে ঘাটে রোদের কী তেজ! এই সময় বিশাল এক বটগাছ দেখে তার ছায়ায় এসে বিশ্রাম নিতে বসল সওদাগর।

খিদেও পেয়েছে সওদাগরের। খাবার সঙ্গেই আছে। পুঁটুলি খুলে চাপাতি, সবজি আর ফল বের করে খেল সে। তৃপ্তির ঢেকুর তুলল। তারপর সামনেই এক পাহাড়ি ঝরনায় মুখ-হাত ধুতে চলল।

হাতমুখ ধুয়ে, পানি খেয়ে ফিরেই সওদাগর দেখে বিরাট এক আফ্রিদি দৈত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে বিশাল শাণিত খড়্গটি ঝিকমিক করছে রোদে।

হুঙ্কার ছাড়ল দৈত্য, উঠে দাঁড়াও। তোমাকে খুন করব আমি!

ভয়ে কাঁপতে লাগল সওদাগর। জড়সড়ো হয়ে বলল, আ-আমার দোষ কী?

দোষ? আমার একমাত্র ছেলেকে হত্যা করেছ তুমি।

আমি হত্যা করেছি? কী করে?

ফল খেয়ে তার আঁটিটা ছুড়ে মেরেছিলে, গমগম করছে দৈত্যের গলা। তার আঘাতেই মারা গেছে আমার ধন। তোমাকে আমি রেহাই দেব না। প্রাণের বদলা প্রাণ আমি নেবই।

হাতজোড় করে আবেদন করল সওদাগর, তুমি দানবদের রাজা। তোমার ছেলেকে হত্যা করার ধৃষ্টতা আমার নেই। বিশ্বাস কর, না জেনে মেরেছি। ঠিক আছে, অন্যায় যখন করেছি, তার শাস্তিও মাথা পেতেই নেব। তবে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আমাকে কিছুদিনের সময় দাও। একবার দেশে যাব। আমার যত সহায়-সম্পত্তি আছে, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে তার একটা বিলিব্যবস্থা করেই আবার ফিরে আসব। তখন আমাকে কোতল কোরো তুমি। বিশ্বাস কর, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি আমি। জেনেশুনে কোনো পাপ করিনি। আমার কথা রাখব আমি।

বেশ যাও, বলে সওদাগরকে ছেড়ে দিল দৈত্য। কিন্তু কথা ঠিক থাকে যেন!

দেশে ফিরে এক এক করে সব কাজ শেষ করল সওদাগর। বিষয়সম্পত্তি যাকে যা দেবার, দানপত্র করে দিল। প্রয়োজনীয় সব কাজ শেষ করে আত্মীয়-স্বজন,

বৌ-বাচ্চাদের ডেকে দৈত্যের কথা সব খুলে বলল। সওদাগর সৎ লোক। তাকে ভালোবাসে সবাই। কেঁদে উঠল তারা। দৈত্যকে কথা দিয়েছে, কথা রাখবেই সওদাগর। একে একে সকলের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে আবার।

চলতে চলতে সেই বটগাছের নিচে পৌঁছল সওদাগর। গাছের তলায় বসে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে তার। এই সময় শিকলে বাঁধা একটা রামছাগলকে টানতে টানতে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল এক শেখ।

সওদাগরের কাছে এসে সেলাম জানাল শেখ। তারপর জিজ্ঞেস করল, এই দেও-দানবের রাজ্যে এভাবে গাছের তলে বসে কাঁদছ কেন তুমি, ভাই?

লোকটাকে সব খুলে বলল সওদাগর। শুনে শেখ তো অবাক। বলল, তোমার মতো সত্যবাদী লোককে নিশ্চয় রক্ষা করবেন আল্লা।

সওদাগরকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগল শেখ। এই সময়ে আরেক শেখ এসে হাজির হল সেখানে। তার সঙ্গে দুটো কুকুর। সওদাগরের কাহিনী সে-ও শুনল। সে-ও সওদাগরের সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল তাকে। এই সময় আরও এক শেখ এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে ছাই রঙের একটা মাদি খচ্চর। তারও একই প্রশ্ন। উত্তর শুনে, সে-ও সান্ত্বনা দিল সওদাগরকে।

ভীষণ গরম। রোদের তাপে তেতে উঠেছে পৃথিবী। হঠাৎ সামনের বালিতে ঘূর্ণিঝড় উঠল। আঁধার হয়ে এল চারদিক। আকাশের দিকে খাড়া উঠে গেল বালির বিশাল এক স্তম্ভ। চলতে চলতে বটগাছের একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল স্তম্ভটা। ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে বিশাল এক দৈত্যে পরিণত হল, হাতে সেই খড়গ। সওদাগরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল দৈত্য, কই হে,সওদাগর, এস। কাজ শেষ করে ফেলি। নইলে মনে শান্তি পাচ্ছি না।

মরণকে স্বীকার করেই এসেছে সওদাগর। তবু ভয়ে-আতঙ্কে কেঁদে উঠল। তার দুঃখে চোখে পানি এসে গেল তিন শেখেরও। দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল তারা। হাতজোড় করে প্রথম শেখ বলল, হে দৈত্যরাজ। আমার একটি আর্জি আছে। এই রামছাগলের গল্প শোনাব তোমাকে। যদি, ভালো লাগে, সওদাগরকে মাপ করে দিয়ো।

কৌতূহল হল দৈত্যের। বলল, বেশ, শোনাও। যদি আমার ভালো লাগে, তো সওদাগরের অপরাধের তিন ভাগের এক ভাগ মাপ করে দেব।

গল্প শুরু করল প্রথম শেখ :

প্রথম শেখের কাহিনী

এই যে রামছাগলটা দেখছ, এ কিন্তু আগে জানোয়ার ছিল না। এ হল আমার চাচার মেয়ে, আমার বিয়ে করা বিবি। তিরিশ বছর আমার সঙ্গে ঘর করেছে।

ছোটবেলায়ই জাদুবিদ্যা শেখে আমার বিবি। নানারকম জাদু দেখিয়ে কতদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছে আমাকে। ওকে আমি খুবই ভালোবাসতাম, কিন্তু কপাল খারাপ। কোন ছেলেপুলে হল না আমার বিবির গর্ভে। কিন্তু ছেলে আমার দরকার। তাই বাড়ির এক দাসীকে রক্ষিতা বানিয়ে তার গর্ভে একটা ছেলে পয়দা করলাম।

ছেলের পনেরো বছর বয়েসের সময় কাজের ধান্দায় একবার ভিন দেশে যেতে হল আমাকে। এই সুযোগে আমার বিবি জাদু করে ছেলেটাকে বাছুর আর তার মাকে গাই বানিয়ে ফেলল। কিছুদিন বাদে বাড়িতে ফিরে ছেলে আর তার মাকে দেখলাম না। বিবিকে জিজ্ঞেস করতেই কেঁদেকেটে অস্থির। বলল, হায় হায়, ওরা কি আর আছে গো! দাসীটা মরে গেছে। তাই মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়েছে বাছা আমার!

দারুণ দুঃখ পেলাম। মন একেবারে খারাপ হয়ে গেল। আড়ালে আবডালে বসে বসে ছেলেটার জন্য কাঁদি। দিন যায়, রাত পোহায়। দেখতে দেখতে কোরবানীর ঈদ এসে গেল। কোরবানী তো দিতেই হবে। তাই চাকরটাকে ডেকে গোয়াল থেকে একটা গাই ধরে আনতে বললাম।

গোয়াল থেকে গাই বের করল চাকর। একটা বড় ছুরি নিয়ে জবাই করতে গেলাম আমি। অবাক কাণ্ড! দেখি কী, গাইটার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরছে। অদ্ভুত রকম গোঙাচ্ছে। কেমন যেন মায়া হল। গাইটার গলায় ছুরি চালাতে পারলাম না। চাকরটার হাতে ছুরিটা দিয়ে বললাম, নে, তুই-ই জবাই কর। আমি পারব না। বলে চলে এলাম সেখান থেকে।

হায়রে, তখন কি আর জানতাম। ওই গাইটাই এককালে আমার দাসী, রক্ষিতা ছিল।

গাইটাকে জবাই করে ফেলল চাকর। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার। গাইটা মরার সঙ্গে সঙ্গে সেই দাসীতে পরিণত হল। ভয় পেয়ে ছুটে এসে আমাকে খবর দিল চাকরটা। গিয়ে দেখলাম ঠিকই। খুবই দুঃখ পেলাম। কিন্তু কিছু তো আর করার নেই।

চাকরটাকে ডেকে একটা বাছুর ধরে আনতে বললাম। একটা মোটাসোটা বাছুর ধরে আনল চাকর। ছুরি নিয়ে ওটার কাছে এগিয়ে এলাম। সে আরেক কাণ্ড! বাছুরটা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ওর চোখের দিকে তাকালাম। মনে হল কী যেন বলতে চায় বাছুরটা। আমি তো আর জানি না সে-ই আমার ছেলে।

গাইটা জবাই করতে হয়ে গেল দাসী, বাছুরটাকে জবাই করলে আবার কোন কাণ্ড হয়ে যায়। জবাই করব কিনা দ্বিধা করতে লাগলাম...

হঠাৎ মোরগ ডাকার শব্দে গল্প থামিয়ে দিল শাহরাজাদ।

দুনিয়াজাদ বলল, ওহ্, কী সুন্দর গল্প, আপা। আর কী মজা করেই-না বল তুমি! থামলে কেন, বল!

ভোর হয়ে গেছে, দুনিয়া, আজ আর না। জাঁহাপনা এখন ঘুমোবেন। তবে আগামী রাতে যদি বেঁচে থাকি, আবার বলব।

ঠিক আছে, বলে ঘুমিয়ে পড়ল দুনিয়াজাদ।

শারিয়ার ভাবল, দারুণ গল্প তো! শেষটা না শুনে মেরে ফেলব মেয়েটাকে? ভাবতে ভাবতেই শাহরাজাদকে কাছে টেনে নিল।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল শারিয়ারের। দরবারে ঢুকতে একটু দেরিই হয়ে গেল। উজির, আমির উমরাহ সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। কুর্নিশ করে সম্মান জানাল বাদশাহকে।

উজিরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক গোলাম। তার হাতে একটা সোনার থালা। পান্না দিয়ে চাপা দেয়া একটা তুলোট কাগজ রাখা আছে থালায়। হাত বাড়িয়ে পান্নাটা সরিয়ে তুলোট কাগজটা তুলে নিল উজির।

তুলোট কাগজে আসলে বাদশাহর ফরমান লেখা আছে। প্রতিদিন সকালে নিজের হাতে যে মেয়েকে হত্যা করে শারিয়ার, তারই নাম-ধাম-মৃত্যুদণ্ডের কথা লেখা থাকে কাগজে। রোজ সকালে বাদশাহ দরবারে এলে সেই তুলোট কাগজ পাঠ করে উজির, সবাইকে ফরমানের কথা জানায়, তারপর দৈনন্দিন দরবারের কাজ শুরু হয়।

উজির জানে, নিজের মেয়ের মরার খবরই পড়ে শোনাতে হবে আজ। দুচোখ পানিতে ভরে গেছে তার। তুলোট কাগজটা হাতে নিয়ে শারিয়ারের দিকে তাকাল। পড়বে কিনা নির্দেশ চাইছে বাদশাহর কাছে।

কিন্তু অবাক হল উজির। ইশারায় তাকে কাগজটা পড়তে নিষেধ করছে শারিয়ার। গত তিন বছরে আজ নিয়ম ভাঙল! তবে কি তার আদরের দুলালীকে হত্যা করেনি নির্মম বাদশাহ! এখনও তাহলে বেঁচে আছে শাহরাজাদ!

সারাদিন দরবার করল বাদশাহ। কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় ফিরে এল খাস মহলে।

রাতের বেলা আবার আবদার ধরল দুনিয়াজাদ, আপা, গল্পটা শেষ কর! তারপর কী হল? বাছুরটাকে জবাই করল শেখ?

জাঁহাপনার আদেশ না পেয়ে যে গল্প শুরু করতে পারছি না, বোন, আড়চোখে শারিয়ারের দিকে তাকাল শাহরাজাদ।

হাসল শারিয়ার। বলল, হয়েছে, হয়েছে, নাও শুরু কর এবার। আমারও শুনতে ইচ্ছে করছে।

শুরু করল শাহরাজাদ :

অবাক হয়ে প্রথম শেখের গল্প শুনছে দৈত্য।

শেখ বলছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাছুরটাকে জবাই করতে পারলাম না। চাকরকে বললাম, এটা রেখে অন্য একটা গরু নিয়ে আয়।

আমার বিবি তখন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলে উঠল, না, না, এই বাছুরটাকেই জবাই কর। দেখছ না কেমন মোটাসোটা আর কচি। খুব ভালো মাংস হবে।

কিন্তু তবু বাছুরটাকে জবাই করতে ইচ্ছে হল না আমার। ওটার মুখের দিকে তাকালেই মায়া লাগে। চাকরকে দিয়ে, ওটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে অন্য গরু ধরে জবাই করলাম।

সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে গিয়েছিল চাকরটা, পরের ভোরে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। বলল, হুজুর, একটা খবর আছে। আমার মেয়ে এক বুড়ির কাছে জাদুবিদ্যা শিখেছিল। সেই বুড়িটাও এখন আমার বাড়িতেই আছে। গতকাল দাসী আর বাছুরটার কথা কথায় কথায় তাদের কাছে বলেছিলাম। বাছুরটাকে দেখতে চাইল বুড়ি। গোয়াল থেকে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। ওমা, আমার মেয়ে করল কী, বাছুরটাকে দেখেই নেকাব দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। আমি তো অবাক। শেষে জিজ্ঞেস করতেই মেয়ে জানাল, বেগানা পুরুষের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা লাগে তার। আরও অবাক হয়ে গেলাম! মেয়ের কাছেই জানলাম, ওটা বাছুর না, মানুষ।

কী বলছিস তুই, বাছুর আবার মানুষ হয় কী করে! অবাক হয়ে বললাম।

চাকরটা বলল, হ্যাঁ হুজুর, ঠিক বলছি। এরপর আরও অবাক কাণ্ড। আমার মেয়ে একবার হাসে, একবার কাঁদে। তাজ্জব ব্যাপার! কারণ কী জিজ্ঞেস করলাম মেয়েকে।

মেয়ে কী বলল? জানতে চাইলাম।

মেয়ে বলল, ওই বাছুরটা আসলে আমাদের মালিকেরই ছেলে। ওর সৎ-মা জাদু করে বাছুর বানিয়ে রেখেছে। ওর মাকেও গাই করে রেখেছিল। মানুষকে গরু বানিয়েছে, এটা মনে হলেই হাসি পায় আমার।

তাহলে কাঁদলি কেন? মেয়েকে জিজ্ঞেস করল চাকর।

মেয়ে বলল, ওমা, কাঁদব না। একটা মানুষকে জবাই করে মেরে ফেলেছ আজ তোমরা! মেয়ের কথায় থ হয়ে গেলাম। বলে কী! কিসব ভূতুড়ে কাণ্ড। সারাটা রাত ঘুম হল না। মোরগ ডাকতেই উঠে রওনা দিয়েছি আপনাকে জানাতে।

বাছুরটা এখন কোথায়? জানতে চাইলাম।

চাকর জানাল, তার বাড়িতেই আছে। আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। খুশিতে-আনন্দে এতই অধীর হয়ে উঠলাম, যে আমাকে এত বড় সুখবর দিল তাকে একটু দানাপানি খাওয়াতেও ভুলে গেলাম। আমার তখন একটাই চিন্তা, কখন ছেলেকে দেখতে পাব।

চাকরের সুন্দরী মেয়েটা আমাকে আদর-আপ্যায়ন করে বসাল। বাছুরটা এসে গড়িয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে।

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাবার কাছে যা বলেছ সব সত্যি, মা?

সত্যি হবে না? অবাকই হল মেয়েটি। ও তো আপনার ছেলে।

শুনেছি, তুমি জাদু জানো। আমার ছেলেকে আবার মানুষ বানিয়ে দিতে পারবে? তাহলে তুমি যা চাইবে তা-ই দেব, মেয়েটাকে অনুরোধ করলাম।

মানুষ বানিয়ে দিতে পারি, মালিক, বলল মেয়েটা। যদি আপনার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। আর জাদু করে আপনার বিবিকে আমার ইচ্ছেমতো একটা জানোয়ার বানাব, এতে মানা করতে পারবেন না। জাদু শিখে তার অপব্যবহার করলে মস্ত পাপ হয়। সেই পাপই করেছে আপনার বিবি। তাকে শাস্তি দিতেই হবে। আপনি আমার শর্তে রাজি তো, মালিক?

বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, আমি রাজি, মা। তোমার সঙ্গে আজই আমার ছেলের বিয়ে দেব। আমার একমাত্র ছেলের বৌ হবে তুমি। আমার যা বিষয়-সম্পত্তি আছে সব তোমাদের দুজনের হবে। আমার বিবিকে যা ইচ্ছে বানাও তুমি। আমার কোনো আপত্তি নেই। শুধু আমার ছেলেকে আবার মানুষ বানিয়ে দাও।

ছোট্ট একটা তামার বাসনে পানি ভরে নিয়ে এল মেয়েটা। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিল পানিতে। তারপর সেই পানি বাছুরটার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বলল, আল্লা যদি তোমায় বাছুর বানিয়ে থাকেন, তাহলে বাছুরই থাকবে তুমি। আর যদি কোনো ডাইনি তোমার এ অবস্থা করে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, এখনি মানুষ বানিয়ে দিন তোমাকে।

দৈত্যরাজ, কী বলব তোমাকে, ধীরে ধীরে আবার মানুষের রূপ ফিরে পেল আমার ছেলে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম, কে তোর এই অবস্থা করেছিল বাবা, জলদি বল আমাকে।

ছেলে তার সৎ-মায়ের শয়তানির কথা সব খুলে বলল।

ছেলেকে বললাম, এই মেয়েটার জন্যই আল্লা আবার তোকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন, বাবা। তোকে আজই এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।

সেই দিনই চাকরের বাড়িতেই ছেলের বিয়ে দিলাম। তারপর ছেলে আর বৌকে সঙ্গে করে ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে।

বাড়িতে এসে প্রথমেই আমার বিবিকে রামছাগল বানিয়ে ফেলল ছেলের বৌ। ছেলে আর তার বৌয়ের হাতে সংসারের দায়িত্ব তুলে দিয়ে, এই রামছাগল বিবিকে নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম আমি।

আজ এই গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় সওদাগরের দেখা পেয়েছি। কাঁদছিল সে। জিজ্ঞেস করে তার দুঃখের কথা জেনেছি। তুমি কথা দিয়েছ, দৈত্যরাজ, আমার গল্প ভালো লাগলে এর তিন ভাগের এক ভাগ অপরাধ মাপ করে দেবে।

খুশি হল দৈত্য। কথা রাখল সে। সওদাগরের অপরাধ তিন ভাগের এক ভাগ মাপ করে দিল। এরপর এগিয়ে এল দ্বিতীয় শেখ। কুকুর দুটোকে দেখিয়ে বলল, আমার কাহিনী শুনলে আরও অবাক হবে তুমি, দৈত্যরাজ। রামছাগলের চেয়েও এই দুই কুকুরের গল্প আরও মজার। তবে, যদি তুমি সওদাগরের অপরাধ আরও এক ভাগ মাপ করে দাও, তো বলি।

ঠিক আছে, বল, ঘাড় নেড়ে বলল দৈত্য। তবে গল্প ভালো না হলে তোমারও গর্দান নেব, বলে দিলাম।

কাহিনী শুরু করল দ্বিতীয় শেখ :

দ্বিতীয় শেখের কাহিনী

দৈত্যরাজ, এই যে কুকুর দুটো দেখছ, এ দুটো কিন্তু আগে কুকুর ছিল না। এরা আমার মায়ের পেটের বড় দুই ভাই। সবার ছোট আমি।

আব্বা মারা যাওয়ার সময় তিন হাজার সোনার মোহর রেখে যান। আমার ভাগের এক হাজার মোহর নিয়ে দোকান খুললাম। আমার দুই ভাইও তাদের ভাগ দিয়ে দুটো দোকান খুলল।

ব্যবসা ভালোই চলছে। এই সময় আরও বেশি উপার্জনের জন্য আমার এক ভাই এক সওদাগর দলের সঙ্গে মিশে বিদেশে বাণিজ্য করতে চলে গেল। বছরখানেক বাদেই ফিরে এল সে। একেবারে খালি হাতে। বাণিজ্য করতে গিয়ে সব খুইয়েছে।

ভাইকে বললাম, কতবার করে নিষেধ করেছিলাম, বেশি লোভ কোরো না। এখন হল তো? যাক, যা হবার হয়েছে, আল্লারই এই ইচ্ছে ছিল হয়তো।

সান্ত্বনা-টান্তনা দিয়ে আমার দোকানে নিয়ে এলাম তাকে। ভালো করে গোসল করে এলে আমার দামি জামা কাপড় তাকে পরতে দিলাম। একসঙ্গে বসেই খাওয়া দাওয়া করলাম দুই ভাই। তারপর কাজের কথায় এলাম। বললাম, দেখো ভাইয়া, সব তো খুইয়ে এলে। এখন এক কাজ কর। তোমাদের দোয়ায় আল্লার রহমতে আমার দোকানের আয়-উন্নতি ভালোই। গত বছরে লাভই হয়েছে হাজার দিনার। তুমি এর অর্ধেকটা নিয়ে গিয়ে আবার দোকান সাজাও। দেখবে, ওতেই বেশ জমিয়ে ফেলতে পারবে। তবে আবারও বেশি লোভ কোরো না।

আমার টাকায় আমার কথামতো আবার দোকান সাজাল ভাই। দিন কাটে। বেচাকেনা মোটামুটি মন্দ হয় না তার। তারপর একদিন বড় দুই ভাই এল আমার কাছে। জানাল, একটা সওদাগর দল বাণিজ্যে যাচ্ছে। তারাও সঙ্গে যেতে চায়। দোকানের কেনাবেচায় খাওয়া-পরা চলে তাদের ঠিকই, কিন্তু বড়লোক হতে পারবে না। তারা আমাকেও সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

আমি যাব না, মানা করে দিলাম। রাগ করে বড়জনকে বললাম, একবার গিয়েও আক্কেল হয়নি। আবার যেতে চাও কোন সাহসে?

সেদিন ফিরে গেল ওরা। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার এল। আবার বোঝাতে লাগল আমাকে, বাণিজ্যে গেলে বড় লাভ। আবারও বুঝিয়ে শুনিয়ে বকাঝকা দিয়ে

নিরস্ত করলাম ওদেরকে। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার এসে ধরল, এবারে যাবেই ওরা। সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যাবে।

এক কথা কত আর শোনা যায়। শেষে বিরক্ত হয়ে বললাম, ঠিক আছে, এসো আমাদের লাভ লোকসান কী হয়েছে না হয়েছে গুণে দেখি।

গুণে দেখা গেল পুঁজি বাদেও ছয় বছরে মোট ছয় হাজার দিনার লাভ হয়েছে আমাদের। বললাম, বেশ, বাণিজ্যে যাব আমরা। তবে সব টাকাপয়সা সঙ্গে নেব না। লাভের অর্ধেক নিয়ে বেরোব। বাকি দিনারগুলো এখানেই কোথাও মাটিতে পুঁতে রেখে যাব। যদি সব খুইয়েও বাড়ি ফিরি, একেবারে পথে বসব না। আবার দোকান খুলতে পারব।

আমার প্রস্তাবে রাজি হল ভাইয়েরা।

তারপর যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলাম। এক হাজার করে দিনার সঙ্গে নিলাম আমরা প্রত্যেকে। নানা ধরনের মনোহারী জিনিসপত্র কিনে বাক্স বোঝাই করে সওদাগরি-নৌকায় তুললাম। তারপর শুভদিন দেখে আল্লার নাম নিয়ে নৌকা ভাসালাম।

মাসখানেক কেটে গেছে। কয়েকটা বন্দরে নোঙর করে বেচাকেনা করেছি আমরা। কয়েক দিনার লাভও হয়েছে। এই সময় একদিন একটা বড় বন্দরে এসে নৌকা ভিড়ালাম। এখানেই হঠাৎ করে এক রূপসীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আমার।

ভাইয়েরা সওদা করতে শহরে গেছে। আমি নৌকা পাহারা দিতে রয়ে গেছি। এই সময় এল সে। অপূর্ব সুন্দরী যুবতী। যৌবন যেন ফেটে পড়ছে। কিন্তু বড় গরিব মেয়েটা। ছেঁড়া-ময়লা পোশাকে লজ্জাও ঢাকতে পারছে না পুরোপুরি। নৌকার কাছে এগিয়ে এসে কাতর অনুনয় করল, আমাকে কিছু সাহায্য করবে, মালিক! বড় গরিব আমি। চাইলে তোমার কিছু কাজ করে দিতে পারব। সওদা বয়ে নিয়ে যেতে পারব শহরে। বেচাকেনায় সাহায্য করতে পারব। মোটামুটি ভালোই রাঁধতে পারি আমি, আমাকে দিয়ে খাবারও পাকিয়ে নিতে পারবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে কে আছে তোমার? কোথায় থাক?

মেয়েটা বলল, আপনজন বলতে কেউ নেই আমার। এই শহরেরই পথে পথে ঘুরি, রাতে কারো দুয়ারের কাছে কোনোমতে নাকমুখ গুঁজে পড়ে থাকি। কেউ দয়া করে খেতে দিলে খাই। কোনো কাজ পেলে করি। কোনোমতে কেটে যাচ্ছে দিন।

কাপড় চোপড়ে গরিব, কিন্তু কথাবার্তা আর চেহারাসুরতে তাকে ভালো বংশের মেয়ে বলেই মনে হল আমার।

আমাকে নীরব দেখে কী বুঝল মেয়েটা, কে জানে, আরেকটু এগিয়ে এল। বলল, দয়া করে আমাকে আশ্রয় দাও। সত্যি বলছি, তোমাকে সাহায্য করতে পারব আমি। দুঃখিনীকে আশ্রয় দিলে আল্লাহ তোমার ভালো করবেন।

মেয়েটাকে দেখে প্রথম থেকেই মায়া লাগছে আমার। তার কাতর অনুনয়-বিনয়ে মন আরও গলে গেল। বললাম, ঠিক আছে, নৌকায় এস। এখানেই থাকবে। কাজকর্ম যা করতে ইচ্ছে হয়, করে দিয়ো। তবে ভেব না, আশ্রয় দিয়েছি বলেই প্রতিদান দিতে হবে। এমনিই মায়া লাগল, জায়গা দিলাম তোমাকে।

আরেকটু এগিয়ে এল মেয়েটি। সলজ্জ কণ্ঠে বলেই ফেলল, এতই যখন দয়া দেখালে...তাহলে, তাহলে আমাকে বিয়েই করে ফেল না।

ভাবলাম, কথাটা মন্দ বলেনি যুবতী। রূপ-যৌবন আছে ওর। তা ছাড়া নিঃসঙ্গ পরবাসে সুন্দরী নারীসঙ্গ পেলে আর কী চাই। রাজি হয়ে গেলাম। নৌকায় তুলে নিলাম তাকে। ছেঁড়া-ময়লা জামা-কাপড় খুলে নিয়ে পানিতে ছুড়ে ফেললাম। সাবান দিয়ে ঘষেমেজে পরিষ্কার করলাম তার শরীরের ময়লা। গরম পানি দিয়ে আচ্ছা করে গোসল করালাম। দামি কাপড় পরতে দিলাম, নিজের হাতে সুরমা লাগিয়ে দিলাম চোখে। আতর ঘষে দিলাম ওড়নায়। মদির সুবাসে ভরে উঠল নৌকার বাতাস।

মখমলের গদিতে বসে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সারলাম আমরা। গল্প করলাম অনেক। ওর জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনী শোনাল আমাকে। আমার জীবনের কাহিনী শোনালাম ওকে। দুজনে দুজনের কাছাকাছি চলে এলাম ধীরে ধীরে।

সে রাতে মধুযামিনী যাপন করলাম আমরা। আকাশে চাঁদ। নিচে নীল পানি। নিঝুম নিশুতি রাত। শুধু মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুলে উড়ে যাওয়া দুয়েকটা নিশাচর পাখি।

নৌকার কিনারে বসে চাঁদনি রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম আমরা। রাতের মুখে ভাষা নেই। কথা হারিয়ে ফেলেছি আমরাও। শুধু দুজনের হাতে হাত। গভীর থেকে গভীরতর হয় রাত, আরও, আরও বেশি নিঝুম নিস্তব্ধ হতে থাকে। আমাদের মাঝের অন্তরঙ্গতাও গভীর হতে গভীরতর হয়। দিনের গরম বাতাসকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছে রাতের হিম। কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দুজনে উঠে চলে এলাম নৌকার ভিতরে।

দিন যায়। আমাদের দুজনের ভালোবাসা আরও গভীর হতে থাকে। শেষে এমন হল, ওকে মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে পারি না।

ঈর্ষা শুরু করল আমার দুই ভাই। বয়েস হয়েছে ওদের। কোনো কমবয়েসী সুন্দরী আর চোখ তুলেও তাকায় না ওদের দিকে। আমার সঙ্গে আর ভালো করে কথা বলে না তারা। এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আমার আড়ালে আবডালে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে কী কী যেন বলাবলি করে। আমি আর আমার বিবি ঘরে ঢুকলেই ফাঁকফোকর দিয়ে শকুনির মতো উঁকি মারে তারা। আমরা কী করি লুকিয়ে চুরিয়ে দেখে তাদের বিকৃত বাসনা মেটাতে চায়। বুঝলাম, শয়তান পুরোপুরিই ভর করেছে ওদের ওপর।

একদিন গভীর রাতে, বিবিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছি। পা টিপে টিপে চোরের মতো আমাদের ঘরে ঢুকল দুই ভাই। তারপর দুজনকে ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে

দিল গভীর সাগরে। হাবুডুবু খেতে খেতে দেখলাম, আমার বিবি এক বিরাট জিনের রূপ নিয়েছে। আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সাগরের মাঝ দিয়েই হেঁটে চলল সে। একটা দ্বীপে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল। তারপর চোখের পলকে যেন আঁধারের মাঝে কোথায় হারিয়ে গেল।

সারাটা রাত সেই নির্জন দ্বীপে একা একা বসে কাটালাম।

সকালে ফিরে এল আমার বিবি। হেসে বলল, বল তো আমি কে?

অবাক হয়ে তার বিশাল জিন-রূপের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হতভম্বই হয়ে গেছি।

আমার বিবি বলল, তোমাকে প্রথমবার দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তোমার রূপে। শেষে মানুষের বেশ ধরে গিয়ে হাজির হয়েছি তোমার কাছে। আমাকে বিয়ে করে আমার ইচ্ছে পূরণ করছ তুমি।

প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকে শুকরিয়া জানালাম।

আমার বিবি বলল, স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য...তবে তোমার শয়তান দুই ভাইকে মেরে ফেলব আমি। আজ রাতে উড়ে গিয়ে তাদের নৌকাটা ডুবিয়ে দেব।

শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, না না, আর যাই কর, ওদের জানে মেরো না। হাজার হলেও ওরা আমার মায়ের পেটের ভাই। উপকার করেছিলাম ওদের, কিন্তু বোঝেনি ওরা। তবু আমার কর্তব্য আমি করেছি।

করতে গিয়েই মরতে বসেছিলে। আমি জিন না হয়ে মানুষ হলে কী হত, ভাব তো? দুজনেই মরতাম না?

না। সৎ থাকলে কোনো না কোনোভাবে আল্লা রক্ষা করেনই।

কিন্তু যত যাই বল, আমি ওদের ছাড়ব না। প্রতিশোধ নেবই।

আমাকে কাঁধে তুলে নিল আমার জিনরূপী বিবি। উড়তে শুরু করল। অনেক অনেক পথ পেরিয়ে এসে নামল আমাদের বাড়ির দরজায়। আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার মানুষের রূপ ধরল।

ব্যবসা-বাণিজ্য তো গেছে। ঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখা দিনারের কলসি তুলে নিলাম। যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনি আছে। ওগুলো নিয়ে বাজারে চলে গেলাম। আবার জিনিসপত্র কিনে দোকান সাজালাম।

সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে দেখি, ঘরের দাওয়ায় শিকল দিয়ে বাঁধা দুটো কুকুর। আমাকে দেখেই ঘাউ-ঘাউ করে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। আমার কামিজের খুঁট কামড়ে ধরে টানাটানি করতে লাগল। অবাক হয়ে গেলাম। ঘরে গিয়ে বিবিকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, তোমার কথা রেখেছি। তোমার ভাইদের জানে মারিনি। তবে আমার বোনকে বলে, জাদু করিয়ে দশ বছরের জন্য কুকুর বানিয়ে দিয়েছি ওদের। আমার বোন ছাড়া আর কেউ ওদের মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

দৈত্যরাজ, আমার শালীর সন্ধানে বেরিয়েছি। তাকে পেলে, দেখব অনুরোধ-টনুরোধ করে আমার ভাইদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারি কিনা।

পথ চলতে চলতে এই সওদাগরের সঙ্গে দেখা। তার মলিন চেহারা দেখে কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। শুনে, মায়া হল। তোমাকে অনুরোধ করার জন্যই রয়ে গিয়েছি। আমার সঙ্গের দুই কুকুরের কাহিনী তো শুনলে। কেমন লাগল।

চমৎকার! এমন গল্প জীবনে শুনিনি আমি। যাও, সওদাগরের আরও এক ভাগ অপরাধ মাপ করে দিলাম।

খচ্চরের মালিক, তৃতীয় শেখ এগিয়ে এল এবার। দৈত্যকে সেলাম জানিয়ে গল্প শোনানোর অনুমতি চাইল।

দৈত্য সওদাগরের বাকি এক ভাগ অন্যায় মাপ করে দেয়ার ওয়াদা করতেই গল্প শুরু করল তৃতীয় শেখ :

তৃতীয় শেখের কাহিনী

দৈত্যরাজ, এই যে খচ্চরটা দেখছ, এককালে এ-ও কিন্তু মানুষ ছিল। আমার বিবি।

একবার এক কাজে বছরখানেকের জন্য বিদেশ গিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে ঘরে ফিরলাম একদিন। মনে কত আশা, কত আনন্দ। অনেকদিন পর বাড়ি ফিরেছি, বিবি আমাকে কতই-না আদর-মহব্বত করবে।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। সোজা চললাম বিবির ঘরে। ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় ভিতর থেকে পুরুষের কথা কানে এল। কেমন যেন সন্দেহ হল। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। মাথা ঘুরে উঠল : এ কী! এক নিগ্রো চাকরের কোলে মাথা রেখে খোশগল্পে মেতে রয়েছে আমার বিবি।

উত্তেজনায় এতই ঝুঁকে পড়েছিলাম, ঠেলা লেগে দরজার পাল্লাটা পুরো খুলে গেল। আওয়াজ শুনে চমকে উঠে দুজনেই দরজার দিকে তাকাল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আমার বিবি। একটা পানি-ভরা বাটি নিয়ে ছুটে এল। বিড়বিড় করে কী সব পড়ে ফুঁক দিল বাটির পানিতে। সেই পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিল বিবি। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরে পরিণত হয়ে গেলাম আমি। লাথি মেরে আমাকে উঠোনে ফেলে দিল বিবি।

মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সারা শহর ঘুরলাম। দারুণ খিদে পেল। ঘুরতে ঘুরতে এক কসাইয়ের দোকানে চলে এলাম। কিছু হাড়গোড় আর পচা মাংস এক জায়গায় ফেলে রেখেছে কসাই। খিদের জ্বালায় তাই চিবুতে লাগলাম। আর বার বার করুণ চোখে তাকাতে লাগলাম কসাইয়ের দিকে।

আমাকে দেখে কসাইয়ের মায়া হল। যাবার সময় আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমি বাড়ির উঠোনে পা দিতেই চমকে উঠল কসাইয়ের যুবতী মেয়ে। তাড়াতাড়ি মুখে নেকাব টেনে দিল। বাপকে বলল, আব্বাজান, তুমি জানো পর পুরুষের সামনে কখনও বেরোই না আমি। অথচ একটা বেগানা পুরুষকে নিয়ে এসেছ একেবারে অন্দরমহলে।

কসাই অবাক হয়ে বলল, আরে, পুরুষ কোথায় দেখলি মা? ও-তো একটা কুকুর।

না, আব্বাজান। ও কুকুর না। পুরুষ মানুষ। ওকে জাদু করে কুকুর বানিয়ে দিয়েছে এক শয়তান মেয়েমানুষ।

তুই-ও তো জাদু জানিস মা। ওকে ভালো করে দিতে পারবি না?

দাঁড়াও, দেখি চেষ্টা করে।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে এক পাত্র পানি নিয়ে এল কসাইয়ের মেয়ে। বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি আমার গায়ে ছিটাল। ধীরে ধীরে আবার মানুষের চেহারা ফিরে পেলাম আমি।

মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল। ওকে অনেক দোয়া করে বললাম, আমার বিবিকে জাদু করে একটা খচ্চর বানিয়ে দিতে পার? তাকে কিছুটা শাস্তি দিতে চাই।

পারব, বলে ভিতরে গিয়ে আবার এক পাত্র পানি এনে মন্ত্র পড়ল। তারপর সেই পানির পাত্র আমার হাতে দিতে দিতে বলল, আপনার বিবি যখন ঘুমিয়ে থাকবে, এই পানি তার গায়ে ছিটিয়ে দেবেন। তারপর মনে মনে তাকে যা হতে বলবেন, তাই হয়ে যাবে।

বাড়ি ফিরে সেই পানি ছিটিয়ে খচ্চর বানিয়ে ফেললাম আমার বিবিকে। তারপর উঠোনের এক কোণে আমার আরও কয়েকটা খচ্চরের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে চুপচাপ বসে রইলাম রাতের অপেক্ষায়। আমাকে যেমন লাথি মেরেছে সে, তাকেও সে রকম শাস্তি দেয়ানোই আমার ইচ্ছে।

সন্ধ্যা হতে ক্ষেতখামারের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এল সেই নিগ্রো চাকর। উঠোনে ঢুকতেই তার দিকে ছুটে গেল খচ্চরটা। ব্যা ব্যা করে ডেকে কিছু বোঝাতে চাইল। কিন্তু নিগ্রো তো খচ্চরের ভাষা বোঝে না। বিরক্ত হয়ে খচ্চরটাকে বিচ্ছিরি গালাগাল দিয়ে ঘরের দিকে রওনা হল সে। তার কাপড়ের খুঁট কামড়ে ধরে ফেরানোর চেষ্টা করল আমার খচ্চর বিবি। ভীষণ খেপে গিয়ে একটা লাঠি নিয়ে এসে দমাদম পিটুনি লাগাল সে খচ্চরটাকে। শেষমেশ লাঠি ফেলে গোটা কয়েক জোর লাথি ঝাড়ল। একেবারে কাহিল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল খচ্চর।

সেই থেকে মেয়েমানুষকে আর বিশ্বাস করি না আমি, দৈত্যরাজ। তাই আর বিয়ে থা করলাম না। আমার খচ্চর-বিবির পিঠে চড়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। এই গাছতলায় এসে সওদাগরের সঙ্গে দেখা।

শেখের বিবির সঙ্গে হেসে রসিকতা করল দৈত্য, কী গো, খচ্চর বিবি, শেখ যা বলল সব সত্যি?

মুখ ফিরিয়ে নিল খচ্চরটা।

এই সময় মোরগের ডাক শুনে গল্প থামাল শাহরাজাদ।

দুনিয়াজাদ আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, আপা, কী যে সুন্দর গল্প! ইস্, আরেকটা গল্প যদি শোনাতে! তো দৈত্য কি সওদাগরকে মাপ করল?

বেঁচে থাকলে কাল রাতে আবার গল্প শোনাব, দুনিয়া। এখন ঘুমো। জাঁহাপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে, বলেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল শাহরাজাদ।

শারিয়ার কিন্তু ঘুমাল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, শাহরাজাদের গল্পগুলো তো ভারি মজার! আরও নিশ্চয় অনেক গল্প জানা আছে মেয়েটার। সব না শুনে কি তাকে মারা উচিত হবে?

পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। পোশাক পরে তৈরি হয়ে দরবারে চলে এল।

সারাদিন ব্যস্ততার মাঝেও শাহরাজাদের গল্পের কথা মনে পড়ে শারিয়ারের। রোজকার মতোই সন্ধ্যার একটু আগে দরবারের কাজ শেষ হল। খাসমহলে ফিরে এল শারিয়ার।

দুনিয়াজাদ গল্প শোনার আবদার ধরতেই শারিয়ারের অনুমতি নিয়ে গল্প শুরু করল শাহরাজাদ :

তৃতীয় শেখের খচ্চর-বিবিকে নিয়ে বেশ হাসি-মস্করা করল দৈত্য।

শেখ জিজ্ঞেস করল, আমার গল্প শুনে খুশি হয়েছে তো, দৈত্যরাজ?

দৈত্য বলল, নিশ্চয়ই, খু-উ-ব খুশি হয়েছি আমি। যাও, সওদাগরের সমস্ত অপরাধ মাপ করে দিলাম। সওদাগরকে বলল, তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও, সওদাগর। তিন শেখের কাহিনী শুনে যত খুশি হয়েছি, তারচেয়ে বেশি অবাক, বেশি মুগ্ধ হয়েছি তোমার সত্যবাদিতা দেখে। ওয়াদা রক্ষার জন্য নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করলে তুমি।

দৈত্য আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যেতেই তিন শেখকে জড়িয়ে ধরল সওদাগর। জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে চোখে পানি এসে গেছে তার। একে অপরের বন্ধু হয়ে গেল তারা। তারপর বিদায় নিয়ে যে যার পথে রওনা হয়ে গেল।

গল্পটা শেষ হতেই চুপ করল শাহরাজাদ। দুনিয়াজাদ আবার আবদার ধরল, আপা, রাত তো এখনও কিছুই না। আরেকটা গল্প বল না।

অনুমতির জন্য শারিয়ারের দিকে তাকাল শাহরাজাদ। শারিয়ার বলল, আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে, বল গল্প। আমি শুনছি।

আবার শুরু করল শাহরাজাদ :

জেলে আর দৈত্য

অনেক দিন আগে এক নদীর ধারে এক জেলে বাস করত। বুড়ো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তিন কন্যা আর স্ত্রী নিয়ে সুখে-দুঃখে কোনোমতে দিন কেটে যেত জেলের। নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরত সে, তাই বিক্রি করে সংসার চালাত। তবে জেলের জাল ফেলার একটা নিয়ম ছিল। কোনো দিনই পাঁচবারের বেশি জাল ফেলত না সে। এতে যা মাছ ওঠে নিয়ে চলে যেত বাজারে।

একদিন একটু বেলা করেই জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে এল জেলে। আল্লার নাম করে জাল ফেলল নদীতে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জালটা বসার সময় দিল, তারপর ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনতে লাগল। ভীষণ ভারি লাগছে টানতে। জেলে মনে করল বেশ বড়সড় একটা মাছ পড়েছে জালে। তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে জাল টেনে তুলল সে। ওমা, এ কী। জালে মাছ কোথায়! একটা মরা গাধা উঠে এসেছে।

গাধাটাকে জাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে আবার জাল ফেলল জেলে। এবারও জাল তুলতে বেশ ভারি লাগল। কিন্তু জাল তুলে হতাশ হল জেলে। এবারে উঠেছে একটা গাছের গুঁড়ি। মন খারাপ হয়ে গেল জেলের। দুইবার জাল ফেলল, দুইবারই এই অবস্থা।

আরেকটু সরে গিয়ে আবার জাল ফেলল জেলে। এবারেও জাল তুলতে ভারি লাগল। সাংঘাতিক ভারি। জেলের আশা হল, এবার বড় মাছ না-হয়ে যায় না। টেনেটুনে ডাঙায় জাল তুলল সে। হায় হায়, আজ কী হল!—মাথায় হাত দিল জেলে। বিরাট এক মাটির কলস উঠেছে এবারে, কলসের ভিতরটা কাদায় ভরা।

আরও সরে গিয়ে চতুর্থ বার জাল ফেলল জেলে। এবারেও জাল তুলতে ভারি লাগছে। মনে মনে আল্লাকে ডাকতে ডাকতে জাল টেনে তুলল সে। নাহ্, আজ আর হবে না বোধহয়। না খেয়েই থাকতে হবে আজ। জালে উঠেছে ইট আর কিছু ভাঙা হাঁড়িপাতিল।

আরেকটু সরে গেল জেলে। জাল রেখে দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করল, হে মালিক, আর মাত্র একবার বাকি আছে। এবারেও যদি এসব জিনিসই ওঠে, বৌ-মেয়ে নিয়ে আমাকে উপোস থাকতে হবে।

পঞ্চমবার জাল ফেলল জেলে। জাল বসার সময় দিয়ে ধীরে ধীরে টানতে লাগল। কিন্তু এ কী, জাল যে নড়তেই চাইছে না। পানির তলায় কোনো পাথরের চাঁইয়ে

আটকে গেল না তো! টান বাড়াল জেলে। তারপর অনেক কসরৎ করে গুটিয়ে আনল জাল। তীরে তুলে আনল। কিন্তু মাছ কোথায়? এ যে একটা তামার কলস!

কলসটা জাল থেকে ছাড়িয়ে নিল জেলে। মুখটায় সিলমোহর করা। তাতে দাউদের পুত্র বাদশাহ সোলায়মানের নাম খোদাই করা রয়েছে।

একেবারে হতাশ হল না এবার জেলে। মাছ না-ই পাওয়া গেল, কলসটা তো পেয়েছে। ওটা বিক্রি করেই একটা দিন কোনোমতে চালিয়ে নিতে পারবে।

কলসটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল জেলে। বেজায় ভারি। জেলে শুনেছে, সোলায়মানি আমলের কলসিতে সোনার মোহর থাকে। আর কলসটা সত্যিই ভারি। ভিতরে জিনিস আছে মনে হয়। সোনার মোহরই যদি থাকে? তাহলে তো রাতারাতি বড়লোক। জেলে ঠিক করল, মুখটা খুলে দেখবে।

একটা পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে সিলমোহরটা ভেঙে ফেলল সে।

কলসের মুখের ঢাকনা বেরিয়ে পড়ল। খোলার চেষ্টা করল জেলে, কিন্তু সাংঘাতিক এঁটে লেগে আছে ঢাকনা। পানির তলায় থাকতে থাকতে আরও শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু জেলে ছাড়ার পাত্র নয়। অনেক কায়দা-কৌশল করে ঢাকনাটা খুলেই ফেলল সে। কিন্তু কলসের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখার আগেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

কলসের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে উঠে যেতে লাগল কালো ধোঁয়া। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। ধীরে ধীরে ধোঁয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ও কী! হাঁ হয়ে গেল জেলে। এ যে বিশাল এক আফ্রিদি দৈত্য।

পা দুটো যেন জাহাজের মাস্তুল। হাত দুটো বিশাল লম্বা গাঁইতির মতো। আর আকাশে গিয়ে ছুঁয়েছে জালার মতো বিরাট মাথাটা। যখন হাঁ করল দৈত্য, জেলের মনে হল ওটা পাহাড়ের গুহা। দাঁতগুলো যেন শ্বেতপাথর দিয়ে বানানো বিশাল একেকটা মুলো। বাঁশের চোঙের মতো নাকের ফুটো। থালার সমান বড় আর আগুনের মতো টকটকে লাল দুই চোখ। মাথার চুল যেন উলুখাগড়ার জঙ্গল।

চোখের সামনে জলজ্যান্ত ওই ভয়াবহ দানবকে দেখে তো ভিরমি খেল জেলে, দাঁতকপাটি লেগে গেল। অবশ অসাড় হয়ে আসতে লাগল শরীর। ওই একবারই তাকিয়েছে, এরপর আর চোখ তুলবার সাহস হচ্ছে না তার।

হঠাৎ কথা বলে উঠল দৈত্য, মেঘের গর্জন উঠল যেন।

হযরত সোলায়মান আল্লার পয়গম্বর। আল্লাহ আর হযরতকে ছাড়া আর কাউকে মানি না আমি।

মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলল দানব। কাতর হয়ে বলতে লাগল, হে আল্লার পয়গম্বর, দুনিয়ার বাদশাহ, হে মেহেরবান হযরত সোলায়মান, আমাকে মেরো না তুমি। তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। আর কখনও তোমার অবাধ্য হব না। কখনও তোমার বিরুদ্ধে যাব না। আল্লাহ গো, ও হযরত, আমাকে ক্ষমা কর।

এতবড় দৈত্যের এই কাতর মোনাজাত শুনে দিলে একটু সাহস পেল জেলে। সে বলল, আফ্রিদি রাজ, বাদশাহ সোলায়মানের ভয়ে কাঁপছ কেন তুমি? তিনি তো কবে সেই আঠারোশো বছর আগে মারা গেছেন। তারপর কত কাণ্ড কত কিছু ঘটে গেল দুনিয়ায়। তা হয়েছে কী? কী এমন পাপ করেছিলে যে কলসের ভিতরে বন্দি করে রাখলেন তোমাকে বাদশাহ?

বাদশাহ সোলায়মান বেঁচে নেই শুনে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরল দানবের। কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারল না। বাদশাহ সোলায়মান সত্যি মারা গেছেন কিনা, বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল জেলেকে। বারবার একই উত্তর পেল। শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানি না আমি। এই ব্যাটা জেলে, একটা খবর আছে তোর জন্য।

জেলে জানতে চাইল, কী খবর, জনাব?

হুঙ্কার ছাড়ল দানব। তোর মরণ। তোকে খুন করব।

মুখ শুকিয়ে গেল জেলের। বলল, দৈত্যরাজ, আমাকে মারবে কেন তুমি? কী আমার অপরাধ? আমি তো ভেবেছিলাম, খুশি হয়ে আমাকে বহুত ইনাম দিয়ে ফেলবে তুমি। বহুদিনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছি।

কিন্তু জেলের কথায় কান দিল না দৈত্য। বলে উঠল, কিভাবে মরতে চাও, আগে সে-কথা বল।

কিন্তু কী দোষ আমার? অপরাধ কী?

বেশ তাহলে শোনো আমার কাহিনী। তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।

বল।

বলতে লাগল দৈত্য :

আমি এক জিন। দাউদের পুত্র শাহেনশাহ সোলায়মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম। আমাকে শায়েস্তা করতে তাঁর উজির আশফ-ইবনে ব্যারাখ্যাকে পাঠালেন বাদশাহ। বহুত ক্ষমতা আমার, তবু পারলাম না উজিরের সঙ্গে। আমাকে কাবু করে ধরে নিয়ে গেল বাদশাহ'র কাছে। বাদশাহ বললেন, এরপর থেকে আর কোনো গোলমাল না পাকালে, তাঁর অনুগত হয়ে থাকলে আমাকে মাপ করে দেবেন। কিন্তু আমি তাঁর কথা শুনলাম না। রেগে গেলেন বাদশাহ। উজিরকে ডেকে আমাকে একটা তামার জালার ভিতরে ভরে পানিতে ফেলে দেয়ার হুকুম দিলেন।

আমাকে ভিতরে ভরে সিসার পাত এঁটে জালার মুখ বন্ধ করে দিল উজির। সিসার পাতের ওপর বাদশাহ সোলায়মানের সিলমোহর এঁকে দিয়ে জালাটা ফেলে দিল সাগরে।

পানির তলায় তামার জালায় বন্দি হয়ে রইলাম আমি। দিন যায়। মুক্তির আশায় দিন গুণি। আল্লাহর নামে কসম করলাম, একশো বছরের মধ্যে যে আমাকে মুক্ত করবে, তাকে সারাজীবন দুধে-ভাতে থাকার ব্যবস্থা করে দেব। ধনদৌলতে ভরে দেব

তার ঘর। কিন্তু আমার কপাল খারাপ। কেউই মুক্ত করল না। পেরিয়ে গেল আমার বন্দি জীবনের একশো বছর।

আবার কসম করলাম, আমি : একশো বছরের ভিতরে যে আমাকে মুক্ত করবে, দুনিয়ার যত হিরে জহরৎ, মণি-মুক্তা এনে তুলে দেব তার হাতে। কেটে গেল আরও একশো বছর। এবারেও কেউ এল না।

কসম করলাম আবার : একশো বছরের ভিতর যে মুক্ত করবে, তাকে দেব তিনটি বর। যা চাইবে সে, পাই পাবে। আশায় আশায় দিন গুণি। কিন্তু বৃথা। এবারেও এল না কেউ।

রাগে দুঃখে জালার ভিতরেই লাফঝাঁপ মারতে লাগলাম। মনে মনে আবার কসম করলাম, এবারে যে আসবে, জালা থেকে বেরিয়েই শেষ করে ফেলব তাকে।

তোমার কপাল খারাপ, জেলে। তুমিই এলে। আমাকে আলোর মুখ দেখিয়েছ, ঠিক, কিন্তু আমি কসম খেয়েছি। নিরুপায়। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না। কী করে মরবে এখন তাই বল।

বুক দুরুদুরু করছে জেলের। ভাবছে : এই আমার নসিবে লেখা ছিল। জেনেশুনে জীবনে তো কোনো পাপ করিনি! তাহলে? হাতজোড় করে দৈত্যের কাছে কাতর অনুনয় জানাল সে, হে দৈত্যরাজ, তুমি অসীম ক্ষমতাশালী। আমাকে মাপ করে দাও। আল্লা তোমার ভালো করবেন।

জেলের কথায় এবারেও কান দিল না দৈত্য। বলল, আমার সময় নষ্ট করছ। জলদি বল, কিভাবে মরতে চাও।

জেলে বলল, আমি কোনো দোষ করিনি। আমাকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেললে আল্লা তোমাকে রেহাই দেবেন না। তোমার চেয়ে শক্তিমান কাউকে পাঠাবেন। তার হাতে মারা যাবে তুমি।

মন গলল না আফ্রিদির। তার সেই এক কথা। আমি কসম করেছি, আমাকে যে মুক্ত করবে, তাকে খুন করব আমি। তুমি মুক্ত করেছ। তোমাকে ছাড়তে পারি না।

এভাবেই উপকারীর প্রতিদান দাও তোমরা? মরিয়া হয়ে বলে উঠল জেলে।

গলা চড়ে গেল দৈত্যের, বহুত বকবক করেছ। এবার থামো। মরার জন্য তৈরি হও।

জেলে দেখল, অনুনয় করে লাভ হবে না। তখন মনে মনে এক বুদ্ধি আঁটল সে। জানে সে, গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোর অনেক বেশি। কোনো প্যাঁচে ফেলতে না পারলে আফ্রিদি শয়তানটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বলল, তাহলে তুমি আমাকে মেরেই ফেলবে?

তো কী বলছি এতক্ষণ?

আমার অপরাধ?

রেগে গেল দৈত্য। আবার সেই এক কথা! ক'বার বললাম, আমি কসম খেয়েছি, আমাকে যে মুক্ত করবে তাকে খুন করব? ওই তামার জালায় বন্দি ছিলাম। আজ আমাকে মুক্ত করেছ তুমি।

জেলে বলল, পানি থেকে জালা তুলেছি আমি। মোহর ভেঙে ঢাকনাও খুলেছি। কিন্তু একটা কথা, তোমাকে মুক্ত করলাম কী করে? তোমার এই বিশাল শরীর ছোট্ট জালায় আঁটে? এই আজগুবি কথা বিশ্বাস করতে বলছ আমাকে? তোমার একটা ঠ্যাং ঢুকবে এর ভিতর? অথচ কী সহজেই না বলে যাচ্ছ, ওই জালার ভিতর শ শ বছর কাটিয়ে দিয়েছ। মিথ্যে বলার আর জায়গা পাওনি! রূপকথার গাঁজাখুরি কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়...

জেলের মুখ-বাঁকানো দেখে দৈত্য তো রেগে টং। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কী, আমি মিথ্যে কথা বলছি! আমি মিথ্যুক? ওই জালাটায় ছিলাম না। এত্তোবড় কথা! ঠিক আছে দেখ্, এর ভিতর ঢুকতে পারি কি পারি না!

বিন্দুমাত্র দেরি না করে নিজের দেহটাকে গুটিয়ে নিতে লাগল দৈত্য।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল জেলে। দৈত্যের দেহটা যেই পুরো ঢুকে গেল জালার ভিতরে, অমনি লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সে। সিসার ঢাকনাটা তুলে নিয়েই এঁটে দিল জালার মুখ।

তারপর হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ল। দৈত্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলল, আফ্রিদির বাচ্চা, এবার তুমি ঠিক কর, কিভাবে তুমি মরতে চাও। এক কাজ করি। তোমাকে আবার পানিতেই ফেলে দিই। তারপর নদীর পাড়ে, এখানে এসে ঘর বাঁধব। সমস্ত জেলেকে হুঁশিয়ার করে দেব যেন জালাটা তুলে আমার মতো বিপদে না পড়ে। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে আশপাশের গাঁয়ে তোমার শয়তানির কথা জানিয়ে দেব। খবর প্রচার করে দেব সারা দেশে। ভয়ে এ তল্লাট মাড়াবে না আর কেউ। দেখব, এরপর কে তোমাকে ছাড়াতে আসে! হা-হা-হা!

নিজের বোকামি বুঝতে পেরে কপাল চাপড়াতে লাগল আফ্রিদি। জালা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল না। বাদশাহ সোলায়মানের মোহর আঁকা ঢাকনা খোলার ক্ষমতা কোনো দৈত্যের নেই। খুলে দেয়ার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করল দৈত্য, কিন্তু জেলে অটল রইল।

দৈত্য বলল, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে মারব না। দানয়ার সব ধনদৌলত এনে দেব তোমাকে।

কিন্তু জেলে বিশ্বাস করল না তার কথা। বলল, তোমাকে বিশ্বাস করে কি মরব নাকি? সুলতান ইয়ুনান আর হকিম রায়ানের কিচ্ছা শোননি নিশ্চয়। তাহলে আর এই অনুরোধ করতে না।

না, শুনিনি। কী সে কিচ্ছা, শোনাও তো, জালার ভিতর থেকে বলল দৈত্য।

জেলে বলতে লাগল :

সলতান ইয়ুনান, তার উজির আর হকিম রায়ান

অনেক অনেক দিন আগে, রুম দেশের ফার শহরে রাজত্ব করতেন এক প্রবল প্রতাপ সুলতান। হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর, দাস-দাসী আর অঢেল ধনদৌলত ছিল তাঁর। কিন্তু সুলতানের মনে শান্তি নেই। সাংঘাতিক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত সারাদেহ। কত হকিম কত কবিরাজ দেখিয়েছেন সুলতান, কাজ হয়নি। কেউ সারাতে পারেনি তাঁর রোগ। কোনো ওষুধেই কোনো কাজ হয়নি।

হতাশ হয়ে পড়েছেন সুলতান, তাঁর রোগ আর কোনোদিন বুঝি সারবে না। এই সময় একদিন তাঁর দরবারে এসে হাজির এক বৃদ্ধ হকিম। নাম তাঁর রায়ান। অসাধারণ জ্ঞানী লোক তিনি। অনেক ভাষা জানেন, অনেক বিদ্যা শিখেছেন। হকিমি বিদ্যায় জুড়ি নেই তাঁর।

ইয়ুনানের দরবারে ঢুকে সেলাম জানালেন রায়ান। বললেন, আমি আপনার রোগের খবর শুনে এসেছি। কোনো হকিম কোনো ওষুধেই নাকি সারাতে পারেনি আপনার রোগ। ঠিক আছে, যদি অনুমতি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

হতাশ গলায় বললেন সুলতান, কী লাভ, হকিম সাহেব? ওষুধ তো আর কম খাইনি, কম লাগাইওনি। সারেনি। আর ভালো লাগে না এসব।

রায়ান বললেন, আমি আপনাকে খাবার কিংবা লাগাবার ওষুধ দেব না।

কৌতূহলী হয়ে উঠলেন সুলতান। তাহলে কী করে সারাবেন শুনি?

সে-কথা না-ই বা শুনলেন। যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন বলুন। আমি আপনার রোগ সারিয়ে দেবই।

আর শোনার জন্য চাপাচাপি করলেন না সুলতান। বললেন, ঠিক আছে যদি সারাতে পারেন, যা চাইবেন তাই দেব। অঢেল ধনদৌলত দেব। শুধু আপনিই নন, আপনার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি, তাদের নাতি-নাতনিরাও মাসোহারা পাবে আমার খাজাঞ্চি থেকে। আপনাকে আমার সভার প্রধান পারিষদ করে রাখব। প্রাণের প্রাণ দোস্ত ভাবব।

সূক্ষ্ম কারুকাজ করা মূল্যবান একটা শাল উপহার দিলেন সুলতান হকিমকে। আবার বললেন, যেভাবে খুশি চিকিৎসা করুন আমার, কোনো আপত্তি নেই। রোগ সারলেই হল...

ভরসা দিলেন হকিম। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, জাঁহাপনা। আপনার রোগ ভালো হয়ে যাবে।

অনেক দিন পর হাসলেন সুলতান। বললেন, তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। কাল থেকেই কাজ শুরু করুন।

মাথা নুইয়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন হকিম, তাই হবে, জাঁহাপনা।

শহরে ঢুকেই একটা ঘর ভাড়া করেছিলেন রায়ান। তাঁর গাছ-গাছড়া, ওষুধের শিশি-বোতল-বয়াম, মোটা মোটা পুঁথি আর বইতে ভরে উঠেছে ঘরটা। বাদশাহর দরবার থেকে বেরিয়ে সোজা সেই বাসায় ফিরে এলেন হকিম।

বাসায় এসে ওষুধ বানালেন রায়ান। একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির ভিতর ভরে দিলেন খানিকটা ওষুধ। তারপর সুন্দর করে একটা হাতল বানিয়ে লাগিয়ে দিলেন লাঠির মাথায়। এরপর তিনি বানালেন একটা পোলো বল। বলের ভিতরে কায়দা করে ভরে দিলেন ওষুধ।

লাঠি আর বল নিয়ে পরদিন সকালে দরবারে চলে এলেন রায়ান। যথারীতি সেলাম জানালেন সুলতানকে। লাঠি আর ছড়িটা দিয়ে বললেন, আজ থেকে ঘোড়ায় চেপে পোলো খেলতে হবে আপনাকে। এই লাঠি আর বল দিয়ে খেলবেন। খেলে যাবেন যতক্ষণ-না দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকে। তারপর প্রাসাদে গিয়ে ভালোমতো গোসল করবেন। ব্যস্‌, আর কিচ্ছু না। এই আপনার চিকিৎসা। সেরে উঠবেন এতেই।

পোলো খেলতে ময়দানে চললেন সুলতান। সঙ্গে চলল আমির-অমাত্য-ওমরাহ-উজির-নাজির-পাত্র-মিত্র-সভাসদ। আর চললেন হকিম রায়ান।

কী করে লাঠিটা ধরতে হবে, সুলতানকে শিখিয়ে দিলেন রায়ান। শুরু হল খেলা। ঘোড়ায় চেপে খেলতে লাগলেন সুলতান। ঘাম ঝরতে লাগল শরীর থেকে। ঘেমে নেয়ে উঠলেন এক সময়।

কড়া চোখে নজর রাখছিলেন রায়ান। সুলতানকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আজ এই পর্যন্তই। প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সোজা হামামে ঢুকে পড়ুন।

অনেকদিন পরে সে রাতে গাঢ় ঘুম হল সুলতানের। সকালে উঠে দেখলেন, অনেকখানি কেটে গেছে দেহের জড়তা। মেজাজ খুশি খুশি।

নিয়মিত সময়ে দরবারে এলেন সুলতান। রায়ানও এলেন। তাঁকে ডেকে সুলতান জানালেন, অনেকটা আরাম পাচ্ছি আজ।

রায়ানকে একটা মূল্যবান পোশাক উপহার দিলেন সুলতান। তারপর দলবল নিয়ে রওয়ানা হলেন পোলো খেলতে।

কয়েক দিন কেটে গেল। ভালো হয়ে উঠতে লাগলেন সুলতান। আস্তে আস্তে কুষ্ঠের ক্ষত শুকিয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর থেকে।

রোজই দরবারে আসেন রায়ান। সুলতানের সঙ্গে দেখা করেন। রোজই তাঁকে কিছু না-কিছু উপহার দেন সুলতান। আস্তে আস্তে পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠলেন সুলতান, তাঁর শরীর থেকে দূর হয়ে গেল কুষ্ঠের অভিশাপ। মনে আনন্দের সীমা নেই সুলতানের। রায়ানকে অনেক মূল্যবান সামগ্রী, ধনদৌলত উপহার দিয়ে দিলেন।

রায়ানকে এত কিছু উপহার দিচ্ছেন সুলতান, এটা সহ্য হল না উজিরের। হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল সে। মনে মনে ফন্দি আঁটে, কী করে জব্দ করা যায় রায়ানকে।

একদিন। খোশ মেজাজে এসে দরবারে সিংহাসনে বসলেন সুলতান। আমির-অমাত্য উজির-নাজির-পাত্র-মিত্র সব নত মস্তকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাচ্ছে। এই সময় দরবারে ঢুকলেন রায়ান। সিংহাসন থেকে নেমে এলেন সুলতান। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশের আসনে বসালেন হকিমকে।

এতটা খাতির! সুলতানের সম্মানের কেউ ছাড়া ওই আসনে বসার নিয়ম নেই। তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হল অনেকেই। তবে মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পেল না।

কিন্তু উজির আর সহ্য করতে পারল না। সুলতানের সামনে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে হাতজোড় করে দাঁড়াল। বলল, অধমের একটা আর্জি আছে।

বল, আদেশ দিলেন সুলতান।

জাঁহাপনার শতায়ু কামনা করি। দোয়া করি, চিরজীবী হোন। আমি আপনার একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত নফর। যদি অভয় দেন তো...

উজিরের এই ভণিতায় বিরক্ত হলেন সুলতান। কড়া গলায় বললেন, আহ্, বলেই ফেল না কী বলবে।

গুসতাকি মাপ করবেন, জাঁহাপনা। অযোগ্য লোককে কিছু দান করা মানে অপাত্রে দান। অশ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান গ্রহণ করে, সেই লোক পরম শত্রু।

হেঁয়ালি না করে সোজাসুজি বলে ফেল তো! ধমকে উঠলেন সুলতান।

আঙুল তুলে দেখিয়ে তখন বলল উজির, এই যে হকিম রায়ান, তার যা প্রাপ্য নয় তাই দিচ্ছেন তাকে। লোকটা অকৃতজ্ঞ। আপনার দানের সে যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে না। এই লোক আপনার পরম শত্রু।

গর্জে উঠে বললেন সুলতান, কী যা তা বকছ! কার সম্পর্কে কী করে কথা বলতে হয়, তা-ও ভুলে গেছ দেখছি। তামাম দুনিয়ায় যদি আমার একজনও আপনজন থাকে, তো এই রায়ান। আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন তিনি। কুষ্ঠের মতো কঠিন রোগ সারিয়েছেন। তার বদলে আমি কতটুকু দিয়েছি তাঁকে? আমার রাজত্বটাও যদি দিয়ে দিই, তাহলেও প্রতিদান দেয়া হয় না। তাঁর পাওনা শোধ হয় না। আসলে হিংসায় জ্বলছ তুমি, উজির। দিল সাফ কর তোমার। নইলে এমন সাজা দেব...তোমার মতো লোক অনেক আছে দুনিয়ায়। এমনি একজন লোকের গল্প শুনেছিলাম। বাদশাহ সিনবাদের গল্প। বলেছিল আমারই এক পারিষদ।

এই সময়ে উঠে দাঁড়ালেন হকিম। সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন...

ভোর হয়ে এসেছে দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ।

গদগদ কণ্ঠে বলল দুনিয়াজাদ, আহ্, আপা, কী চমৎকার তোমার গল্প।

শাহরাজাদ বলল, বেঁচে থাকলে এর চেয়ে ভালো গল্প শোনাতে পারব।

শারিয়ার ভাবল, শাহরাজাদের মুখ থেকে সব গল্পগুলো শুনতে হবে। এর আগে তাকে মেরে ফেলা উচিত হবে না।

পরের রাতে শারিয়ারের অনুমতি নিয়ে গল্প শুরু করল শাহরাজাদ :

হকিম রায়ান চলে যেতেই হাতজোড় করে বলল উজির, বাদশাহ সিনবাদের কাহিনী আমি শুনিনি, জাঁহাপনা। দয়া করে যদি শোনান...

বেশ শোনো তাহলে। বলতে লাগলেন ইয়ুনান :

সিনবাদ আর বাজপাখি

এই ফার শহরেই এক সময়ে বাস করতেন এক প্রবল পরাক্রম বাদশাহ। তাঁর নাম ছিল শাহেনশাহ সিনবাদ। খেলাধুলা, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, সব কিছুতেই ওস্তাদ ছিলেন বাদশাহ। তাঁর ছিল এক পোষা শিকারি বাজপাখি। শিকারে বেরোলে সব সময় বাদশাহর সঙ্গে সঙ্গে থাকত পাখিটা। কখনও কাছছাড়া হত না। পাখিটাকে দারুণ ভালোবাসতেন বাদশাহ। শিকারে বেরোনোর সময় সোনার শিকলের সঙ্গে আটকানো একটা সোনার পেয়ালা ঝোলান থাকত বাদশাহর গলায়, পানি খাবার জন্য।

একদিন বাজপাখির পরিচারক এসে বাদশাহকে বলল, জাঁহাপনা, শিকারে গেলে কেমন হয়? এখন শিকারের উপযুক্ত সময়। ভালো শিকার মিলতে পারে। যাবেন নাকি?

রাজি হয়ে বললেন বাদশাহ। ঠিক আছে, চল যাই। সব কিছু গোছগাছ করে নাওগে।

শিকারে বেরোলেন বাদশাহ। সঙ্গে অনেক লোকলস্কর। বাদশাহর কাঁধে বসে চলল বাজপাখিটা।

কয়েকদিন পেরিয়ে গেল। এক পাহাড়ের উপত্যকায় এসে হাজির হল শিকারি-দলটা। দেখেশুনে থামার নির্দেশ দিলেন বাদশাহ। শিকারের জাল পাতা হল। জালে ধরা পড়ল একটা পাহাড়ি ছাগল।

সবাইকে হুঁশিয়ার করে বললেন বাদশাহ, খবরদার ছাগলটা যেন পালাতে না পারে। তাহলে আস্ত রাখব না কাউকে।

খুব সাবধানে গুটিয়ে আনা হল জাল। ছাগলটার কাছে এসে দাঁড়ালেন বাদশাহ। হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ছাগলটা। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে নিজেকে অনেকটা মানুষের মতো খাড়া করে তুলল। করজোড়ের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল সামনের দুই পা।

বাদশাহ ভাবলেন, তাঁকে সেলাম জানাচ্ছে ছাগলটা। ভারি মজা তো! হাততালি দিয়ে জোরে হেসে উঠলেন বাদশাহ। ব্যাপার দেখে অন্য সবাইও হাসতে লাগল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

সুযোগটা কাজে লাগাল ছাগল। এক লাফে জাল থেকে বেরিয়ে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল। তারপর চোঁ চোঁ দৌড়। পলকের ভিতর ঘটে গেল ব্যাপারটা। হকচকিয়ে গেল সবাই।

সবার আগে সামলে নিলেন বাদশাহ। এক লাফে ঘোড়ায় চেপে বসে ধাওয়া করলেন ছাগলের পিছনে। কাঁধে বাজপাখি। ছাগলটার পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন বাদশাহ, আমার হাত থেকে পালিয়ে নিস্তার পায়নি কোনো শিকার। আজ তুই পালাবি? কিছুতেই না। যে করে হোক ধরবই...

পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে ছাগল। পিছনে তাড়া করে চলেছে বাদশাহর ঘোড়া। এককেবার একেবারে কাছে এসে যায় ছাগল, ফাঁস ছুঁড়তে যান বাদশাহ, কিন্তু ছোঁড়ার আগেই চলার গতি বাড়িয়ে আবার এগিয়ে যায় সেটা। ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই।

কাঁধের ওপর বসে সব খেয়াল করেছে শিকারি বাজ। আরেকবার ছাগলটা কাছে এসে যেতেই উড়ে গেল সে। গোঁত্তা মেরে নিচে নেমেই ঠোকর মারল ছাগলের চোখে। তীক্ষ্ণ ঠোঁটের ঠোকরে চোখ গলে গেল ছাগলটার। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে তাল হারিয়ে ফেলল। একটা ছোট চারাগাছের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। তারপর গড়াতে শুরু করল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। নিচে একটা ঝোপের গায়ে ধাক্কা খেয়ে থামল।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছেন বাদশাহ। ছুটে চলে এলেন ছাগলের কাছে। উঠে দাঁড়াবার আগেই তলোয়ারের এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন ছাগলের মাথা। ছাল ছাড়িয়ে নিলেন অভ্যস্ত হাতে। তারপর জিনের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেঁধে নিলেন ছাল ছাড়ানো ছাগলের লাশ।

অনেক ছোটাছুটি হয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে বাদশাহর, ঘোড়াটারও একই অবস্থা। দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। অজানা অচেনা জায়গা। পানি কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই বাদশাহর। যেদিকে তাকান, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পানির চিহ্নও নেই কোনোদিকে।

অনেক খুঁজতে খুঁজতে শেষে পানি পাওয়া গেল। এককালে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছিল ঝরনা, এখন শুকিয়ে গেছে। পানি যেখানে ঝরে পড়ত, সেখানে গভীর ছড়ানো গর্ত হয়ে আছে। বৃষ্টির পানি জমে আছে তাতে। তবে তেমন পরিষ্কার নয় পানি। কেমন যেন ঘোলাটে।

তেষ্টায় প্রাণ যায়। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে এলেন বাদশাহ। গলায় ঝোলানো পেয়ালা খুলে নিয়ে ঘোলাটে পানিই তুলে নিলেন। প্রথমেই পেয়ালাটা ধরলেন পাখির মুখের সামনে। অদ্ভুত এক কাজ করল পাখিটা। ডানার এক ঝাপটায় পেয়ালাটা ফেলে দিল বাদশাহর হাত থেকে।

অবাক হলেন বাদশাহ। কিন্তু তাঁর প্রিয় পাখি। কিছু বললেন না। আবার পেয়ালায় ভরে পানি নিয়ে তুলে ধরলেন পাখির মুখের সামনে। আবার ডানা ঝাপটা মেরে একইভাবে পানি ফেলে দিল পাখিটা।

বিরক্ত হলেন সিনবাদ। পেয়ালা ভরে আবার পানি তুললেন। এবার আর পাখিটাকে দিলেন না। ঘোড়ার মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। আবার সেই একই কাণ্ড। ছুটে এসে ডানার ঝাপটা মেরে পানিটুকু ফেলে দিল বাজ।

ভয়ানক রেগে গেলেন বাদশাহ। একটানে তলোয়ার বের করে পাখির দুটো ডানাই কেটে ফেললেন। আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে এটার...

কাটা জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে পাখিটার। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। একবার তাকাচ্ছে বাদশাহর দিকে, তারপর মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে উপর দিকে। বারবার একই কাণ্ড করল পাখিটা।

এমন করছে কেন পাখিটা! অবাক হয়ে ভাবলেন বাদশাহ। পাখির অনুকরণে উপর দিকে তাকালেন। চমকে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। একি! তাঁদের মাথার উপরেই বিশাল এক গাছের ডালপালা ছড়ানো। ডালে ডালে অসংখ্য সাপ। বিষাক্ত লালা ঝরে ঝরে পড়ছে আশপাশের মাটিতে, বেশির ভাগই পড়ছে গর্তের পানিতে।

সবই বুঝতে পারলেন বাদশাহ। হাহাকার করে উঠলেন তিনি। অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে খাক হতে লাগল অন্তর। কিন্তু কিছুই করার নেই আর। ডানাকাটা পাখিটাকে নিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে এলেন তাঁবুতে।

সাংঘাতিক রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তাঁবুতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই মারা গেল পাখিটা। হায় হায় করতে লাগলেন বাদশাহ। কপাল চাপড়ে বিলাপ করতে লাগলেন, আর কেউ না, আর কেউ না! আমিই খুন করলাম পাখিটাকে...

কাহিনী শেষ করে উজিরের দিকে তাকালেন ইয়ুনান।

উজির বলল, কিন্তু জাঁহাপনা, এই গল্পের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? বুঝলাম, বাজপাখিটাকে ভুল করে মেরে ফেলেছিলেন বাদশাহ সিনবাদ। অনুশোচনা করেছেন। পাখিটা ছিল বাদশাহর সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু রায়ান? ও হল এক দারুণ ফন্দিবাজ, শয়তান। আসলে জাঁহাপনা এখন রায়ানের মোহে অন্ধ। তাই ভালোমন্দ বিচার করতে পারলেন না। মোহ কেটে গেলে আপনা থেকেই সব বুঝতে পারবেন। তবে তখন আর করার কিছুই থাকবে না, বলে রাখলাম...উজির আর সেই শাহজাদার গল্প শোনেননি, জাঁহাপনা?

মাথা নাড়ালেন সুলতান। না-তো...

বেশ, তাহলে শুনুন, বলে গল্প আরম্ভ করল উজির :

শাহজাদা আর রাক্ষসী

এক দেশে ছিলেন এক বাদশাহ। তাঁর এক ছেলে ছিল। ঘোড়ায় চড়া আর শিকারে ভীষণ ঝোঁক শাহজাদার। তাকে দেখাশোনার ভার রয়েছে উজিরের ওপর। দিনরাত শাহজাদার সঙ্গে সঙ্গে থাকাই উজিরের কাজ।

উজির হল উজির। শাহজাদার দেখাশোনা করা, সে তো চাকর-নফরের কাজ। কাজটাকে মোটেও সম্মানের চোখে দেখল না উজির। গর্দান যাবার ভয়ে সামনাসামনি বাদশাহকে কিছু বলতেও পারে না। তবে মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগল, কী করে এই কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়...

একদিন উজিরকে নিয়ে শিকারে বেরোল শাহজাদা। দুজনেই ঘোড়-সওয়ার। টগবগিয়ে পাহাড়-প্রান্তর পেরিয়ে ছুটছে ঘোড়া। আগে আগে চলেছে শাহজাদা, পিছনে উজির।

যেতে যেতে, যেতে যেতে, রাজ্য থেকে অনেক দূরে গিয়ে দেখল তারা, সামনে রাস্তার উপর বসে রয়েছে এক আজব জানোয়ার। এমন জীব এর আগে কখনও দেখেনি শাহজাদা। পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল উজির, শাহজাদা, জলদি ধরুন ওটাকে! পালাতে যেন না পারে! ধরুন!

বেগতিক দেখে ছুটতে শুরু করল জানোয়ারটা। পিছন পিছন ঘোড়া ছোটাল শাহজাদা। ছুটতে ছুটতে রাস্তার পাশে ময়দানে নেমে এল জানোয়ার। শাহজাদাও নামল। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই পেরে উঠল না জীবটার সঙ্গে। হাওয়ার গতিতে ছুটে হারিয়ে গেল ওটা। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল শাহজাদা। ফিরে তাকিয়ে দেখল, উজির নেই তার সঙ্গে। আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না উজিরের ঘোড়া। বুঝল শাহজাদা, বিশাল প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। কোনদিকে যেতে হবে জানা নেই।

শেষমেশ অনুমানে একদিকে রওনা হল শাহজাদা। এই সময় মানুষের কান্নার শব্দ কানে এল তার, মেয়েমানুষের গলা। এই বিজন মরুপ্রান্তরে কে কাঁদে! ঘোড়ার মুখ ঘোরাল সে। কান্নার আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিলে চলল।

কিছুদূর এসে মেয়েমানুষের দেখা পেল শাহজাদা। অসামান্য সুন্দরী এক যুবতী বসে বসে কাঁদছে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল শাহজাদা, কে তুমি, সুন্দরী? কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?

ফুঁপিয়ে উঠে বলল মেয়েটি, আমি হিন্দের শাহজাদি। দলছাড়া হয়ে পড়েছি।

এখন আর দলের লোকদের খুঁজে পাচ্ছি না। পথও অচেনা। যদি দয়া করে আমার লোকের কাছে পৌঁছে দাও, শাহজাদা...কান্না ভেজা ডাগর দুই চোখ তুলে শাহজাদার দিকে তাকাল মেয়েটা।

মায়া হল শাহজাদার। মেয়েটিকে তুলে নিল ঘোড়ার পিঠে।

চলতে চলতে অনেকখানি এসে সামনে একটা কুঁড়েঘর দেখা গেল। ঘরটার কাছে আসতেই মেয়েটি বলল, শাহজাদা, একটু রাখ। আমি আসছি।

কুঁড়ের ভিতর গিয়ে ঢুকল মেয়েটা। ঢুকল তো ঢুকলই। আর আসে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠল শাহজাদা। হল কী! শেষে আর থাকতে না পেরে নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। পায়ে পায়ে হেঁটে কুঁড়ের দরজার কাছে চলে এল। ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। কথা বলছে কারা যেন।

খানিকটা সরে এসে বেড়ার এক ফাঁকে চোখ রাখল শাহজাদা। ভিতরে উঁকি দিল। চমকে উঠল সে। কোথায় সেই সুন্দরী যুবতী। ভয়ানক এক রাক্ষসীর রূপ ধরেছে সে। আরও দুটো রাক্ষস-রাক্ষসী রয়েছে ঘরে, ও দুটো বুড়োবুড়ি। তরুণী রাক্ষসীর বাপ-মা হবে।

তরুণীটা বলল, আজ চমৎকার একটা খাবার এনেছি। বেশ নাদুস-নুদুস।

বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠল শাহজাদার। বলে কী। হাত-পা হিম হয়ে আসতে লাগল দারুণ আতঙ্কে। শরীর অবশ হবার জোগাড়। আর শোনার অপেক্ষা করল না সে। দ্রুত সরে এল ঘোড়ার কাছে।

চোখের পলকে ঘোড়ায় চেপে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল শাহজাদা। একবার পিছনে ফিরে দেখল, খুরের শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছে তরুণী, আবার মানুষের রূপ ধরেছে। প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল শাহজাদা। অনেক কষ্টে রাক্ষসীর পাল্লা থেকে বেরিয়ে এল।

শাহজাদা বুঝল, ইচ্ছে করেই উজির তাকে রাক্ষসের এলাকায় নিয়ে এসেছে। তারপর তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে কেটে পড়েছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে পথের নির্দেশ পেল শাহজাদা। ফিরে এল আপন রাজ্যে। এসে দেখে, তার আগেই এসে বসে আছে উজির। বাদশাহকে বুঝিয়েছে, শাহজাদাকে রাক্ষসে খেয়ে ফেলেছে। এখন জলজ্যান্ত শাহজাদাকে দেখে তো তার চোখ ছানাবড়া।

বাপের কাছে সব কথা খুলে বলল শাহজাদা। তখনি জল্লাদ ডেকে উজিরের গর্দান নেবার হুকুম দিলেন বাদশাহ।

গল্প শেষ করে সুলতানের দিকে তাকাল ইয়ুনানের উজির।

ইয়ুনান বললেন, বুঝলাম, উজির বেইমানি করছে। কিন্তু এর সঙ্গে রায়ানের সম্পর্ক কী?

আছে হুজুর, আছে। সবচেয়ে প্রিয়পাত্র আর বিশ্বাসীরাই বেইমানি বেশি করে। তাদের চিনতে পারা কঠিন। এমনও তো হতে পারে, রোগ ভালো করে দিয়ে আপনার

বিশ্বাস অর্জন করেছে হকিম। আপনার কাছে ঘেঁষার সুযোগ করে নিয়েছে। এক সময় কোনো উপায়ে খুন করবে আপনাকে। কৌশলে দখল করবে সিংহাসন।

উজিরের চাল বুঝতে পারলেন না বোকা সুলতান। তাঁর মনে হল, তাই তো! যে হকিম একটা সাধারণ বাঁশের লাঠি হাতে তুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগ সারিয়ে ফেলতে পারে, তার অসাধ্য কী আছে! কে জানে, ব্যাটা জাদুকর কিনা! কৌশলে হয়তো তাঁর রাজ্য দখল করতে এসেছে! এসব কথা মনে পড়তেই রায়ানকে ডেকে পাঠালেন ইয়ুনান।

সুলতানের তলব পেয়ে দেরি করলেন না রায়ান। দরবারে এসে হাজির হলেন। হাতজোড় করে বললেন, জাঁহাপনা আমায় ডেকেছেন?

সুলতান বললেন, হ্যাঁ। কেন ডেকেছি, জানো?

কুর্নিশ করে বললেন রায়ান, আপনার মনের কথা আমি কী করে জানব, হুজুর।

তোমাকে ডাকা হয়েছে গর্দান নেবার জন্য।

আঁতকে উঠলেন হকিম। আমার অপরাধ।

পারিষদের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হচ্ছে, তুমি জাদুকর। আমাকে খুন করে সিংহাসন দখল করতে এসেছ। তাই, বুঝে যখন ফেলেছি, আর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

জল্লাদ তৈরিই ছিল। তাকে ডেকে বললেন সুলতান, এখনি এই বেঈমানের গর্দান নাও!

অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন রায়ান। নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলেন।

কিন্তু মন টলল না বোকা সুলতানের। তিনি বললেন, তোমার ওপর থেকে বিশ্বাস চলে গেছে আমার। সাধারণ একটা বাঁশের লাঠি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কঠিন রোগ সারিয়ে ফেলেছ। তোমার অসাধ্য কিছু নেই। কোনদিন হয়তো হাতে একটা ফুল তুলে দিয়ে মেরে ফেলবে আমাকে। তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে নিজে মরতে পারব না।

রায়ানের কোনো কথাই শুনলেন না সুলতান। তাঁর হুকুমে জল্লাদ এসে চোখ বেঁধে ফেলল হকিমের।

বিড়বিড় করে সুলতানকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন রায়ান, হায় খোদা! উপকারের এই কি শাস্তি? এ তো সেই শয়তান কুমিরের কাহিনীর মতো অবস্থা।

কৌতূহলী হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান, কোন শয়তান কুমির?

সে আর বলে কী হবে? মরার সময় আর গল্প বলার ইচ্ছে নেই আমার। হায় খোদা, এই কি আমার উপকারের দান! কাঁদতে লাগলেন বৃদ্ধ।

সুলতানের দরবারের সব মানুষই উজিরের মতো খারাপ নয়, কিছু ভালো লোকও ছিল। হকিমের জন্য মায়া হল তাদের। দাঁড়িয়ে উঠে সুলতানের কাছে আর্জি পেশ করল, জাঁহাপনা, হকিমকে ছেড়ে দিন, এই আমাদের প্রার্থনা। লোকটাকে খারাপ মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া আপনার রোগ সারিয়েছেন তিনি। নতুন জীবন দিয়েছেন। তাঁকে মেরে ফেলার হুকুম দেয়াটা বোধহয় ঠিক হল না।

কিন্তু বোকা সুলতানের মাথায় পোকা ঢুকেছে। বললেন, না-না, তোমরা আমাকে অনুরোধ কোরো না। হকিমের সাংঘাতিক ক্ষমতা। তুচ্ছ কায়দায় আমার কঠিন রোগ সরিয়ে ফেলেছে, তুচ্ছ কোনো উপায়েই মেরেও ফেলতে পারবে। কে জানে, আমাকে মারার জন্যই হয়তো কেউ পাঠিয়েছে ওকে। হয়তো অনেক বড় ইনাম পাবে তার কাছে। আমি শান্তিতে বাঁচতে চাই। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে শান্তি পাব না আমি, ঘুমোতে পারব না। কাজেই মেরেই ফেলতে হবে ওকে।

পারিষদেরা আর কিছু বলল না। বুঝতে পারল ওরা, সুলতানকে বলে লাভ নেই। কোনো কাজ হবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওদের ধরেই আবার জল্লাদের হাতে তুলে দেবে। একে একে বসে পড়ল ওরা।

হকিম রায়ান দেখলেন আর কোনো আশাই নেই। হাতজোড় করে বললেন, আমার একটা শেষ ইচ্ছে আছে, জাঁহাপনা।

কী ইচ্ছে?

অনেকগুলো মূল্যবান বই আছে আমার। ওগুলো আমার একজন সহচরকে দিয়ে আসতে চাই। একটা বই আছে, যার ভিতর সব রোগের সারকথা লেখা আছে। কী করে কোন রোগ সারে, তার ওষুধ লেখা আছে বইতে। ওটাও আমার সহচরকে দান করে আসতে চাই। মানুষের উপকারে লাগাতে পারবে। হুজুর যদি একবারের জন্য আমাকে আমার বাসায় যেতে দেন...

সত্যি বলছ? এমন বই আছে তোমার কাছে?

নিশ্চয়ই। শুধু রোগই নয়, আরও অনেক কিছু লেখা আছে বইটাতে। আমাকে যখন কেটে ফেলবে জল্লাদ, ধড় থকে মুণ্ড আলাদা হয়ে যাবে, ওই বইয়ের তিন নম্বর পাতা খুলে প্রথম তিনটি লাইন পড়বেন। দেখবেন, আমার মরা মুণ্ড কথা বলতে শুরু করেছে।

ভারি মজার ব্যাপার! এমন জিনিস আছে তোমার কাছে?

হ্যাঁ, জাঁহাপনা সত্যিই আছে। আরও অনেক জাদুর কৌশল লেখা আছে বইটাতে। পড়ে, যে-কেউ সহজেই শিখতে পারবে ওই জাদু।

তাই নাকি! তাহলে তো ও বই আমার চাই। বলে প্রহরী সঙ্গে দিয়ে রায়ানকে তাঁর বাসায় পাঠিয়ে দিলেন সুলতান।

একটু পরেই ফিরে এলেন রায়ান। দরবারের সব লোক তেমনি বসে আছে, সুলতান বসে আছেন সিংহাসনে, সবাই কৌতূহলী। সবাই দেখতে চায় হকিমের বইতে লেখা জাদুর কেরামতি। হকিম ঢুকতেই সবাই উৎসুক চোখে তাকাল তাঁর দিকে।

হকিমের হাতে একটা মোটা বই। সেটা সুলতানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার কাটা মুণ্ড থেকে রক্তপড়া বন্ধ হলে তারপর বই খুলবেন। তিন নম্বর পাতার প্রথম তিনটি লাইন পড়ে আমার মুণ্ডুর ওপর ফুঁ দিলেই কথা বলতে শুরু করবে। মনে রাখবেন রক্ত বন্ধ হবার পর...

হকিমের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছোঁ মেরে বইটা নিয়ে নিলেন সুলতান। রায়ানের কথা যেন কানেই যাচ্ছে না। মুণ্ডু যে কাটা হয়নি এখনও, খেয়ালই নেই। বই হাতে নিয়ে ওটার পাতা ওল্টাতে চেষ্টা করলেন সুলতান। কিন্তু খুলতে পারলেন না। সুলতান ভাবলেন, বেশি পুরনো পুঁথি তো! মলিন পাতাগুলো সেঁটে গেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। জিভ থেকে আঙুলের ডগায় থুতু লাগিয়ে পাতার কোণ ভিজিয়ে নিলেন সুলতান। তারপর অনেক কায়দা করে খুললেন একটা পাতা। কিন্তু কই, কিছু তো লেখা নেই। একেবারে সাদা!

একই কায়দায় আঙুলে থুতু লাগিয়ে দুই নম্বর, তারপর তিন নম্বর পাতাটা খুললেন সুলতান। তিন নম্বর পাতাটাও সাদা। কড়া চোখে রায়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, কই, কিছু তো লেখা নেই! তুমি না বলেছিলে– আর বলতে পারলেন না সুলতান। বোঁ করে ঘুরে উঠেছে তাঁর মাথা। হাত-পা কেমন অবশ হয়ে আসছে! মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠল। কোনোমতে দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন শুধু, বিষ! বিষ!

হ্যাঁ, বিষই, বইয়ের সাদা পাতায় কায়দা করে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিলেন হকিম।

কাহিনী শেষ হল। দৈত্যকে বলল জেলে, কী বুঝলে, আফ্রিদি? দুনিয়ার নিয়মই এই, যেচে-পড়ে উপকার করলেই বিপদে পড়তে হয়। আবার, আরেকটা জিনিস পরিষ্কার হয় এ কাহিনী থেকে। সৎ লোককে কোনো না কোনো উপায়ে বাঁচিয়ে দেন আল্লা। অকৃতজ্ঞকে সাজাও দেন। এই যেমন তোমাকেও দিয়েছেন। আমি তোমার পাল্লায় পড়েছিলাম, এবার তুমি পড়েছ আমার পাল্লায়। আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে। এবার? এবার আমি তোমাকে জালাসুদ্ধ পানিতে ফেলে দেব। দেখি কে বের করে!

অনুনয় বিনয় করতে লাগল দৈত্য, আল্লার দোহাই ভাই, আমাকে আর পানিতে ফেলো না। তুমি কত মহৎ, কত উদার। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজের ভুল বুঝতে পারছি। আর কখনও এমন অন্যায় কাজ করব না। তুমি তো জান, ভাই, অন্যায় করে শেষে অনুতপ্ত হলে অপরাধীকে ক্ষমা করা যায়। তা সে যতবড় অপরাধীই হোক না কেন। উমান আর অতিকাউরের কাহিনী শোননি?

উৎসুক হয়ে উঠল জেলে। বলল, না-তো! বল দেখি কী সেই কাহিনী?

দৈত্য বলল, জালার ভিতরে বন্দি থেকে তো গল্প বলতে পারব না, বলতে ভালোও লাগবে না। দয়া করে আমাকে বের কর, গল্প শোনাব তোমাকে।

দৈত্যের কথায় ভুলল না জেলে। বলল, থাক, গল্প শোনার দরকার নেই আমার। তোমাকে ছেড়ে দিলেই আমি শেষ। ওসব কথায় ভুলছি না আর। তোমাকে এখনি পানিতে ফেলব। জালাটা ধরে ঠেলা দিল জেলে। যেন পানিতে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে।

হাউমাউ করে উঠল দৈত্য। দোহাই তোমার, জেলে। খোদার কসম! আমি তোমাকে কিচ্ছু করব না। তোমাকে গল্প শোনাব। ধনদৌলতে তোমার ঘর ভরে দেব। দয়া কর, দয়া করে ছেড়ে দাও আমাকে। এই আমি কান মলছি, আর কখনও মানুষের অপকার করব না। খোদার কসম...খোদার কসম...

থেমে গেল জেলে। কী যেন ভাবল। বিশ্বাস করে ফেলল দৈত্যের কথা। শেষমেশ সত্যিই জালার মুখটা খুলে দিল সে।

জালার মুখ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে গেল আকাশে। ধীরে ধীরে ধোঁয়ার ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে এল বিরাট দৈত্য। প্রচণ্ড এক লাথি মেরে জালাটা ছুড়ে ফেলে দিল নদীর পানিতে। দেখেশুনে জেলের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া।

দৈত্যের ভয়ানক চোখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল জেলে। বুক শুকিয়ে কাঠ। ভয়ে ভয়ে বলল সে, আল্লার নামে কসম খেয়েছ তুমি, আফ্রিদি, আমার কোনো ক্ষতি করবে না। এখন এসব কী করছ? ইয়ুনানের কাহিনী তো শুনিয়েছি। বুঝলে না, আল্লা অন্যায় সহ্য করেন না?

হা হা করে হেসে উঠল দৈত্য। জেলেকে বলল, এস আমার সঙ্গে। বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল সে।

রঙিন মাছ

জেলের মনে শঙ্কা। না জানি কোথায় নিয়ে যেতে চায় তাকে ব্যাটা! কিন্তু কিছু তো করার নেই। দৈত্যের পিছন পিছন চলতে লাগল জেলে, আর মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগল।

নদীর ধার থেকে অনেক দূরে সরে এল ওরা। গ্রাম ছাড়িয়ে এল। সামনে পাহাড়। ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল দৈত্য। জেলেও রয়েছে তার পিছনে। এক সময় দুজনেই পাহাড়ের মাথায় উঠে এল।

ওপারে তাকাল জেলে। একি! কী সুন্দর উপত্যকা! চারদিকে সবুজ আর সবুজ, মাঝখানে নীল পানির সরোবর। চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু যতদূর চোখ যায়, কোথাও জনমনিষ্যির চিহ্নও নেই। জেলেকে নিয়ে উপত্যকায় নেমে এল দৈত্য। সরোবরের ধারে এসে থামল। বলল, জাল ফেলো।

অবাক হয়ে দেখল জেলে, সরোবরের স্বচ্ছ পানিতে অসংখ্য মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী তাদের রঙ, আর কী রূপ। জাল ফেলল জেলে। চারটে মাছ উঠল, চার রঙের। খুশি আর ধরে না জেলের।

দৈত্য বলল, মাছ চারটে নিয়ে এখানকার সুলতানের কাছে চলে যাও। অনেক ইনাম পাবে; বড়লোক হয়ে যাবে।

লজ্জিত হল জেলে। দৈত্যকে বলল, দেখো, ভাই, আমি মুখ্খু-সুখ্খু গরিব জেলে। আদব-কায়দা কিচ্ছু জানি না। কী বলতে কী বলে ফেলেছি তোমাকে মাপ করে দিয়ো।

জিভ কেটে বলল, দৈত্য, ছি-ছি, কী যে বল! তোমার কাছেই মাপ চাওয়া উচিত আমার। আমাকে বাঁচিয়েছ, অথচ আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলাম...যাক গে, এক কাজ করবে...এখন থেকে রোজ একবার করে এই সরোবরে জাল ফেলবে। চারটে করে মাছ উঠবে। নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবে সুলতানের কাছে। অনেক ইনাম পাবে। খবরদার। একবারের বেশি জাল ফেলো না।

আর কোনো কথা বলল না দৈত্য। এক লাফে উঠে পড়ল আকাশে। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল মেঘের দেশে।

বাড়ি ফিরে এল জেলে। একটা মাটির হাঁড়িতে করে মাছ চারটে নিয়ে রওনা হল শহরে। হাঁড়ির পানিতে খলবল করে নাচছে মাছগুলো। সুলতানের প্রাসাদে পৌঁছে গেল জেলে। দরবারে ঢুকে সুলতানকে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

একজন জেলে ঢুকে পড়েছে দরবারে, প্রথমে সুলতান তো মহাখাপ্পা। কিন্তু হাঁড়িতে সুন্দর মাছগুলো দেখে রাগ চলে গেল তাঁর, খুশি হয়ে উঠলেন। এমন আজব মাছ জীবনে দেখেননি তিনি। রুমের বাদশাহ দিন তিনেক আগে একটা নিগ্রো রাঁধুনি উপহার পাঠিয়েছেন। কেমন রাঁধে সে, এখনও চেখে দেখা হয়নি। ওই রঙিন মাছ দিয়েই রাঁধুনির পরীক্ষা নেয়া যাবে, ভাবলেন সুলতান। উজিরকে ডেকে বললেন, এই মাছ রান্নাঘরে পাঠিয়ে দাও। নতুন মেয়েটাকে রাঁধতে বল।

মাছগুলো নিয়ে গিয়ে রাঁধুনির হাতে তুলে দিল উজির। বলল, খুব ভালো করে রাঁধো। সুলতান খাবেন। এমন রান্না করবে, প্রথমবার খেয়েই যেন তোমার প্রশংসা করেন তিনি। আর একবার সুলতানের সুনজরে পড়ে গেলে তোমার কপাল খুলে যাবে।

দরবারে ফিরে এল উজির। তাকে সুলতান হুকুম দিলেন, এই জেলেকে চারশো দিনার ইনাম দিয়ে দাও।

এত টাকা জীবনে চোখে দেখেনি জেলে। দিনারগুলো কাপড়ে খুঁটে বেঁধে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল সে। বৌকে ডেকে বলল, অনেক টাকা পেয়েছি। ছেলেমেয়েগুলোকে এবার একটু ভালোমন্দ খাওয়াতে পারব। সুন্দর দেখে জামা-কাপড় কিনে দিতে পারব।

সুলতানের রান্নাঘরে মাছ কেটেকুটে ধুয়ে চুলোয় চাপিয়ে দিল সেই নিগ্রো রাঁধুনি। এক পিঠ ভাজা হয়ে এসেছে, উল্টে দিতে গেল সে। এমন সময় ঘটল এক আজব ঘটনা। রান্নাঘরের একদিকের দেয়াল দু'ভাগ হয়ে গেল, সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকল এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী। আয়ত চোখে সুরমা টানা, যৌবন যেন ফেটে পড়ছে। দেহের গঠন চমৎকার। মাথায় নীল রঙের রেশমি রুমাল, দুই কোণ টেনে চিবুকের তলায় এনে বেঁধেছে। হাতে সোনার বালা, আঙুলে হীরা-চুনি-পান্না বসানো কয়েকটা আংটি।

সোজা চুলোর কাছে এগিয়ে এল যুবতী। হাতে একটা বাঁশের ফাঁপা লাঠি। লাঠির এক মাথা কড়াইয়ের উপর নিয়ে এসে, অন্য মাথা ঠোঁটের কাছে এনে ডাকল, মাছ ভাই, মাছ ভাই, শুনছ?

কাণ্ড দেখে বাঁধুনির তো ভয়ে বেহুঁশ হওয়ার জোগাড়।

কয়েকবার মাছগুলোকে ডাকল যুবতী। খানিক পরেই কড়াই থেকে মাথা তুলল মাছগুলো। জবাব দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি, বল।

কড়াইটা ধরে উল্টে আগুনের ভিতর মাছগুলোকে ফেলে দিল যুবতী। তারপর যে পথে এসেছিল, সেই পথেই বেরিয়ে গেল। আবার আগের মতো জোড়া লেগে গেল দেয়াল।

এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরল রাঁধুনির। দেখে, আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে মাছগুলো। কপাল চাপড়ে বিলাপ শুরু করল সে, হায় হায়, আমার কী হবে গো! সুলতান শুনলে, মুণ্ডু যাবে গো...

খবর গেল উজিরের কাছে। পড়িমরি করে ছুটে এল সে। রেগে গিয়ে ধমক লাগাল রাঁধুনিকে, হুঁশ থাকে না, না? এত শখ করে মাছ পাঠালেন সুলতান, আর তুমি কি না পুড়িয়ে ছাই করেছ! গর্দান এবার ঠিকই যাবে তোমার!

আরও জোরে কেঁদে উঠল রাঁধুনি। উজিরের একটু মায়া হল। জিজ্ঞেস করল, কেমন করে পুড়ল?

সব কথা খুলে বলল রাঁধুনি। অবিশ্বাসের হাসি হাসল উজির। যত্তোসব গাঁজাখুরি গপ্পো।

কিন্তু বার বার কসম খেতে লাগল রাঁধুনি। শেষে, আবার জেলেকে ডেকে পাঠাল উজির। ও-মাছ আরও চারটে দিয়ে যাবার হুকুম দিল। জেলে তো মহাখুশি। আবার চারটে মাছ ধরে নিয়ে এল সে। উজিরের কাছ থেকে চারশো দিনার ইনাম নিয়ে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে বাড়ি ফিরল।

রাঁধুনিকে বলল, উজির, এই আমি বসলাম। আমার সামনে রাঁধো। দেখি, কী হয়।

মাছ কেটে আবার চুলায় চাপাল রাঁধুনি। এক পিঠ ভাজা হয়েছে, আবার সেই একই ঘটনা ঘটল। ব্যাপার দেখে উজির তো থ। তাড়াতাড়ি ছুটল সে সুলতানের কাছে। সব খুলে বলল তাঁকে।

হেসেই উড়িয়ে দিলেন সুলতান। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, উজির!

শেষে, উজিরের চাপাচাপিতে আবার জেলেকে ডাকালেন সুলতান। আরও চারটে মাছ নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। আবার মাছ নিয়ে এল জেলে। আবার দিনার নিয়ে বাড়ি ফিরল।

রান্নাঘরে গিয়ে বসলেন সুলতান, উজিরও সঙ্গে রয়েছে। সুলতানের সামনে মাছ কাটল রাঁধুনি, কড়াইয়ে ছাড়ল। এক পিঠ ভাজা হয়ে এসেছে, উল্টাতে যাবে, রান্নাঘরের এক দিকের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল। এবারে কিন্তু সুন্দরী এল না। এল এক আবলুস কালো বিশালদেহী নিগ্রো। হাতে গাছের এক মোটা ডাল। সেটা কড়াইয়ের উপর ধরে মাছকে ডাকল সে। মাছেরা সাড়া দিতেই কড়াই উল্টে মাছগুলোকে আগুনে ফেলে দিল। দেখতে দেখতে পুড়ে গেল মাছ।

অবাক হলেন সুলতান। সন্দেহ করলেন, এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পিছনে গভীর কোনো রহস্য আছে। কৌতূহল হল তাঁর, রহস্যটা কী জানতে হবে।

আবার ডাক পড়ল জেলের। কোথা থেকে মাছ আনে সে, জেনে নেয়া হল তার কাছ থেকে। লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সরোবরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন সুলতান। পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে পৌঁছল সুলতানের বহর।

ঘন সবুজ মনোরম উপত্যকা, চোখ জুড়িয়ে গেল সবার। নির্জন নীল পানির সরোবর। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এর আগে কখনও দেখেননি সুলতান। সরোবরের কাছে গিয়ে সবাই দেখল, অসংখ্য রঙিন মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে পানিতে।

নিজের লোককে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান, এই জায়গায় এর আগে তাদের কেউ এসেছে কিনা। ঘাড় নেড়ে জানাল ওরা, কেউ আসেনি।

বিড়বিড় করে আপন মনেই বললেন সুলতান, আল্লার কসম, আসল রহস্য না জেনে এখান থেকে এক পা নড়ছি না আমি।

পাহাড়ের চারপাশ ঘুরে দেখে আসার জন্য লোকজনকে হুকুম করলেন সুলতান। উজিরকে ডেকে বললেন, উজির, আজ রাতে এই পাহাড়, সরোবরের চারপাশে ঘুরে দেখব আমি, আমার তাঁবুর চারপাশে কড়া পাহারা বসাবে। কেউ দেখা করতে এলে বলবে, আজ রাতে আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না। এই আজব সরোবর আর রঙিন মাছের রহস্য জানতেই হবে আমাকে। খবরদার, এসব কথা কেউ যেন না জানে।

ঘাড় নেড়ে বলল উজির, জানবে না।

লোকেরা কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এসে জানাল, তারা তেমন কিছুই দেখেনি। চুপচাপ রইলেন সুলতান, কিছু বললেন না।

গভীর রাতে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সরোবর আর পাহাড়ের চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। শেষ হয়ে আসছে রাত, কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। ভাবছেন সুলতান, আরেকটু সামনে দেখেই ফিরে যাবেন। খানিকটা এগিয়েই চোখে পড়ল কালো জিনিসটা। বেশ খানিকটা দূরে। কাছে এগিয়ে গেলেন সুলতান। কালো পাথরের বিশাল এক সিংহদরজা। একটা পাল্লা খোলা।

কড়া নাড়লেন সুলতান। সাড়া নেই। একবার, দুইবার, তিনবার। কিন্তু কোনো সাড়া এল না। নির্জন। পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন সুলতান। খানিকটা এগিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলেন, ভিতরে কে আছ, ভাই! আমি এক ক্লান্ত পথিক। বড় তেষ্টা পেয়েছে। যদি দয়া করে একটু পানি দাও...

একই কথা বলে কয়েকবার ডাকলেন সুলতান। তবু সাড়া এল না।

আরও ভিতরে ঢুকলেন সুলতান। প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন। কেউ নেই ভিতরে। সুন্দর প্রাসাদ। চমৎকার সাজানো গোছানো, ঝকঝকে তকতকে। এক জায়গায় একটা ফোয়ারা দেখা গেল। ফোয়ারার চারপাশে বসানো রয়েছে চারটে সোনার সিংহ-মূর্তি। ফোয়ারা থেকে ছিটকে পড়ছে পানি, সেই সঙ্গে পড়ছে হীরা-পান্না-চুনি। মূল্যবান পাথর জমে স্তূপ হয়ে আছে ফোয়ারার চারদিকে।

ভোর হয়ে আসছে। প্রাসাদের এখানে ওখানে সোনার খাঁচায় বন্দি অসংখ্য পাখি দেখতে পেলেন সুলতান। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো মানুষের দেখা পেলেন না। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষে এক জায়গায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে বসলেন সুলতান। সারা রাত জেগেছেন, ঘুমে জড়িয়ে আসছে দুচোখ। চোখ বন্ধ করলেন তিনি।

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল সুলতানের। করুণ গলায় গান গাইছে কেউ। কান পেতে শুনলেন। মনে হল, বেশি দূরে না, কাছেই রয়েছে গায়ক।

গান লক্ষ করে এগোলেন সুলতান। একটা দরজার কাছে চলে এলেন। দরজায় ঝোলানো দামি পর্দা। পর্দা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিলেন। সোনার পালঙ্কে পালকের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর এক অল্পবয়েসী যুবক। কী তার রূপ! টানা টানা চোখ। ছুরির মতো নাক। ঘন কাল কোঁকড়ানো চুল মাথায়। গান গাইছে ওই যুবক।

ভিতরে ঢুকলেন সুলতান। যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি, ভাই?

চোখ তুলে তাকাল যুবক। কিন্তু নড়ল না। যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি থাকল। কোমর পর্যন্ত টেনে দেয়া দামি শাল। বলল, আমি কে, তাতে আর কিছু যায় আসে না এখন। আমাকে মাপ করবেন। আমি উঠতে পারছি না।

অবাক হলেন সুলতান, দুঃখিত। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, নীল সরোবরের মাছের রহস্য জানো তুমি? জানলে, বল না। আর তোমারই-বা কী হয়েছে? এমনভাবে গান গাইছ, দুঃখে যেন বুক ভেঙে যাচ্ছে তোমার।

চোখ ছলছল করে উঠল যুবকের। কোনোমতে কান্না চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কপাল...সবই কপাল!

হাত বাড়িয়ে গায়ের উপর থেকে শালটা সরিয়ে দিল যুবক।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সুলতান। কোমরের কাছ থেকে পাথর হয়ে গেছে যুবকের দেহ, মারবেল পাথর।

ফিসফিস করে বললেন সুলতান, একি...এমন হল কী করে!

শুনুন তাহলে আমার দুঃখের কাহিনী। বলতে লাগল যুবক :

সুলতানজাদার কাহিনী

আমার বাবা ছিলেন সুলতান। আল্লার রহমতে সত্তর বছর প্রজাপালন করে গেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সুলতান হলাম। আগে থেকেই ভালোবাসতাম আমার চাচার মেয়েকে। সে-ও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। কোনো কাজে তাকে ছেড়ে দূরে যদি কোথাও যেতাম, নাওয়া-খাওয়াই ভুলে যেত সে, এমনি ছিল তার ভালোবাসা। আমি সিংহাসনে বসেই বিয়ে করলাম তাকে।

দিন কাটে। একদিন গোসলের জন্য হামামে ঢুকেছে সে। বাবুর্চিকে হুকুম করে গেছে, নানারকম খাবার সাজাতে। আমি শুয়ে আছি পালঙ্কে, তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব। চোখ বন্ধ। আমার দুপাশে বসে বাতাস করছে দুজন ক্রীতদাসী। হঠাৎ মৃদুস্বরে ওদের কথা বলার আওয়াজ কানে এল। ওরা ভেবেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। এক দাসী বলছে, আমাদের মালিকের কী মন্দ কপাল, বোন, এমন একটা খারাপ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করছে! রোজ রাতে একটা করে নতুন মরদ না হলে ওই ওর ঘুম আসে না। আমাদেরও কপাল খারাপ! নইলে এমন একটা মেয়েমানুষের বাঁদিগিরি করতে হয়! অথচ আমাদের মালিক, কী সোনার মানুষ! কোনো ঘোরপ্যাঁচের মাঝে নেই। কেউ যে ঠকাতে পারে, কথাটা মনেই আসে না তাঁর! নইলে বদমাশ মেয়েমানুষটার কীর্তিকলাপের কথা কবে জেনে যেতেন।

অন্য দাসীটা বলল, কী করে জানবেন, বল? উনি কি আর জেগে থাকেন? রোজ রাতে তাঁর মদের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে দেয় শয়তানিটা। তাই খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন মালিক। তারপর সারারাত পরপুরুষের সাথে কাটিয়ে এসে ভোরে মালিকের নাকের কাছে কী একটা ধরে বেগম। ঘুম ভাঙে মালিকের।

বাঁদিদের কথা শুনে দুনিয়া আঁধার হয়ে এল আমার। ঝিমঝিম করে উঠল মাথা।

একটু পরে হামাম থেকে ফিরে এল বেগম। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। আদর করে জাগাল আমাকে সে। এটা রোজকার ঘটনা। দুজনে খেতে বসলাম। ভালো ভালো খাবার, দামি মদ। তৃপ্তি করে খেলাম দুজনে।

রোজ রাতে শোবার আগে এক পেয়ালা মদ খাওয়ার অভ্যেস আমার। নিজের হাতে পেয়ালা ভরে আমার হাতে তুলে দেয় বেগম। সেদিনও কোনো নড়চড় হল না। হাত বাড়িয়ে অন্যান্য দিনের মতোই নিলাম। তারপর বেগমের অগোচরে কায়দা করে পিকদানিতে ঢেলে ফেলে দিলাম মদটুকু। বালিশে মাথা রেখে চোখ

মুদলাম। আদর করে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল বেগম। গভীর ঘুমের ভান করে নাক ডাকাতে লাগলাম। কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিল বেগম। একটা কুৎসিত খিস্তি করে বলল, ঘুমোরে, হাঁদা, জলদি ঘুমো। ইস, কী সোয়ামি আমার। সুরৎ দেখলেই গা জ্বলে যায়।

আড়চোখে দেখলাম, সাজগোজ করছে বেগম। দামি জমকালো কাপড় পরল। সুর্মা টানল চোখে। সুন্দর করে খোঁপা বাঁধল। একটা তাজা লাল গোলাপ গুঁজল খোঁপায়। দামি আতর ছিটাল সারা গায়ে। খোশবুতে ভরে গেল ঘর। আমার খাপসুদ্ধ তলোয়ারটা তুলে নিয়ে কোমরে ঝোলাল। বোরখা পরল। মুখে নেকাব টেনে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

উঠে পড়লাম আমিও। বেগমকে অনুসরণ করে চললাম। প্রাসাদের চত্বর ছাড়াল সে, সিংহদরজা পেরিয়ে এগিয়ে চলল শহরের সীমান্তের দিকে। কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের বাস নেই ওদিকটায়। চাকর-বাকর, দাস-দাসীদের বস্তি।

মাটির দেয়াল, খড়ের ছাউনি দেয়া একটা ছোট্ট কুঁড়েতে ঢুকে পড়ল বেগম। ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে ভিতরে তাকালাম। দেখতে লাগলাম আমার প্রাণপ্রিয় বেগমের কাণ্ড কারখানা।

ঘরের মেঝেতে বসে আছে কুচকুচে কালো বিশাল এক নিগ্রো। পুরু ঠোঁট, নিচের ঠোঁটটা ঝুলে আছে বিচ্ছিরিভাবে। চৌকোনা বড় বড় বিকট দাঁত। হাতে আখ। চারপাশে ছড়ানো চিবোনো আখের ছোবড়া। নোংরা করে ফেলেছে। পায়ের কাছে মাটির হাঁড়িতে মদ।

নিগ্রোটার পায়ের কাছে মাথা রেখে সম্মান জানাল আমার বেগম। দাঁত-মুখ খিচিয়ে অকথ্য ভাষায় অশ্রাব্য খিস্তি করে উঠল নিগ্রোটা।

মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল বেগম, তুমি তো জানো, মালিক, আমার স্বামী আছে। সে সুলতান। তাকে ঘুম পাড়িয়ে আসতে হয়। আগে, যখন বিয়ে হয়নি আমার, তখন কি আসতে দেরি হত? এখন তো অনেক বাধা। সুলতান জানতে পারলে, গর্দান যাবে আমাদের। লোকটাকে কুকুরের মতো ঘেন্না করি আমি। ওর কাছে গেলে, ওর মুখ দেখলে রি রি করে ওঠে গা...কিন্তু তোমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি আমি। যদি উপায় থাকত সব কিছু ভেঙেচুরে তোমার কাছে চলে আসতাম...

খেঁকিয়ে উঠল নিগ্রোটা, থাম! তোর অনেক ঢং দেখেছি। ঠিক করে বল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি। এই শেষবার হুঁশিয়ার করছি তোকে, ফের যদি কখনও দেরি করবি, অন্য মেয়েমানুষ জোগাড় করে নেব আমি। আমি যদি যদি নিগ্রোর বাচ্চা হই, তোকে লাথি মেরে খেদাব।

নিগ্রো আর বেগমের মুখ খিস্তি, কথাবার্তার ধরন দেখে কান গরম হয়ে গেল আমার। রক্তে ঝড় উঠল। মনে হল, তামাম দুনিয়াটা মিথ্যে। মস্ত বড় এক ধাপ্পা!

কিসের জন্য বেঁচে থাকে মানুষ? ধনদৌলত দূরে থাক, প্রেম-ভালোবাসারও কি কোনো মূল্য নেই!

নিগ্রোর কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল আমার বেগম। বলতে লাগল, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই আমার। বিশ্বাস কর, আমি শুধু তোমার। আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না। চিরকাল তোমার হয়েই থাকব। বিশ্বাস কর...

বেগমের কান্নায় একটু নরম হল নিগ্রোটা, বলল, ঠিক আছে, মনে থাকে যেন...কাছে আয়...

হাসি ফুটল বেগমের মুখে। সঙ্গের তলোয়ারটা একপাশে একটা বাক্সের উপর নামিয়ে রাখল। বলল, বড় খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেতে দেবে না?

আখ তুলে দেখিয়ে দিল নিগ্রো, ওই দেখো, ওখানে ইঁদুরের ঝোল আছে খানিকটা। হাঁড়িতে মদও আছে। জলদি শেষ কর।

কুখাদ্য ইঁদুরের ঝোল আর পচা মদ। এমনভাবে খেল বেগম, যেন শাহী খাবার। ময়লা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে নিগ্রোটার পাশে ওর ছেঁড়া তেল চিটচিটে দুর্গন্ধে ভরা বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝুঁকে পড়ল নিগ্রোটা। আর সহ্য করতে পারলাম না। এক লাফে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বাক্সের উপরে রাখা খাপ থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়েই কোপ মারলাম নিগ্রোর ঘাড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বিকট চিৎকার দিয়ে বেগমের বুকের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল নিগ্রোটা। ভেবেছিলাম, এক কোপেই সাবাড় হয়ে যাবে দুটোই, কিন্তু হল না। মোষের গর্দানের মতো শক্ত নিগ্রোর গর্দান। পুরোপুরি কাটল না। নিচে পড়ে গেল ব্যাটা। আমি ভেবেছিলাম মরে গেছে, কিন্তু ভুল করেছিলাম। আর তারই খেসারত দিতে হচ্ছে এখন।

যাই হোক, বেগমকে নিয়ে প্রাসাদে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলল বেগম, আমার পায়ে ধরে মাপ চাইল। বার বার বলল, সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। ভাবলাম, সত্যি কথাই বলছে। তা ছাড়া নারীহত্যা করে কী লাভ? মাপ করে দিলাম ওকে।

পরদিন সকালে দেখি, মাথার চুল সব ছেঁটে ফেলেছে বেগম। কী ব্যাপার, বলল, ওর মা নাকি মারা গেছে। কয়েকদিন আগে যুদ্ধে গিয়ে ওর বাপ আর ভাই মারা গেছে, একথা আমি জানি। এখন মা মরল। পরপর তিনজন আপনজনের মৃত্যু সইতে পারছে না বেচারি। একেবারে ভেঙে পড়েছে। পরনে কালো শোকের পোশাক। কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গেছে চোখ। ফুঁপিয়ে উঠে আমাকে বলল, আমাকে একটা শোক-মঞ্জিল বানিয়ে দাও। সেখানে থেকে এক বছর আমি ব্রত পালন করব। বাবা-মা-ভাইয়ের আত্মার শান্তির জন্য রহমত চাইব আল্লাহর কাছে।

প্রাসাদের বাইরে একটু নির্জন জায়গায় বেগমের জন্য শোকমঞ্জিল বানিয়ে দিলাম। সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে ব্রত পালন করে সে। করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে শোক পালন করে। কিন্তু শয়তানির মনের আসল কথা কি তখন জানি আমি!

আসলে, গর্দান-কাটা নিগ্রোটাকে এনে ওর মঞ্জিলে তুলেছিল সে। হকিমের কাছ থেকে ওষুধ এনে খাইয়েছে, মলম লাগিয়েছে। সেবা করেছে। মুরগির ঝোল, দামি মদ আর নানান পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে আস্তে আস্তে ভালো করে তুলেছে ওকে।

একদিন বিকেলে শোকমঞ্জিলে যাবার সময় বেগমের ওপর আমার চোখ পড়ল। পুঁটুলিতে করে খাবার নিয়ে যাচ্ছে সে, পুঁটুলিটা দেখে তখন অবশ্য সেটা বুঝতে পারিনি। আমার কেমন সন্দেহ হল। অনুসরণ করলাম বেগমকে। মঞ্জিলে গিয়ে ঢুকল সে।

দরজায় কান পাতলাম আমি। ভিতর থেকে কথা বলার আওয়াজ আসছে। ভিতরে উঁকি দিলাম। দেখি সেই নিগ্রোটা! পালঙ্কে শুয়ে আছে। হাতে তুলে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে আমার বেগম। রক্ত চড়ে গেল মাথায়। কোমরের খাপ থেকে এক টানে তলোয়ার বের করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, শয়তান মেয়েমানুষ, এই তোর ব্রত পালন! আজ দুটোকেই শেষ করব। বলে আরও এক পা এগিয়ে গেলাম।

নিগ্রোটার গর্দান কাটার পর গোপনে গোপনে জাদু শিখেছে আমার বেগম, জানতাম না আমি। এক লাফে পিছনে সরে গেল সে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল। তারপর কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল, তোর কোমর থেকে নিচের অংশ পাথর হয়ে যাক।

সঙ্গে সঙ্গে আমার কোমরের নিচটা পাথর হয়ে গেল। নিজের দেহটাকে নড়াতে চড়াতে পারি না। রোজ একবার করে আসে আমার শয়তান বেগম। হাতে করে নিয়ে আসে চাবুক। প্রচণ্ড মার মারে আমাকে।

গল্প শেষ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল যুবক। গানের সুরে বিচার চাইতে লাগল খোদার কাছে।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, মাছগুলো? এই কাহিনীর সঙ্গে ওগুলোর কি কোনো সম্পর্ক আছে?

ওরা সব মানুষ ছিল। রাজ্যের সমস্ত মানুষকে মাছ বানিয়ে ওই সরোবরে ছেড়ে দিয়েছে শয়তানি।

যুবকের কাহিনী শুনে রাগে জ্বলে উঠলেন সুলতান। বললেন, ওই দুশ্চরিত্রা মেয়েমানুষটা কোথায় এখন?

এই প্রাসাদের পিছনে গম্বুজওয়ালা ছোট্ট একটা বাড়ি আছে। ওখানেই থাকে সে আর নিগ্রোটা। রোজ সন্ধ্যায় একবার করে আসে এখানে। আমাকে চাবুক মারে। আমি নড়তে পারি না। মুখ বুজে তার অত্যাচার সইতে হয়।

উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন সুলতান, আজ থেকে তুমি আমার ভাই। আল্লার কসম খেয়ে বলছি, এর প্রতিশোধ আমি নেবই। উচিত সাজা দেব শয়তানিটাকে।

সারাটা দিন যুবকের ঘরেই কাটিয়ে দিলেন সুলতান। আলাপ-সালাপ করলেন। খেলেন। সাঁঝের একটু আগে বেরিয়ে পড়লেন সুলতান। গম্বুজওয়ালা বাড়িটা খুঁজে বের করলেন। কোন ঘরে থাকে নিগ্রো আর বেগম, বের করতে অসুবিধে হল না। তারপর খোলা তলোয়ার হাতে সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে রইলেন।

খানিক পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল বেগম। হাতে একটা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। প্রাসাদে যুবকের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। একটু পরেই ভেসে এল যুবকের আর্তনাদ। দাঁতে দাঁত চেপে নিগ্রোর ঘরে ঢুকে পড়লেন সুলতান। পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে নিগ্রোটা। যুবকের মতো ভুল করলেন না সুলতান। এক কোপে নিগ্রোর ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে দিলেন। তারপর টুকরো দুটো নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন একটা কুয়ার ভিতরে। ফিরে এসে আবার লুকিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরে ফিরে এল বেগম। হাঁপাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই পালঙ্কে নিগ্রোটাকে না দেখে কেঁদে উঠল। কোথায় গেলে তুমি? সাড়া দাও, সাড়া দাও, তোমাকে কত কী খাওয়াব ভাবছি আজ। সাড়া দাও, আল্লার দোহাই, সাড়া দাও...

বাইরে থেকে সব শুনছেন সুলতান। মুখে হাত রেখে গুরুগম্ভীর স্বরে চেঁচিয়ে বললেন, তুমি বড় বেশি পাপ করছ। তাই তো তোমার প্রেমিক গায়েব হয়ে গেছে। এখনও যদি আমার কথা শোন...

বেগম ভাবল কোনো মহাশক্তির তরফ থেকে দৈববাণী হয়েছে। ভয়ে ভয়ে বলল সে, আপনার কী কথা শুনতে হবে, ইয়া মালিক?

রোজ তোমার স্বামীকে চাবুক মারো তুমি। তার আর্তনাদ আমার বুকে এসে বাজে। আজ থেকে তাকে আর চাবুক মারতে পারবে না। এখনি গিয়ে তাকে ভালো করে দাও।

ঠিক আছে, এখনি যাচ্ছি আমি। একপাত্র পানি নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে তাতে ফুঁ দিল বেগম। তারপর সেই পানি নিয়ে গিয়ে ছিটিয়ে দিল যুবকের দেহের পাথর হয়ে যাওয়া অংশে। চোখের পলকে ভালো হয়ে গেল যুবক। গা থেকে চাদর সরিয়ে নেমে এল বিছানা থেকে। অবাক হয়ে দেখল, তার কোমরের নিচের অংশ আবার আগের মতো রক্ত-মাংসের হয়ে গেছে।

আবার মঞ্জিলে ফিরে এল বেগম। চেঁচিয়ে বলল, আমি ওকে ভালো করে দিয়েছি, মালিক। এবার আমার প্রিয়তমকে ফিরিয়ে দিন।

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন সুলতান, আরেকটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

কী, কী কাজ? জলদি বলুন মালিক! তাড়াতাড়ি আমার প্রিয়তমকে ফিরে পেতে চাই!

সুলতান বললেন, ওই যে সরোবরের রঙিন মাছগুলো, রোজ রাতে পানি থেকে মাথা তুলে আল্লার কাছে ফরিয়াদ জানায় ওরা। মুক্তির দাবি জানায়। ওদের হাহাকার আমিও শুনতে পাই। ওরা মুক্তি না পেলে আমিও শান্তি পাব না।

শয়তান বেগমটা বলল, ও এই কথা। এখনি মুক্ত করে দিচ্ছি ওদের।

দ্রুত পায়ে হেঁটে সরোবরের দিকে চলল বেগম।

সরোবরের পাড়ে এসে আঁজলা ভরে পানি তুলে নিল। মন্ত্র পড়ে তাতে ফুঁ দিল। ফেলে দিল আবার সরোবরে। সঙ্গে সঙ্গে উথাল-পাথাল ঢেউ উঠল পানিতে। ঢেউ থেমে গেল এক সময়। দেখা গেল, পানির ওপর শুধু মানুষের মাথা। একে একে পানি থেকে উঠে এল মানুষগুলো। যার যার নিজের ঘরে ফিরে গেল। আবার জীবন্ত হয়ে উঠল প্রাসাদ। লোকজনে ভরে গেল শহর। বাজার হাটগুলো আবার সরগরম হয়ে উঠল।

মঞ্জিলে ফিরে এল শয়তান বেগম। ডেকে বলল, হে মালিক, এবার আমার প্রিয়তমকে ফিরিয়ে দিন।

সুলতান জানেন, সামনা-সামনি কাবু করতে পারবেন না ডাইনিটাকে। চোখে চোখ পড়লেই তাঁকেও পাথর করে দেবে। তাই আড়াল থেকে বললেন, এবার, হাঁটু গেড়ে বসে আল্লার কাছে ক্ষমা চাও।

একটুও দেরি করল না বেগম। সুলতানের কথা পালন করল।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেন সুলতান। নির্দ্বিধায় তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিলেন শয়তান বেগমের পিঠে। বুক-পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা। আর্তনাদ করে উঠে লুকিয়ে পড়ল বেগম।

পিছন থেকে সুলতান বললেন, জীবনে অনেক পাপ করেছিস। নিজের স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস আল্লার নাম নিয়ে আজ তোর শয়তানি শেষ করলাম। আল্লার কাছে মাপ চা।

যুবকের ঘরে এলেন সুলতান। বিছানায় বসে তাঁরই প্রতীক্ষা করছিল যুবক। সুলতানকে দেখেই উঠে এসে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে অধীর।

সুলতান বললেন, আমার কাজ শেষ। এবার বিদায় দাও, ভাই, দেশে ফিরে যাই।

যুবক বলল, আমিও যাব আপনার দেশে বেড়াতে।

ঠিক আছে চল।

যুবককে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে এলেন সুলতান। জেলেকে ডেকে অনেক ধনরত্ন উপহার দিলেন। তার জন্যই যুবক আজ শাপমুক্ত হতে পেরেছে। সে যদি মাছগুলো ধরে না আনত, তাহলে তো যুবকের কথা জানতে পারতেন না সুলতান।

জেলেকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান, আচ্ছা, একটা কথা এখনও বুঝতে পারছি না। ওই মাছগুলোকে ওভাবে আগুনে উল্টে ফেলল কে? তুমি কিছু বলতে পার?

দৈত্যকে কী করে তামার জালা থেকে মুক্ত করেছে, একে একে সব খুলে বলল জেলে। তারপর বলল, হয়তো ওই দৈত্যই একবার রূপসীর বেশে, একবার নিগ্রোর বেশে এসে মাছগুলোকে উল্টে ফেলেছে। কৌতূহল জাগিয়েছে আপনার মনে।

দরবারের সবাই জেলের সঙ্গে একমত হল।

জেলের সংসারের অনেক খুঁটিনাটি খবর নিল যুবক। জানল, জেলের অপরূপ সুন্দরী দুটো মেয়ে আছে। যুবক একটি মেয়েকে বিয়ে করল। অন্যটিকে বিয়ে করলেন সুলতান। দুই সুলতানের শ্বশুর, জেলের আর ভাবনা কী? এরপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিল।

দুনিয়াজাদ আবদার ধরল, আপা, আরেকটা গল্প বল না।

শাহরাজাদ বলল, ঠিক আছে, শোন। বাগদাদের এক কুলির গল্প শোনাচ্ছি।

কুলি আর তিন কন্যা

এক সময় বাগদাদ শহরে এক যুবক বাস করত। সংসারে কেউ ছিল না তার। বিয়ে থা-ও করেনি। কুলিগিরি করে খেত। একদিন খালি ঝুড়িটা সামনে রেখে রাস্তার পাশে বসে খদ্দেরের অপেক্ষা করছিল সে। এই সময়ই এক যুবতীর ওপর নজর পড়ল তার। অসামান্য দেহবল্লরী, অপরূপ সুন্দরী এই যুবতী তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে চাঁপার কলির মতো আঙুলে নেকাব একটু সরাল সুন্দরী, এই ভাড়া যাবে?

যুবতীর সুরমা পরা হরিণ-চোখ, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, মাথা-ভর্তি ঘন কালো চুল। মেয়েমানুষের এত রূপ জীবনে দেখেনি কুলি। গলার স্বরও কী মিষ্টি। যেন মধু ঝরছে। হাঁ করে যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে শুধু মাথা কাত করল সে। ঝুড়িটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

যুবতীর পিছু পিছু চলল কুলি। একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল যুবতী। দরজার কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিল একটা মেয়ে। তাকে কিছু দিনার দিল যুবতী। এক বোতল মদ এনে দিল মেয়েটা।

খালি ঝুড়িতে মদের বোতল তুলে নিল কুলি। আবার চলতে শুরু করল যুবতীর পিছন পিছন

ফলের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল যুবতী। নানা দেশের সেরা অনেক ফল কিনল সিরিয়ার আপেল, ওসমানি বেদানা, উমানের আখরোট, আলেপ্পোর আলুবোখরা, দামেস্কের আঙুর, নীল-এর শশা, মিশরের পাতিলেবু, সুলতানি চাটনি, লাল রঙের জাম। ফলগুলো ঝুড়িতে তুলে নিল কুলি।

ফুলের দোকানে এল যুবতী। কিনল হেনা, গোলাপ, চামেলি, যুঁই আর আরও কিছু সুগন্ধী ফুল। কসাইয়ের দোকান থেকে কিনল পাঁচ সের মাংস। মিষ্টির দোকান থেকে কিনল পেস্তার বরফি, গাজরের হালুয়া, মাখন, পনির, দুধ আর মধু দিয়ে তৈরি জিভে পানি আসা কয়েক রকম মিষ্টি।

যুবতীর সওদার বহর দেখে তাজ্জব হয়ে গেল কুলি। ঝুড়িতে আর আঁটে না। ভীষণ ভারি হয়ে গেছে ঝুড়ি। মনে মনে একটু বিরক্ত হল, কিন্তু মুখে হাসি টেনে বলল সে, আগে বললেন না কেন, মালকিন, একটা খচ্চর ভাড়া করে নিতাম।

কুলির রসিকতায় হাসল যুবতী। কথা বলল না, চোখের বাণ মারল শুধু।

আতরের দোকান থেকে যুবতী কিনল গোলাপ জল, আতর আর দশ বোতল খাবার পানি। একটা পিচকারিও কিনল। আরেকটা দোকান থেকে নিল আলেকজান্দ্রিয়ার কিছু সুন্দর সুন্দর মোমবাতি। কুলি সেগুলো ঝুড়িতে তুলে নিলে যুবতী বলল, হয়েছে। চল, যাই এবার।

যুবতীর পিছু পিছু চলতে লাগল কুলি। মনোরম এক প্রাসাদের আঙিনায় গিয়ে পৌঁছল। সামনে ফুলের বাগান। পানির ফোয়ারা। দরজায় টোকা দিল যুবতী। খুলে গেল দরজা।

অবাক হয়ে দেখল কুলি, সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপা কিশোরী। হরিণের মতো চোখ, খাড়া নাক, গালে গোলাপের আভা। যৌবনে হয়ে উঠবে আরও সুন্দরী।

কুলি ভাবছে, দিনটা আজ তার ভালোই যাবে। এই সকালবেলাতেই এমন দুই সুন্দরী নারী-দর্শন!

ঘরে ঢুকল ওরা। বিরাট বৈঠক-ঘর। দরজা-জানালায় কারুকাজ করা সিল্কের ভারি পর্দা। দামি আসবাবে সাজানো-গোছানো। মেঝেতে পারস্যের গালিচা বিছানো। একটা পালঙ্কে মখমলের বিছানায় শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পোশাকের গোড়ালির কাছটা অনেক উপরে উঠে গেছে। ধবধবে ফর্সা দুই পা বেরিয়ে পড়েছে। পিছন ফিরে শুয়ে আছে মেয়েটা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কুলিটা। ভাবছে, এত ফর্সাও মানুষ হয়। ভুলেই গেছে, মাথার উপর ভারি বোঝা রয়েছে।

ঘরের ভিতর সাড়া পেয়ে নড়েচড়ে উঠল মেয়েটা। চিৎ হয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙল। পাশ ফিরে তাকাল। সাগরের মতো গভীর দুই নীল চোখ মেলে কুলিকে দেখল মেয়েটা, বিছানা ছেড়ে উঠল। বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন এমনভাবে? ঝুড়ি নামাও।

ঝুড়ি নামাল কুলি। দুটো মেয়ে মিলে সুন্দর করে মালগুলো নামিয়ে রাখল ঝুড়ি থেকে।

কুলিটাকে দুটো দিনার দিল এক মেয়ে। বলল, চলবে তো?

কোনো কথা বলল না কুলিটা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে মেয়ে দুটোকে। এত সুন্দর মেয়েমানুষ এর আগে কখনও দেখেনি সে। এত রূপ, এই যৌবন, অথচ কোনো পুরুষ নেই ওদের কাছে। এত খাবারদাবার, এত আয়োজন সবই কি শুধু নিজেদের জন্য?

বড় মেয়েটা জিজ্ঞেস করল কুলিকে, কী হল? দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভাড়া পছন্দ হয়নি? ঠিক আছে, এই নাও, আরেক দিনার নাও।

তাড়াতাড়ি এক পা পিছিয়ে গেল কুলিটা। জিভ কেটে বলল, ছি ছি, কী যে বলেন। ভাড়া পছন্দ হবে না কেন? এমনিতেই তো দুনো দিয়েছেন আমাকে।

তাহলে? একটু অবাকই হল মেয়েটা। দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

দরজা খুলে দিয়েছিল যে মেয়েটা, সে-ও ঘরে এসে ঢুকল এই সময়। তিনজনের দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল কুলিটা। ইতস্তত করে বলেই ফেলল, আপনারা

তিনজনই বহুত খুবসুরৎ। কোনো কিছুর অভাব নেই। তাহলে এমন একা একা থাকেন কেন? মানে, আমি বলতে চাইছি, কোনো পুরুষ নেই কেন এখানে? তিনজনেরই বয়েস কম। কামনা-বাসনা নিশ্চয় আছে। পুরুষের সঙ্গই যদি না-পেল, তাহলে নারীর রূপ-যৌবনের আর কী দাম? এসব আমার বানানো কথা নয়, বিবিজানেরা, সবই বইতে আছে।

কুলির কথার ধরনে হেসে ফেলল বড় বোন। বলল, কিন্তু আমরা যে কুমারী মেয়ে গো, বিয়ে-থা হয়নি। পর-পুরুষের সঙ্গ আমাদের বিপদ ঘটাতে পারে। তারা কাছে এসে সর্বনাশ করে পালিয়ে যাবে, আর পাপের বোঝা বইতে হবে আমাদের। ভয় তো আছে। একা একা দিন কাটানো ছাড়া আর কী করি বল।

কুলিগিরি করে বটে, কিন্তু ভালো লেখাপড়া জানা আছে যুবকের। মেয়েগুলোর মন জয় করার জন্য চমৎকার সব কবিতা আবৃত্তি করল। বোঝানোর চেষ্টা করল, সে একেবারে ফেলনা নয়।

কুলির কথাবার্তায় তিন বোনই খুব খুশি।

সুযোগ বুঝে কুলি বলল, বুঝতে পারছি, আজ রাতে খুব বড় জলসা হবে তোমাদের। আমার দেখার খুব কৌতূহল হচ্ছে। বড়লোকের জলসা তো কোনোদিন দেখিনি। আজকের রাতটা আমাকে তোমাদের এখানে থাকতে দেবে?

মেজোটা বড় বোনের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, ব্যাটাকে নিয়ে একটু হাসি-মস্করা করলে কেমন হয়, আপা?

মাথা নাড়ল বড় বোন, মন্দ হয় না। গম্ভীর হওয়ার ভান করল। কুলিকে বলল, নিজের চোখেই তো দেখছ, কী পরিমাণ বাজার-হাট করেছি। অনেক খরচাপাতি হয়ে গেল। সঙ্গ দিতে চাও, আজকের জলসায় থাকতে চাও, ভালো কথা, কিন্তু পয়সাকড়ি আছে সাথে? আনন্দে ভাগ নেবে, খরচার ভাগ দেবে না?

মুখ কালো করে ফেলল কুলি। বলল, আমি দিন আনি দিন খাই। তোমাদের এই খরচার কল্পনাও করতে পারি না। আমার কাছে যা আছে, দিলে সাগরে শিশিরবিন্দুর সামিলই হবে।

মেজো বোনটা বলে উঠল, তাহলে কী করে হয়, বল? আজ সারা দিন সারারাত ধরে উৎসব চলবে। মদের ফোয়ারা ছুটবে। কত ধুমধাম। কত খরচ। ভাগ না দিয়ে, এসব জিনিস কি মুফতে পাওয়া যায়?

সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার এত পয়সা কোথায়? আজ যা খরচ করলে তোমরা, সারা মাসেও এত দিনার রোজগার করতে পারি না আমি।

মুখ বেজার করে নিচু হয়ে ঝুড়িটা তুলে নিল কুলি। বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই খপ করে তার হাত চেপে ধরল মেজো।

আ-হা-হা, গোসসা হয়ে গেল বুঝি জনাবের! তা খারাপটা কী বলেছি, শুনি? আমোদ করার শখ আছে, অথচ পয়সা খরচ করতে পারবে না। তা কী করে হয়?

মেজোর কথার পিঠে বলে উঠল বড় বোন, জানো তো পয়সা ছাড়া কিছুই হয় না। কথায় বলে না : ফেলো কড়ি, মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?

খিলখিল করে হেসে উঠল বড় আর মেজো বোন।

ছোটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল এতক্ষণ। রেগে গেল সে। কী হল আপা, বেচারাকে এমন ঘোলা পানি খাওয়াচ্ছ কেন তোমরা? আমি বলছি কী, ওকে রেখে দাও। জলসায় থাকুক। খুব মজা হবে। আমাদের ফাইফরমাশ খাটবে, অনেক কাজ করে দিতে পারবে।

আমুদে গলায় বলে উঠল মেজো, কিন্তু ওর পকেট তো খালি। বিনে পয়সায়...

বাধা দিয়ে বলে উঠল ছোট বোন, রাখ তোমাদের পয়সা। পয়সাই সব, না? এমনিতে কম পয়সা আছে আমাদের? কম খরচ করছি? ঠিক আছে, পয়সাই যদি চাও, ওর ভাগটা আমিই দিয়ে দেব।

বাঁকা চোখে ছোট বোনের দিকে তাকল মেজো। মুখে দুষ্টু হাসি টেনে বলল, ও-মা এরই মাঝে এত!

হাসি ফুটল কুলির মুখে। ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, যা দয়া করলে, বিবিজান! তোমার কাছে বাঁধা হয়ে গেলাম।

বড় দুই বোনও হাসল। কুলিকে বলল, আসলে তোমাকে নিয়ে এতক্ষণ মজা করছিলাম আমরা। তুমি থাক। কিন্তু এক শর্তে। আমরা যা করতে বলব, তোমাকে তাই করতে হবে। এবং কেন করবে, তার কোনো কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। ঠিক আছে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কুলি, ঠিক আছে।

বড় বোন বলল, ওঠ তাহলে। এস আমার সঙ্গে। দরজার পাল্লায় কী লেখা আছে, দেখবে।

কুলিকে নিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল বড় বোন। দরজার পাল্লায় সোনার হরফে কিছু লেখা রয়েছে। জোরে জোরে পড়ল যুবক : তোমার কাছে কেমন লাগল, সেটা বিবেচ্য নয়। যা বলব, তাই করে যাবে। অন্যের কাজের ব্যাপারে নাক গলাবে না।

পড়ার পর তিন বোনকে বলল কুলি, তোমাদের সামনে, তোমাদের সাক্ষী রেখে পড়লাম। হলফ করছি, এর নড়চড় হবে না।

ফরাস পাতল মেয়েরা। খাবার সাজাল। সারাদিন মদ খেয়েছে, হৈ-হুল্লোড় করেছে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে চারজনেরই।

মেয়েদের একজন সুগন্ধী মোমবাতি জ্বেলে দিল। খেতে বসল ওরা।

প্রথমেই এক পাত্র করে সরাব ঢেলে সবাইকে এগিয়ে দিল ছোট বোন। শুরু হল খাওয়া। নানারকম মুখরোচক খাবার তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেল ওরা।

খাওয়ার পর কবিতা পাঠের আসর বসল। বক্তা একমাত্র কুলি, অন্য তিনজন শ্রোতা। চোখ আধবোজা করে, এদিক ওদিক মাথা দুলিয়ে সুর করে আবৃত্তি করছে কুলি, মুগ্ধ হয়ে শুনছে অন্যেরা।

হঠাৎ কড়া নাড়ার আওয়াজ হল দরজায়। চমকে উঠল সবাই। কে ডাকে!

বড় বোন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ফিরে এল খানিক পরেই। বলল, তিনজন বিদেশি এসেছে। দেখেশুনে মনে হল রুম দেশের লোক। কেমন অদ্ভুত একটা যোগাযোগ রয়েছে তিনজনের মাঝে। কারোরই দাড়িগোঁফ নেই। তিনজনেরই বাঁ চোখ কানা, ঠুলি পরা। রাতে থাকতে চাইছে। আমার মনে হয় রাজি হয়ে যাওয়া উচিত। ভারি মজা হবে আজ রাতে।

মেজো বোন বলল, বেশ তো, নিয়ে এস ওদের। তারপর দরজায় লেখা শর্ত পড়িয়ে হলফ করিয়ে নাও। যদি শর্তে রাজি হয়, থাকবে, নইলে চলে যাবে।

ইঙ্গিত পেয়ে ছুটে গেল ছোট বোন। দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে এল তিন বিদেশিকে। তাদের অভ্যর্থনা করে বসাল তিন বোন।

লোকগুলো বসল। কুলি যুবকের দিকে তাকাল। মদের নেশায় চুর হয়ে আছে তখন যুবক। নিজেদের মাঝে ফিসফিস করে কী বলাবলি করল লোকগুলো। একজন একটু জোরেই বলে উঠল, এ-ও আমাদের জাতভাই নয় তো! কালান্দর ফকির হতে পারে।

লোকটার কথা কানে গেল যুবকের, কিন্তু কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, ভাইসব, এত ফিসফাসের কিছু নেই। মন খুলে কথা বলতে পারেন। গোমড়ামুখো হয়ে থাকলে এখানে রাত কাটাবেন কী করে?

কুলির কথার ধরন দেখে মজা পেল তিনজনেই, হো হো করে হেসে উঠল ওরা। মেয়েরাও হাসল। বলল, এই কালান্দর ফকিরদের নিয়ে একটু মজা করব আমরা। কালান্দরদের খেতে দিল ওরা।

গোগ্রাসে খেল ফকিরেরা। তাদের খাবার ধরন দেখেই বোঝা গেল, খুব খিদে পেয়েছিল ওদের। যেমন খেল ওরা, তেমনি মদ টানল। শিগগিরই মাতাল হয়ে উঠল, নেশা জমে গেছে।

বায়না ধরল মেয়েরা, কালান্দরদের গান শুনবে।

রাজি হল কালান্দরেরা। বলল, নিশ্চয় শোনাব। কিন্তু গানের সঙ্গে বাজনা দরকার। কিছু আছে?

জবাব দিল বড় বোন, আছে। বড় একটা ঢোল আছে। ইরাকের বাঁশি আছে। পারস্যের সানাই আছে।

খুশিতে ফেটে পড়ল কুলি যুবক। হা-হা-হা ইয়া আল্লা, কী মজা! তোফা খাবার, মদ, গান, তার সঙ্গে বাজনা...যা জমবে না...উফ্...

এই সময় আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ উঠল দরজায়।

সে-ই রাতে নগর ঘুরতে বেরিয়েছেন খলিফা হারুন অর-রশিদ। প্রায় প্রতি রাতেই এভাবে বেরোন তিনি। প্রজাদের অবস্থা, তারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে, নিজের চোখে

দেখেন। তাঁর সঙ্গে থাকে দুজন লোক : একজন তাঁর উজির, জাফর-আল-বারমাকি, অন্যজন তলোয়ার বাহক, মাসরুর।

দুই সঙ্গীকে নিয়ে নগরের পথ ধরে হেঁটে চলছেন খলিফা। তিনজনেই ছদ্মবেশে।

তিন বোনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। বাড়ির ভিতর থেকে হৈ-হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে। খলিফা বললেন, বাড়িতে ঢুকব আমি। ভিতরে কী হচ্ছে দেখতে হবে।

উজির বলল, সেটা কি উচিত হবে জাঁহাপনা? ওরা হয়তো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে।

খলিফা বললেন, তা হোক। তবু আমি ঢুকবই। আমরা তো ছদ্মবেশে রয়েছি। কোনোরকম বিপদ হবে বলে মনে করি না।

হাল ছেড়ে দিয়ে উজির বলল, হুজুরের যেমন ইচ্ছে।

দরজার কড়া নাড়ল উজির।

দরজা খুলে দিল ছোট বোন।

উজির বলল, মা, আমরা তিবরিয়া দেশের সওদাগর। দিন দশেক হল বাগদাদে এসেছি। এখানকার এক সওদাগরের বাড়িতে উঠেছি। আমাদের মালপত্র সেখানেই রয়েছে। আজ রাতে আরেক সওদাগরের বাড়িতে দাওয়াত ছিল। খেয়েদেয়ে উঠতে উঠতে রাত হয়ে গেল। নতুন জায়গা, পথঘাটও তেমন চিনি না। পথ হারিয়ে ফেলেছি। রাতও অনেক হয়ে গেল। এখন আর ফিরতে পারছি না। আজকের রাতটা যদি আশ্রয় দাও, খুব উপকার হবে। আল্লাহ তোমাদের ভালো করবেন।

ছোট মেয়েটা অনুমান করল, এঁরা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁদেরকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে চলে এল সে। অন্য দুই বোনের সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর ফিরে এসে বলল, ভিতরে আসুন আপনারা। আজ রাতে আমাদের মেহমান হয়ে থাকুন।

খলিফা আর তাঁর সঙ্গীরা ভিতরে ঢুকলে অভ্যর্থনা করল বড় দুই বোন। বড় বোন বলল, আজ রাত এখানেই থাকুন। কোনো অসুবিধে হবে না। তবে একটা শর্ত আছে। ওই দরজার গায়ে লেখা কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। আমাদের অনুরোধ এটা।

দরজায় লেখা কথাগুলো পড়ল উজির। বলল, আমরা রাজি।

কালান্দরের পাশে গিয়ে বসলেন খলিফা আর তাঁর দুই সঙ্গী। সোনার পাত্রে দুষ্প্রাপ্য মদ এনে খলিফার সামনে ধরল একটি মেয়ে।

মাথা নেড়ে বললেন খলিফা, আমি হাজী, ওসব খাই না।

মদ ফিরিয়ে নিল মেয়েটা। গোলাপ পানি দেয়া চমৎকার শরবৎ এনে ধরল খলিফার সামনে। নিলেন খলিফা।

অবাক হয়ে দেখলেন খলিফা, তিন কালান্দরেরই বাঁ চোখটা কানা, তার ওপর ঠুলি পরা। গান-বাজনা শুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চলছে বেদম মদ পান।

গান-বাজনা শেষ হল এক সময়। বড় বোন জিজ্ঞেস করল, কারো খিদে পেয়েছে? কেউ আর কিছু খাবেন?

সবাই মাথা নাড়ল। কারোরই খাবার দরকার নেই আর।

হলের মাঝখানটা খালি করে দেবার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাল বড় বোন। দরজার কাছে সরে এল আগন্তুকেরা।

ঘরটা ভালো করে সাফসুতরো করল এক বোন। কুলিটাকে বলল একজন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আপন মনে করেই বলছি তোমাকে।

একটুও দেরি না করে গায়ের চাদর খুলে ফেলল কুলিটা। কোমরের কাপড়টা ভালো করে আঁটতে আঁটতে বলল, আদেশ করুন, বেগম সাহেবা।

মেয়েটা বলল, এস আমার সঙ্গে। কুলিকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল সে। একটু পরেই ফিরে এল আবার। কুলিটাও ফিরে এসেছে, সঙ্গে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে শিকলে বাঁধা দুটো মাদি কুকুর। কুকুর দুটোর গায়ের রঙ কুচকুচে কালো।

শঙ্কর মাছের লেজের তৈরি একটা চাবুক তুলে দিল কুলির হাতে মেয়েটা। একটা কুকুরকে দেখিয়ে বলল, কষে চাবুক মার এটাকে।

বড় বোনের হুকুম মতো চাবুক মারতে লাগল কুলি। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে কুকুরটা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল বড় বোন। তারপর হঠাৎ কুলির হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিল। কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। পিঠ চাপড়ে দিল, চোখের পানি মুছিয়ে দিল, ওটার কপালে চুমু খেল। তারপর উঠে কুলির হাতে চাবুকটা দিয়ে অন্য কুকুরটাতে মারতে বলল।

একই ঘটনা ঘটল আবার।

ব্যাপার দেখে আর সইতে পারলেন না খলিফা। জানোয়ার দুটোর জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল তাঁর হৃদয়। উজিরের কানে কানে বললেন, মেয়েটাকে জিজ্ঞেস কর তো, এসবের অর্থ কী?

উজির বলল, এসব ব্যাপারে আমাদের চুপ করে থাকাই ভালো।

এই সময় মেজো বোন ছোট বোনকে বলল, এস, অন্যান্য কাজগুলোও সেরে ফেলি।

মারবেল পাথরে বাঁধানো একটা বেদীর উপর উঠে দাঁড়াল মেজো বোন। পাশের ঘর থেকে একটা ছোট থলে নিয়ে এল ছোট বোন। থলে থেকে একটা বাঁশি বের করে বাজাতে লাগল। কান্নার মতো ঝরে পড়তে লাগল যেন অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। বাঁশি বাজানো থামলে মেজো বোন জোরে জোরে বলে উঠল, তোমার ওপর আল্লার শান্তি নামুক, বোন।

তারপর হঠাৎই উন্মাদ হয়ে উঠল যেন মেজো বোন। নিজের পোশাক ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে লাগল। এক সময় অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

অবাক হয়ে লক্ষ করলেন খলিফা, মেয়েটার সারা গায়ে চাবুকের দাগ।

এগিয়ে এল বড় বোন। একটা পাত্র থেকে পানি নিয়ে ঝাপটা দিতে শুরু করল মেজোর চোখেমুখে। একটু পরেই জ্ঞান ফিরল মেজোর। উঠে পড়ল সে। নতুন জামাকাপড় পরল।

ফিসফিস করে উজিরকে বললেন খলিফা, কাণ্ডটা দেখলে? বুঝলে কিছু? মাদি কুকুরকে চাবুক মারা, ওই মেয়েটার গায়ে চাবুকের দাগ...এর রহস্য আমাকে জানতেই হবে। জানতে হবে এই ধাঁধার জবাব!

বিনীত গলায় আস্তে করে বলল উজির, জাঁহাপনা, শর্তের কথা ভুলে গেলেন? হলফের বরখেলাপ করা কি উচিত হবে?

এই সময় আবার বাঁশি বাজাতে লাগল এক বোন। সেই করুণ সুরের মূর্ছনা আবার বিষণ্ন, ভারি করে তুলল ঘরের আবহাওয়া। বাঁশি বাজানো থামলে আবার সেই আগের মতো ঘটনা ঘটল। গায়ের কাপড় ছিঁড়ে কুটি কুটি করল অন্য এক বোন। অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তার গায়েও চাবুকের দাগ। চোখে মুখে পানির ঝাপটা খেয়ে হুঁশ ফিরল তার। পরপর তিনবার ঘটল একই রকম ঘটনা।

উসখুস করছে কালান্দর ফকিরেরা। নিজেদের মাঝে ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগল তারা, এরচেয়ে অন্য কোথাও রাত কাটানো অনেক ভালো ছিল। এই জঘন্য দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

কালান্দরদের একজন বলল, কী জানি! আমরাও তো কিছু বুঝতে পারছি না!

খলিফা বললেন, ও, আপনারাও এখানে নতুন?

এক কালান্দর বলল, হ্যাঁ। এদেশেও নতুন, এই বাড়িতেও নতুন। আপনাদের খানিক আগে এসেছি। কী যে হচ্ছে, মাথামুণ্ড কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

খলিফা বললেন, ওই ছেলেটা হয়তো বলতে পারবে কিছু।

ইশারায় কুলিকে ডাকল এক কালান্দর। যুবক কাছে এলে ফিসফিস করে তার কাছে জানতে চাইল, ব্যাপার কী?

মুখ বাঁকিয়ে কুলি বলল, কী বলব, ভাই। আমিও আজ প্রথম এই বাড়িতে ঢুকেছি। এই তাজ্জব কাণ্ড কারখানার কিছুই বুঝছি না। দূর, রাতটাই মাটি হয়ে গেল! তারচেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকাটাও অনেক ভালো ছিল।

সবাই মিলে পরামর্শ করতে লাগল ওরা—আমরা সাতজন, ওরা তিনজন, তা-ও মেয়ে। আমাদের এত ভয়ের কিছু নেই। চল, ব্যাপার কী জানতে চাই আমরা। কেন এই নিষ্ঠুরতা? সহজে না বললে, জোর খাটাব আমরা। কথা আদায় করে নেব।

ছয়জনই রাজি। রাজি হল না শুধু উজির জাফর। বলল, হলফ করেছি আমরা, কোনো কৈফিয়ৎ চাইব না। তা ছাড়া আমরা আজ রাতে ওদের মেহমান। এখন কথা না রাখলে আতিথেয়তার অপমান করা হয়। ভোর হতে আর তো অল্প বাকি। যা খুশি করুক ওরা। ভোর হলেই আল্লাহর নাম নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ব।

খলিফা উজিরের কথা মানতে চাইলেন না।

উজির আবার বলল, তাহলে আরেক কাজ করা যায়। দরবারে ফিরে গিয়ে ওদের তলব করবেন। তখন ওদের কাছ থেকে সবই জানতে পারবেন।

কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন খলিফা। বললেন, এত সময় অপেক্ষা করতে পারব না আমি। এখনি জিজ্ঞেস করতে হবে।

তখন প্রশ্ন উঠল, কে জিজ্ঞেস করবে? সবাই পরামর্শ করে ঠিক করল, কুলি যুবকই জিজ্ঞেস করবে।

সবাই অনেকক্ষণ ধরে ফিসফাস করছে। মেয়েরা লক্ষ করেছে এটা। কুলিকে জিজ্ঞেস করল বড় বোন, তোমরা কী আলাপ করছ?

সাহস করে বলেই ফেলল কুলি, মালকিন, আমরা জানতে চাই, কুকুর দুটোকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারা হল কেন, তারপর আবার ও দুটোকে আদর করে চুমুই-বা খেলেন কেন? আপনাদের শরীরে চাবুকের দাগ ফুটল কেন। সব ব্যাপারটা বিস্তারিত জানতে চাই আমরা।

বড় বোন জানতে চাইল, এটা কি তোমার একার প্রশ্ন?

কুলি বলল, না। একজন ছাড়া আর সকলেরই।

বড় বোন বলল, আপনারা কথার বরখেলাফ করেছেন। শর্ত অমান্য করেছেন। আদর করে ঘরে ডেকে এনে খাওয়ানোর, জায়গা দেয়ার এই কি প্রতিদান? এর জন্য শাস্তি পেতে হবে আপনাদের।

চাবুকটা তুলে নিল বড় বোন। মেঝেতে বাড়ি মারল। পরপর তিনবার। বাতাসে চাবুকের শিশ কাটার তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল। আশ্চর্য হয়ে দেখল অতিথিরা, পর্দার ওপাশে ঘরের দরজার পাল্লা খুলে গেল। পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল সাতজন নিগ্রো, সাতটা দৈত্য যেন। তাদের হাতে ধরল তলোয়ার।

নিগ্রোদেরকে হুকুম দিল বড় বোন, এই লোকগুলোকে শিকল দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটাকে বাঁধ।

দেখতে দেখতে সাতজনকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলল নিগ্রোরা। বলল, মালকিন, জবাই করে ফেলব?

বড় বোন বলল, না। সেটা পরে। তার আগে জেনে নিতে চাই, কে কোন পেশার, কী ধরনের লোক।

হাতজোড় করে কেঁদে ফেলল কুলিটা। বলল, দোহাই তোমাদের, মালকিন, আমাকে মেরো না। আমার কোনো দোষ নেই। এই কানাগুলো বাড়িতে না ঢুকলে এই অঘটন ঘটত না। আমি মুখ বুজে থাকতাম। যত নষ্টের মূল এই কানাগুলো।

কুলির কথার ধরনে হা-হা করে হেসে উঠল বড় বোন।

তার হাসি দেখে আরও জড়সড় হয়ে পড়ল অতিথিরা। এবার কী ঘটবে, কে জানে।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বড় বোন। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমাদেরকে অসহায়, নিরাশ্রয় ভেবে রাতের জন্য আশ্রয় দিয়েছি। আসলেই কি তোমরা অসহায়? সত্যি কথা বল, নইলে মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

উজিরের কানে কানে বললেন খলিফা, জাফর, জলদি আমাদের পরিচয় জানিয়ে দাও, নইলে মরতে হবে। শুনলে মেয়েটার কথা?

উজির বলল, তাই তো আমাদের পাওনা জাঁহাপনা।

রেগে গিয়ে বললেন খলিফা, এই কি রসিকতার সময়, উজির?

উজির কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠল বড় বোন। কালান্দরদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা তিনজন কি ভাই?

জবাব দিল একজন কালান্দর। না না, আমরা তিনজন তিন দেশের লোক। গরিব, দুঃখী মানুষ। দিন আনি দিন খাই। বিষয়-আশয়, সহায়-সম্বল বলতে কিচ্ছু নেই আমাদের।

বড় বোন আবার জিজ্ঞেস করল, জন্ম থেকেই কি একটা চোখ কানা তোমাদের?

আরেক কালান্দর জবাব দিল, না। এক অদ্ভুত ঘটনায় চোখটা হারিয়েছি আমি।

একই কথা বলল অন্য দুই ফকিরও। তিনজনেই জানাল, ঘটনাচক্রে একত্রিত হয়ে গেছে তারা। ওদের জীবনে বড় বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেছে।

গম্ভীর হয়ে বলল বড় বোন, ঠিক আছে। তোমাদের কাহিনী শোনাও একে একে। কারো কাহিনী আমার ভালো লাগলে, তাকে ছেড়ে দেব।

এই সময় এগিয়ে এল কুলিটা। বলল, মালকিন, আমি গরিব কুলি। সে তো তোমার ভালোই জানা আছে। কুলি হিসেবেই তোমাদের বাড়িতে এসেছি। আমার জীবনে কোনো অদ্ভুত ঘটনা ঘটেনি। অদ্ভুত যা কিছু ঘটল, সে তো আজ তোমাদেরই এখানে। নতুন করে আর কী বলব? দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও।

বড় বোন বলে উঠল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, সে পরে দেখা যাবে। এখন গিয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাওগে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল কুলি, না না, মালকিন, বিশ্রামের দরকার নেই আমার। এদের কাহিনী না শুনে এক পা নড়ছি না আমি। দয়া করে অনুমতি দাও...

প্রথম কালান্দরের কাহিনী

আমার দাড়িগোঁফ কেন কামানো, আর বাঁ চোখই-বা কেন কানা, সে কাহিনী এখন শোনাচ্ছি আপনাদের।

আমি এক বাদশাহর ছেলে। আমার চাচা ছিলেন আরেক দেশের বাদশাহ। কপালের এমনি লিখন, আমার যেদিন জন্ম হয়, আমার একটি চাচাত ভাইও সেদিন জন্ম নেয়।

একে একে অনেকদিন, মাস, বছর কেটে গেল। আমরা দুই ভাই যুবক হলাম। আমাদের পরিবারের নিয়ম, মাঝে মাঝেই আমরা গিয়ে যার যার চাচার বাড়িতে কিছুদিন করে কাটিয়ে আসতাম। শেষবার আমি যখন চাচার বাড়িতে গেলাম, যথেষ্ট আদরযত্ন করেছেন আমাকে চাচা। রোজ আমার জন্য সবচেয়ে ভালো ভেড়ার মাংস রান্না হত। দুষ্প্রাপ্য মদ আসত আমার জন্য। আমি আর আমার চাচাত ভাই একসঙ্গে বসে খেতাম, মদ পান করতাম। আমার আগেই নেশা জমে যেত চাচাত ভাইয়ের। মাতোয়ারা হয়ে উঠত সে।

একদিন নেশা বেশ জমে উঠেছে। এ সময় আমার ভাই বলল, তুমি শুধু আমার ভাই নও, আমার প্রাণের দোস্ত। একটা কথা তোমাকে বলব, না করতে পারবে না। বল, করবে না?

আমিও তখন নেশায় মাতোয়ারা। কোনো কিছু ভাবনা-চিন্তা না করেই বলে ফেললাম, করব না। আল্লাহর কসম, যা বলবে তাই করব।

দেরি না করে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল ভাই। একটু পরেই ফিরে এল আবার, সঙ্গে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী। পরনে জমকালো পোশাক। আতরের খুশবোতে ভরে উঠল ঘরের বাতাস।

মেয়েটিকে দেখিয়ে আমাকে বলল ভাই, একে নিয়ে গিয়ে গোরস্থানের গুমটি ঘরে চুপ করে বসগে। কেউ যেন টের না পায়। একটু পরেই আসছি আমি।

কী আর করব। আগেই তো কথা দিয়ে ফেলেছি। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নির্জন গোরস্থানের গুমটি ঘরে ঢুকলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম ভাইয়ের জন্য।

একটু পরেই এল ভাই। হাতে একটা কলসিতে পানি, খানিকটা চুন সুরকি, আর একটা ছোট কুড়াল।

গুমটি ঘরের পাশেই একটা বিশাল পাথরের চাঁই পড়ে আছে। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে একটু একটু করে সেই পাথরের চাঁই কাটতে লাগল ভাই। কাটতে কাটতে একটা গর্ত

হয়ে গেল। গর্তের অন্য মুখ একটা সুড়ঙ্গের মুখের সঙ্গে মিলে গেল। সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে একটা প্রাসাদ।

মেয়েটাকে ইশারা করল ভাই। সুড়ঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল মেয়েটা। ভাই আমার হাতে পানির কলস আর চুন-সুরকি দিয়ে বলল, আমি চলে গেলে এই সুরকি দিয়ে গর্তটা ভরে দেবে। একেবারে আগের মতো করে ফেলবে লেপেপুঁছে। যেন বোঝা না যায় এখানে কোনো গর্ত আছে বা ছিল।

ভাই চলে গেলে তার কথামতো সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিলাম আমি। তারপর ফিরে এলাম চাচার প্রাসাদে। এসে শুনলাম শিকারে বেরিয়েছেন চাচা। কবে ফিরবেন, ঠিক নেই। একা একা আর ভালো লাগছিল না। কোনোমতে কেটে গেল রাতটা। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে গোরস্থানের গুমটি ঘরের কাছে চলে এলাম সকালে। গর্তের মুখটা খুলব খুলব করেও খুললাম না। সময় হলে ওরা দুজন আপনিই বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু এল না ওরা। সাতদিন সাত রাত অপেক্ষা করলাম, তবু এল না ভাই। চাচাও ফিরছেন না। কিছু ভালো লাগছে না আমার। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতেও ভুলে গেলাম। একা একা আর কত সময় কাটানো যায়? শেষে ফিরে চললাম নিজের দেশে।

নিজের শহরের সিংহদরজায় পৌঁছেছি, হঠাৎ ঘিরে ধরল আমাকে একদল অস্ত্রধারী লোক। আমাকে বন্দি করল ওরা। আমি দেশের শাহজাদা। আমাকে এভাবে বন্দি করতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আরও অবাক হলাম, যখন দেখলাম অস্ত্রধারীরা আমার বাপের সেনাবাহিনীর বিশ্বাসী সব লোক।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। দুরুদুরু করছে বুকের ভিতর। শঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, না জানি আব্বাজানের কী হয়েছে? শেষে একজনকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, আব্বাজানের কী হয়েছে, বলবে কেউ? কেমন আছেন তিনি?

কেউ কোনো জবাব দিল না। টানতে টানতে নিয়ে চলল আমাকে।

শহরের ভিতরে ঢুকে আমার এক বিশ্বাসী গোলামের দেখা গেলাম। আমাকে দেখেই ছুতোনাতা করে কাছে এগিয়ে এল সে। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, বড় হুজুর আর বেঁচে নেই, শাহজাদা। সেনাপতির সঙ্গে যোগসাজস করে বিদ্রোহ করেছে উজির। তোমাকে তার কাছেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাপের মৃত্যু-সংবাদে একেবারে কাতর হয়ে পড়লাম আমি। এই অবস্থায়ই টানতে টানতে আমাকে উজিরের সামনে হাজির করা হল।

আমার ওপর বরাবরই একটা ব্যক্তিগত রাগ ছিল উজিরের। আমি যখন খুব ছোট, তখন একদিন বাগানে তীর ধনুক দিয়ে পাখি মারছিলাম। একটা পাখিকে লক্ষ করে তীর ছুড়েছিলাম। নিশানা ঠিক হয়নি, তীরটা গিয়ে পড়ল পাশের আরেকটা বাগানে। ওই বাগানে তখন পায়চারি করছিল উজির। তীর গিয়ে লাগল তার চোখে। চোখটা নষ্ট হয়ে গেল উজিরের। দারুণ রেগে গিয়েছিল উজির, কিন্তু বাদশাহর ছেলেকে আর কী করবে? তবে মনে মনে রাগটা পুষে রেখেছিল সে।

আমি বন্দি হয়ে গিয়ে উজিরের সামনে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এল উজির। সোজা আমার কাছে এসে দাঁড়াল। নখের এক খোঁচায় আমার বাঁ চোখটা গেলে দিল, তারও বাঁ চোখটাই নষ্ট হয়েছিল।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেলাম আমি। সেই অবস্থায়ই শুনতে পেলাম, জল্লাদকে ডেকে বলছে উজির, এই হারামজাদাকে শহরের বাইরে নিয়ে যাও। মেরে শিয়াল-শকুনের মুখে ফেলে দিয়ে এস।

একটা বাক্সে ভরে আমাকে শহরের বাইরে নিয়ে এল জল্লাদ। বাক্স থেকে বের করল। দারুণ যন্ত্রণায় আমি তখনও কাতরাচ্ছি। চোখ নষ্ট হওয়ার যে কী যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। উজিরের জন্য দুঃখ হল। তার কেমন ব্যথা লেগেছিল, বুঝতে পারছি। কিন্তু চোখের বদলে চোখ সে নিয়েছে, তাতেও ক্ষান্ত হয়নি, জল্লাদকে দিয়ে আমাকে খুন করতে পাঠিয়েছে।

আমার বাপের পুরনো বিশ্বস্ত কর্মচারী এই জল্লাদ। আমাকে বলল, সারাজীবন আপনাদের অনেক নুন খেয়েছি। নিমকহারামি করতে পারব না। নিজের হাতে কিছুতেই খুন করতে পারব না। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি হুজুর, এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। কখনও ফিরবেন না আর। উজির আপনাকে জ্যান্ত দেখতে পেলে, আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে না।

চোখ হারালেও প্রাণে বেঁচে গেলাম। ঠিক করলাম, আবার চাচার কাছেই ফিরে যাব।

আমাদের দুরবস্থার কথা শুনে দুঃখ করতে লাগলেন চাচা। এ ছাড়া তাঁর আর কী-ই বা করার ছিল! তাঁরও আরেক দুঃখ। বললেন, আমার ছেলেটাও অনেকদিন ধরে নিখোঁজ। কেউ জানে না, তার কী হয়েছে। আমার ভাই মারা গেছেন, আল্লার কাছে রহমত চাওয়া ছাড়া আর কী-ই করতে পারি। তবে, একটা চোখ হারিয়েও জানে বেঁচে গেছ তুমি, এজন্য আল্লার কাছে হাজার শোকর গুজার করছি।

আমার চাচাত ভাই তখনও ফিরে আসেনি শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। সব কথা খুলে বললাম চাচাকে। শুনে, চাচার মলিন মুখে হাসি ফুটল।

দুজনে রওনা হলাম গোরস্থানে। শাবল দিয়ে পাথরে খোদাই করা গর্তটা পরিষ্কার করলাম। সুড়ঙ্গমুখটা বেরিয়ে পড়ল। ঢুকে পড়লাম ভিতরে। কয়েক ধাপ নামতেই ধোঁয়ার ঝাপটা লাগল চোখে মুখে। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন চাচা। অভয় দিয়ে বললেন, কোনো ভয় নেই, বাবা, আল্লাকে ডাকো। তিনিই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে এগোতে থাকলাম আমরা। শেষে, এক বিশাল ঘরে এসে দাঁড়ালাম। বিভিন্ন রকমের খাবার আর দামি মদে ভরা ঘর। একপাশে একটা পালঙ্ক। আধো অন্ধকারে মনে হল পালঙ্কে কারা ঘুমিয়ে আছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি আর চাচা আঁতকে উঠলাম। দুটো দেহ জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। দুজনেরই শরীর পুড়ে শেষ, দগদগে ক্ষত। বীভৎস দৃশ্য।

দেখে অনুমান করতে কষ্ট হল না, কার লাশ। একটা আমার চাচাত ভাইয়ের, অন্যটা সেই মেয়েটার।

রেগে আগুন হয়ে গেলেন চাচা। বললেন, তোদের উচিত সাজা মিলেছে, নরকের কীট কোথাকার! মরেও শান্তি পাবি না তোরা! আমি বাপ হয়ে অভিশাপ দিচ্ছি, নরকেও যেন ঠাঁই না হয় তোদের! তারপর পায়ের জুতো খুলে দমাদম মারতে লাগলেন লাশ দুটোর মাথায়।

লাশের প্রতি চাচার এই ব্যবহারে মনে মনে একটু রাগই হল। তাঁর জুতোসুদ্ধ পা-টা চেপে ধরে বললাম, আহ, কী করছেন, চাচা! পাগল হয়ে গেলেন? এমনিতেই পুড়ে মরেছে ওরা...

চেঁচিয়ে উঠল চাচা, মরুক, এই ওদের যোগ্য শাস্তি। জানিস, মেয়েটা কে? আরেকজনের বৌ। ভাগিয়ে এনেছিল আমার ছেলে। এই অনাচার সহ্য করবেন আল্লাহ? কত বুঝিয়েছি ছেলেকে, কার কথা কে শোনে। শেষে, আমাকে ফাঁকি দেবার জন্য এই পাতালের ঘরে এসে ঢুকেছে। কিন্তু আল্লার চোখকে কি ফাঁকি দেয়া যায়? সবই শয়তানের খেলা, বাবা, শয়তানের খেলা। আগুনে পুড়ে মরেছে, বেশ হয়েছে। পরপারে গিয়ে আরও শাস্তি ভোগ করুক। পাপের সাজা পেতেই হবে ওদেরকে।

হাজার হোক, নিজের সন্তান। একটু পরেই রাগ থেমে গেল চাচার। তখন কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। আমি কিছু বললাম না। কেঁদে কেঁদে বুকটা একটু হালকা হোক।

অনেকক্ষণ পরে মুখে তুলে চাচা বলল, বাবা, ও তো গেল। আমার আর কেউ নেই। তুই-ই আছিস। এখন তুই আমার ছেলে। চল, প্রাসাদে ফিরে যাই।

প্রাসাদে ফিরেই শুনলাম আরেক দুঃসংবাদ। রাজ্য আক্রমণ করেছে শত্রু। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেই উজির। যে আমাদের রাজ্য দখল করে নিয়েছে। চাচার সৈন্যরা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। শহরে ঢুকে পড়েছে শত্রু সৈন্য। কচুকাটা করছে চাচার লোকদের। বুঝলাম, আর কোনো আশা নেই।

কী করা যায়! কী করা যায়! ভাবছি! একবার মনে হল, যাই তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু জানি তাতে কোনো লাভ হবে না। আমার একার পক্ষে এত বড় সেনাবাহিনী ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মারা পড়তে বেশিক্ষণ লাগবে না। এ ছাড়া যারা আক্রমণ করেছে, তারা সবাই আমাকে চেনে। ধরতে পারলে উজিরের কাছে নিয়ে যাবে। তখন হবে আরও অনেক নিষ্ঠুর মৃত্যু। তারচেয়ে অন্য এক ফন্দি ঠাউরালাম। চাপদাড়ি আর গোঁফ কামিয়ে ফেললাম। কানা চোখে ঠুলি পরে, একটা ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়িয়ে, ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

শুনেছি, বাগদাদের শাসনকর্তা খলিফা হারুন অর-রশিদ আল্লাহর পয়গম্বর। পরম দয়ালু লোক। তাঁর কাছে অধমের আর্জি পেশ করে, বিচার পাওয়ার আশায়ই অনেক দুর্গম পথ পেরিয়ে এই শহরে ছুটে এসেছি। শহরে যখন ঢুকলাম, আঁধার নেমেছে

তখন। পথঘাট চিনি না, কোথায় থাকব জানি না। এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এই সময় আমারই মতো আরেকজন কালান্দর এসে হাজির। তার সঙ্গে কথা বলছি, আরও একজন এসে হাজির। তিনজনে পরামর্শ করে কাছেই আপনাদের বাড়িটা দেখে এসে কড়া নেড়েছি।

আমার কাহিনী শুনলেন, এখন যা খুশি করতে পারেন।

প্রথম কালান্দরের কাহিনী শুনে খুশি হল বড় বোন। বলল, তোমাকে মুক্তি দিলাম। যেখানে খুশি চলে যেতে পার তুমি।

কালান্দর বলল, কিন্তু আমার দুই সঙ্গীর কাহিনী না শুনে নড়ছি না আমি।

উজিরের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন খলিফা, এমন ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটতে পারে, ভাবা যায় না।

উজির কিছু বলার আগেই প্রথম কালান্দর সরে জায়গা করে দিল। এগিয়ে এল দ্বিতীয় কালান্দর।

দ্বিতীয় কালান্দরের কাহিনী

বলতে শুরু করল দ্বিতীয় কালান্দর :

আজ আমার ফকিরের বেশ, মালকিন, কিন্তু আমিও ফকির ছিলাম না। আমার এই বাঁ চোখটাও আগে কানা ছিল না। আমিও এক বাদশাহর ছেলে। আমার বাবার শুধু ধনরত্নই ছিল না, ছিল অগাধ বিদ্যা। আমাকেও অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছেন তিনি। আমাদের প্রাসাদে পৃথিবীর সেরা সব বইপত্র ছিল, সেসব নিয়েই দিন কাটত আমার।

নিজের প্রশংসা করছি, কিন্তু না বলেও পারছি না, লোকে বলত আমি নাকি মহাবিদ্বান। আমার অনেক জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি। দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল আমার বিদ্যার কথা। বাদশাহ-সুলতানরা আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে যেতেন, গুণীর সম্মান করার জন্য।

সেবার সমরখন্দের বাদশাহর কাছ থেকে দাওয়াত এল। আব্বাজানের অনুমতি পেতে দেরি হল না। অনেক দিনের পথ। ছয়টা জাহাজে লোক-লস্কর, খাবারদাবার, পোশাক-আশাক বোঝাই করা হল। রওনা হলাম।

এক মাস একটানা চলার পর একদিন বন্দরে এসে ভিড়ল আমাদের জাহাজের বহর। ঘোড়া আর উটগুলোকে নামানো হল জাহাজ থেকে। ওদের পিঠে বোঝাই করা হল বাদশাহ'র জন্য নিয়ে আসা নানারকম উপহার।

বন্দর থেকে বাদশাহ'র প্রাসাদ বেশি দূরে নয়, সেখানে যেতে দেরি হবে না। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ। মরুভূমির ওপর দিয়ে চলার সময় হঠাৎ উঠল দারুণ ঝড়। ধুলোয় আঁধার হয়ে গেল চারদিক। ঘূর্ণিবাতাসে পড়ে কে যে কোথায় ছিটকে পড়লাম তার ঠিক রইল না।

ঝড় থামল এক সময়। অন্ধকার কেটে গেল। দেখলাম, আমরা কয়েকজন মরুভূমির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হল একদল দস্যু, হাতে খোলা তলোয়ার। দেখতে দেখতে আমাদেরকে ঘিরে ফেলল ওরা। প্রাণের আশা ছেড়ে দিলাম। বাদশাহর নাম করে মুক্তি পাওয়ার আশায় বললাম, এদেশের শাহেনশাহ'র জন্য উপহার নিয়ে যাচ্ছি আমরা। প্রাণের মায়া থাকলে ছেড়ে দাও।

আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল সর্দার। তারপর কর্কশ গলায় বলল, শাহ-ফাহ চিনি না আমরা। সামনে মালপত্র পেয়েছি, লুট করব, ব্যস।

বোকার মতো বাধা দিয়ে বসল আমার এক গোলাম, তলোয়ারের এক কোপে তার ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দিল এক ডাকাত। শুরু হয়ে গেল হট্টগোল। মালপত্র ফেলে প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুট লাগাল আমার লোকেরা। একা দাঁড়িয়ে থেকে মরি কেন? আমিও ছুটলাম একদিকে। একেবারে চোঁ চাঁ দৌড়।

ছুটতে ছুটতে এসে উঠলাম এক পাহাড়ের মাথায়। খুঁজে খুঁজে একটা গুহা বের করলাম। ওদিকে সাঁঝ হয়ে এসেছে। রাতটা সেই গুহায়ই কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকাল হলে গুহা থেকে বেরোলাম। ডাকাতদের কাউকে দেখা গেল না। হাঁটতে শুরু করলাম একদিকে। বেশিক্ষণ হাঁটতে হল না। এক শহরে এসে হাজির হলাম। কী সুন্দর সেই শহর! প্রকৃতিও এখানে চমৎকার! দেখেশুনে মনে হল, বছরের সব সময়েই এখানে বসন্ত বিরাজ করে।

চারদিকের দোকানপাট আর অন্যান্য দৃশ্য দেখতে দেখতে শহরের পথ দিয়ে হেঁটে চললাম। এক দর্জির দোকানের সামনে এসে থামলাম। কাপড় রিপু করছিল বুড়ো দর্জি, আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। বিদেশি বুঝতে পেরেই বোধহয় হাসল। আমিও হেসে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমার পরিচয় জানতে চাইল দর্জি। সব শুনে ভয় ফুটল তার চোখে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, এ কোথায় এসে পড়েছ তুমি, বাবা! এদেশের বাদশাহ তোমার বাপের বড় শত্রু। তোমাকে দাওয়াত করার আসল উদ্দেশ্য হল, ডেকে এনে খুন করা। আসল পরিচয় জানলে এদেশে কেউ আশ্রয় দেবে না তোমাকে।

আমি অনুনয় বিনয় করলাম। মায়া হল দর্জির। থাকতে বলল। খাবার সময় হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে খেতে বসল সে।

সেদিন রাতে কাজকর্ম সেরে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসল দর্জি। অনেক রাত পর্যন্ত চলল আমাদের গল্পগুজব। তারপর উঠল সে। একটা মাদুর আর চাদর এনে আমাকে দিয়ে বলল, অনেক রাত হল। এবার শুয়ে পড়ো।

মাদুর বিছিয়ে দোকানের একপাশে শুয়ে পড়লাম। এভাবে তিন দিন তিন রাত কাটল দর্জির দোকানে। চারদিনের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করল দর্জি, এভাবে তো চলবে না, বাবা। কামাই রোজগার করার মতো কোনো বিদ্যে জানা আছে?

বললাম, নিশ্চয়ই জানি। আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আমি। প্রচুর পড়াশোনা করেছি দর্শন আর সাহিত্য নিয়ে। আর হিসাবশাস্ত্র তো আমার মুখস্থ।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল দর্জি, ওসব বিদ্যে দিয়ে তো রুটি-কাপড় জোগাড় করতে পারবে না। এখানে পড়াশোনার কদর কেউ করে না। সবারই এক ধান্দা, কী করে পয়সা বানানো যায়, আরও বড়লোক হওয়া যায়।

হতাশ হয়ে বললাম, কিন্তু এ ছাড়া তো আর কিছু জানা নেই আমার।

কী যেন ভাবল দর্জি। তারপর আমাকে অভয় দিয়ে বলল, ঠিক আছে, ভেব না। আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, খাবার জোগানোর দায়ও তাঁরই।

দোকান থেকে বেরিয়ে গেল দর্জি। খানিক পরে হাতে একটা কুড়াল নিয়ে ফিরে এল। কুড়ালটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে রোজ বনে চলে যাবে। এক মোট করে কাঠ কেটে আনবে। বেচে যা পাবে, তাতেই খাওয়া পরা চলে যাবে।

আমি একা নই, আরও কাঠুরে আছে শহরে। তাদের সঙ্গে বনে চলে যাই, কাঠ কেটে নিয়ে আসি। এক মোট কাঠের দাম আধা দিনার। একার পেট, খেয়ে-পরেও আধা দিনার থেকে কিছু বেঁচে যায়। সেটা জমাই। থাকি দর্জির সঙ্গেই, তার দোকানেই ঘুমাই। এভাবে একটা বছর কেটে গেল।

একদিন অন্যান্য দিনের মতোই কাঠ কাটতে বনে গেছি। বনে ঢুকে নতুন একদিকে চলে এলাম। চারদিকে মোটা মোটা অসংখ্য গাছ। তাজা জ্যান্ত গাছের ভিড়ে একটা মরা শুকনো গাছ দেখতে পেলাম। দাঁড়িয়েই আছে গাছটা, কিন্তু মরা। পাতা সব শুকিয়ে ঝরে গেছে। এই গাছটাকেই বেছে নিয়ে কুড়ালের কোপ বসালাম।

কয়েক কোপ দিতেই ঠন করে ধাতব আওয়াজ হল। অবাক হয়ে দেখি কুড়ালের মুখে একটা তামার আঙটা উঠে এসেছে। তাজ্জব কাণ্ড তো! তাড়াতাড়ি গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়তে লাগলাম। খানিকটা খুঁড়তেই একটা কাঠের পাটাতন বেরিয়ে পড়ল। অনেক কায়দা কসরত করে পাটাতনটা সরিয়ে ফেললাম। ধাঁধা লেগে গেল চোখে। ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি, তলায় এক বিরাট প্রাসাদ।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। প্রাসাদের ভিতরে ঢুকলাম। এক বিশাল কামরায় পালঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে এক পরমা সুন্দরী যুবতী। অবাক হয়ে ভাবলাম, ও মানুষ না পরী!

আমার সাড়া পেয়ে চোখ মেলল মেয়েটা। আমাকে দেখে সে-ও অবাক হল। বলল, তুমি মানব না দানব?

বললাম, আমি মানব।

মেয়েটা বলল, আজ বিশ বছর এখানে কেটেছে আমার। এতদিন কোনো মানুষের মুখ দেখিনি। তুমি এলে কী করে?

বললাম, খোদা তোমার কাছে আমাকে নিয়ে এসেছে, সুন্দরী। এতদিন অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট পেয়েছি, আজ তোমাকে দেখে সব ভুলে গেলাম। আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী শোনালাম তাকে। আমার করুণ কাহিনী শুনে চোখে পানি এসে গেল তার।

এরপর আমাকে তার নিজের জীবনের কাহিনী শোনাল। সে কাহিনীও কম বিচিত্র নয়। বলল, আমি ইফতিমাস দেশের সুলতানের মেয়ে। চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের দিন আমাকে চুরি করে তুলে এনেছে বাজমুস দৈত্যের ছেলে জারজিস। তারপর থেকেই আমাকে এখানে বন্দি করে রেখেছে। কোনো দিক থেকে আমার কোনো অভাব রাখেনি সে। যা যখন খেতে চাই তখনি

এনে দেয়, সাজপোশাক চাইলে চোখের পলকে নিয়ে এসে হাজির। দশ দিন পর পর আমার ঘরে আসে সে। একদিন এক রাত আমার কাছে থাকে। পরদিন সকালে চলে যায়। এর মাঝে যদি কোনো কারণে কোনো কিছুর দরকার হয় আমার, তাকে ডাকলেই সে চলে আসে। এই ঘরের পাশে আরেকটা ছোট ঘর আছে। ঘরের দেয়ালে দুই লাইন মন্ত্র লেখা আছে। সেই লেখার উপর হাত রেখে তাকে ডাকলেই সে এসে পড়বে। চারদিন আগে এসেছিল সে। আবার আসতে ছয় দিন দেরি আছে। ইচ্ছে করলে এই সময়টা আমার সঙ্গে কাটাতে পার তুমি। জারজিস আসার আগেই আবার চলে যেয়ো, তাহলেই হবে।

মেয়েটার প্রস্তাবের রাজি হয়ে গেলাম।

খুশি হল মেয়েটা। উঠে এসে আমার হাত ধরে টেনে গিয়ে বিছানায় বসাল। আমার হাতের মাঝে ওর হাত। শিরায় শিরায় রক্ত চলাচলের গতি বেড়ে গেল আমার। কথাবার্তার মাঝে এক সময় বলল, চল তোমাকে এই পাতালপুরীটা ঘুরিয়ে দেখাই।

তাজ্জব হয়ে দেখতে লাগলাম সাজানো-গোছানো চমৎকার ঘরগুলো। শেষে হামাম ঘরে এলাম আমরা। দামি আতরের গন্ধে ভরে আছে ঘরের বাতাস। প্রকাণ্ড এক বৃত্তাকার চৌবাচ্চা ঘরের ঠিক মাঝখানে। চৌবাচ্চার মাঝে পানির ফোয়ারা। একনাগাড়ে পানি বেরিয়ে চৌবাচ্চায় পড়ছে।

চৌবাচ্চার বাঁধানো পাড়ে পানিতে পা ডুবিয়ে বসলাম আমরা। গল্প করে কাটালাম কিছুক্ষণ। তারপর খেতে বসলাম।

খেতে খেতে তার জীবনের অনেক দুঃখের ঘটনা বলল আমাকে মেয়েটা। শেষে বলল, তুমি এলে, তাই আমার মুখে হাসি দেখছ। গত বিশটা বছর আমি শুধু কেঁদেছি আল্লাকে ডেকেছি। তিনি আমার ডাক শুনেছেন, তাই তোমাকে পাঠিয়েছেন। নইলে এই নিঝুমপুরীতে কি কোনো মানুষ ঢুকতে পারে!

এক বছর ধরে পোড়ারুটি আর ডাল খেয়ে খেয়ে ভালো খাবারের স্বাদ কী, ভুলেই গিয়েছিলাম। আস্ত মুরগির রোস্ট, তন্দুরি রুটি, শাহি হালুয়া আর আরও সব চমৎকার খাবার দেখে কোনটা রেখে কোনটা খাব অবস্থা হল আমার। তা ছাড়া খিদেও পেয়েছিল খুব। গোগ্রাসে গিলতে গিলতে মেয়েটার কথা শুনছি। সে খাচ্ছে খুব অল্পই।

খাওয়া শেষে মদের পাত্র টেনে নিলাম। গান ধরল মেয়েটা। কী সুন্দর গলা। আর গানের কথাগুলোও কী সুন্দর! মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল আমার। অনেকদিন পর নতুন করে জীবন ফিরে পেলাম যেন।

বড় মায়া হল মেয়েটার জন্য। বললাম, তোমাকে এই পাষাণপুরীতে ফেলে যাব না। তবে তার আগে দৈত্যটার একটা ব্যবস্থা করব।

ছেলেবেলা থেকেই দৈত্য দেখার খুব শখ ছিল আমার। তা ছাড়া মেয়েটাকেও মুক্ত করতে হবে। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারার লোভ সামলাতে পারলাম না।

অনেক রকমে বাধা দিল আমাকে মেয়েটা। বিপদ হবে বলে অনেক বোঝাল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? মন্ত্রটা কোথায় লেখা আছে আগেই দেখিয়েছিল সে আমাকে। কুড়ালটা তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘা মারলাম লেখাটার উপর। বিলাপ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। আমার হাত ধরে জোরে এক টান মেরে বলল, জলদি এখান থেকে পালাও! নইলে দুজনকেই মরতে হবে!

মেয়েটার চেঁচামেচিতে হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটলাম সিঁড়ির দিকে। খানিকদূর উঠেই খেয়াল হল, কুড়ালটা আর জুতোজোড়া ফেলে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরে আবার ওগুলো আনতে গেলাম। ঘরে ঢোকার আগেই কানে এল দৈত্যের গর্জন, কী, হয়েছে কী?

দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। ওরেব্বাপরে! কী বিশাল তার শরীর! আর কী বিকট চেহারা। আতঙ্কে ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল আমার।

সমানে ঘর ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে দৈত্যটা, কী হয়েছে, জলদি বল? কে কী করেছে? এমন জোরে জোরে ডাকলি কেন?

মিনমিন করে বলল মেয়েটা, না, কেউ কিছু করেনি। একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলাম। এই ঘরটা দিয়েই যাচ্ছিলাম। টলে পড়ে গিয়েছিলাম ওই লেখাটার উপর...

মেয়েটার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না দৈত্য, তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে। নিচের দিকে তাকাতেই আমার জুতোজোড়া আর কুড়ালটার ওপর নজর পড়ল দৈত্যের। ব্যস, বাজ পড়ল যেন ঘরের ভিতর। বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, বেইমান! মিথ্যুক! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাসনি! জলদি বল, এগুলো কার। কোনো পুরুষ এসেছিল?

মেয়েটা বলল, সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর, এগুলো এই প্রথম দেখলাম। মনে হয় তুমিই কোনো সময় এনেছিলে ওগুলো, এখন ভুলে গেছ।

গর্জে উঠল দৈত্য, চালাকির আর জায়গা পাসনি, আমি নিয়ে এসেছি! আমি ভুলে গেছি। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা! আজ তোর একদিন কি আমার...

একটানে মেয়েটাকে মাটিতে ফেলে মারতে শুরু করল দৈত্য। তখনি একটা কিছু করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু কাপুরুষ আমি। মেয়েটাকে দৈত্যের হাতে ফেলে পালিয়ে এলাম। সোজা চলে এলাম শহরে, সেই দর্জির দোকানে।

আমাকে দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠল দর্জি। কাল সারারাত কোথায় কাটিয়েছ? সবাই ঘরে ফিরল, তুমি এলে না। কী যে চিন্তা হচ্ছিল আমার। ভাবলাম বাঘেটাঘে ধরেছে, খেয়ে ফেলেছে তোমাকে। যাক আল্লার রহমতে ভালোয় ভালোই ফিরেছ। তা ছিলে কোথায়?

দর্জির পাশে বসে কথা বলতে লাগলাম। শেষ করার আগেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। উঠে গেল দর্জি। ফিরে এল খানিক পরেই। বলল, তোমার জুতো আর

কুড়াল ফেলে এসেছিলে। সেগুলো নিয়ে এসেছে এক পার্শি লোক। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

দর্জির কথা শুনে আমার তো প্রাণ উড়ে গেল। দৈত্যটা ঠিকই এসে হাজির হয়েছে আমার খোঁজে। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। কী করি এখন! ভাবতে লাগলাম।

দর্জি বলল, যাও না, একবার দেখা করেই এস। তোমার উপকারই তো করছে লোকটা। জিনিস ফেলে এসেছিলে, পেয়ে ফেরত দিতে এসেছে। জিনিসগুলো নিয়ে শহরের এখানে-ওখানে অনেক ঘুরেছে। কাঠুরেরা যে এলাকায় থাকে সেখানেও গিয়েছিল। তারাই আমার দোকানের খোঁজ দিল। যাও ওকে সেলাম জানিয়ে এস।

সেলাম জানাতে যাব কী, ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। কোনো রকমে উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। পাল্লা একটু ফাঁক করে উঁকি দিলাম। এক হাতে জুতোজোড়া অন্য হাতে কুড়ালটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক।

ওর সামনে যাব কি যাব না ভাবছি, এমন সময় দরজার ফাঁক দিয়ে একটা হাত গলিয়ে দিল দৈত্য। খপ করে আমার হাত চেপে ধরে একটানে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর মানুষের বেশ থেকে আবার দৈত্যের বেশ নিয়ে বিকট এক আওয়াজ করে আমাকে তুলে নিয়ে এক লাফে আকাশে উঠে পড়ল। তার বিশাল থাবায় ঝুলতে ঝুলতে আকাশ পথে উড়ে চললাম আমি।

প্রায় বেহুঁশই হয়ে পড়েছিলাম। প্রাসাদে ঢুকে আমাকে হাত থেকে ছেড়ে দিল দৈত্য। দড়াম করে আছড়ে পড়লাম মেঝেতে। চোখ খুলে দেখি, রক্তাক্ত শরীরে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে মেয়েটা।

গর্জন করে মেয়েটাকে ডাকল দৈত্য, দেখ, কাকে ধরে এনেছি।

গোঙাতে গোঙাতে মেয়েটা বলল, একে আমি চিনি না। জীবনে কখনও দেখিনি।

গর্জে উঠল দৈত্য, আবার মিথ্যে কথা! ঠিক আছে তোর কথা বিশ্বাস করব। এই নে তলোয়ার, এককোপে ওর মাথাটা কেটে ফেল দেখি?

তলোয়ারটা হাতে তুলে নিল মেয়েটা। আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের ইশারায় কাতর মিনতি করলাম, আমাকে মেরো না। মেয়েটা তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দিল।

তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিল দৈত্য। তুলে দিল আমার হাতে। বলল, ওকে কেটে ফেল। তাহলে তোকে ছেড়ে দেব।

চোখ ফেটে পানি এসে গেল আমার। তলোয়ারটা ফেলে দিয়ে কাতর গলায় মিনতি করলাম দৈত্যকে, হে দৈত্য, দৈত্যের দুনিয়ায় তুমি রাজা। তোমার হুঙ্কারে দুনিয়া কেঁপে ওঠে। এই নিষ্ঠুর কাজ করতে বাধ্য কোরো না আমাকে। মেয়েটা আমাকে মারতে পারল না, কারণ এখনও ওর কোনো ক্ষতি করিনি আমি। আমার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তাকেও একই কারণে খুন করতে পারব না আমি। বরং আমাকে তুমি মেরে ফেল। তবু একটা নির্দোষ মেয়েকে জবাই করতে বোলো না।

বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বলল দৈত্য, হুম! বুঝতে পারছি, প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ তোমরা!

তলোয়ারটা তুলে নিল দৈত্য। দুই কোপে মেয়েটার হাত দুটো কেটে ফেলল। তারপর পা দুটো কেটে আলাদা করল। ওই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে আমার কী অবস্থা হয়েছিল অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়, মালকিন? হাত-পা নেই। তবু আমার দিকে করুণ চোখে তাকাল মেয়েটা। সে চোখে গভীর ভালোবাসার ইঙ্গিত। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না দৈত্যের। এক কোপে মেয়েটার ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে দিল।

মেয়েটাকে খুন করে আমার দিকে তাকাল দৈত্য। জ্ঞান হারিয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম। কানে এল দৈত্যের কথা, শোন মানুষের বাচ্চা, আমাদের দৈত্যসমাজের নিয়ম ব্যাভিচারিণীর একমাত্র সাজা মৃত্যু। কাজেই তাকে মরতে হল। বিয়ের দিনে তাকে চুরি করে এনে এই পাতালপুরীতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তখন তার বয়স বারো। বিশ বছরেও তার মনে আমার জন্য ভালোবাসা জন্মাল না। ভালোবাসল সে তোকে। নিজের চোখে তোদের কাণ্ডকারখানা দেখিনি আমি। তোর দোষ কতটা, জানি না। এজন্যই তোকে জানে মারব না আমি। তবে সাজা তোকে পেতেই হবে। তোকে জানোয়ার বানিয়ে রাখব। এখন বল কোন জানোয়ার হবার ইচ্ছে তোর...জলদি বল। আমার সময় কম।

মানুষ থেকে কোনো জানোয়ার হয়ে শান্তি পাব? বললাম, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কোন জানোয়ার হলে ভালো হবে।

তাড়া লাগাল দৈত্যটা। ভাবো ভাবো, কোন জানোয়ার হতে সাধ। গাধা, ঘোড়া, কুকুর, খচ্চর, না বানর?

কোনো জবাব দিলাম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভীষণ রেগে গেল দৈত্য। আমাকে তুলে নিয়ে মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এল, সাঁ করে আকাশে উঠে পড়ল। উড়তে উড়তে এক পাহাড়ের মাথায় এসে নামল সে। আমাকে নামিয়ে রেখে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল। তারপর সেই মাটি ছিটিয়ে দিল আমার উপর। চেঁচিয়ে বলল, যা, বানর হয়ে যা! কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে বানর হয়ে গেলাম আমি। রোম-ওঠা এক বুড়ো বানর। ক্ষোভে, দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলাম! দারুণ মজা পেয়ে পিত্তি জ্বালানো গলায় খিকখিক করে হেসে উঠল দৈত্য। লাফ দিয়ে আকাশে উঠে হারিয়ে গেল সে।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কপালের কী নির্মম পরিহাস! বাদশাহ'র ছেলে আমি। কত বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা আমার, অথচ কোনো কাজেই লাগল না সেসব। ঘৃণ্য এক বানরে পরিণত হয়েছি।

মনকে বোঝালাম, বসে বসে ভেবে আর কী লাভ? আস্তে আস্তে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নামলাম। কাছেই সাগরতীর। আশপাশে লোকালয় নেই, কোথায় যাব? এরপর থেকে সারাদিন সাগরের কূলে গাছে গাছে ঘুরে বেড়াই। গাছের ফল আর ঝরনার পানি খাই। রাতে গাছের ডালেই ঘুমাই। এভাবেই কাটে দিন।

একদিন, সাগরের কূলে গাছে বসে আছি। এই সময় একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে কাছে এল জাহাজ। তীরে ভেড়ানো হল ওটাকে। মিষ্টি পানির খোঁজে নেমে এল কয়েকজন নাবিক।

গাছের ডাল থেকেই বিরাট এক লাফ মারলাম। গিয়ে পড়লাম একবারে জাহাজের ডেকে। ধর ধর, মার মার, শোরগোল পড়ে গেল। লাঠিসোঠা নিয়ে তেড়ে এল নাবিকেরা। কেউ বলে, মেরে ফেল। কেউ বলে, নিচে ফেলে দাও। একজন এগিয়ে এল একটা তলোয়ার নিয়ে। কায়দা করে মারলাম এক লাফ। লোকটার হাতে উঠে তলোয়ারটা কেড়ে নিলাম। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল সবাই।

পিছিয়ে এলাম। তলোয়ারটা আমার পাশে ডেকের ওপর নামিয়ে রেখে কাঁদতে লাগলাম। হাত-পা নেড়ে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলাম, আমাকে মেরো না তোমরা। তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না আমি। আমার আকার-ইঙ্গিত বুঝল কিনা ওরা কে জানে, তবে অবাক হল। একজন ছুটে গিয়ে খবর দিল কাপ্তানকে।

কাপ্তান এসে আমাকে দেখল। গম্ভীর হয়ে বলল, বানরটা বোধহয় আমাদের সাহায্য চাইছে। ওকে মারার দরকার নেই। দেখি, কী করে।

আমাকে তুলে কাপ্তানের কেবিনে নিয়ে যাওয়া হল। অনেক ভালো ভালো কথা বলল আমাকে কাপ্তান। সবই বুঝলাম আমি, কিন্তু জবাব দিতে পারলাম না। আকারে-ইঙ্গিতে বোঝালাম, তার অনেক কাজ করে দিতে পারব আমি। রেখে দিল আমাকে কাপ্তান।

আস্তে আস্তে কাপ্তানের ব্যক্তিগত গোলাম হয়ে গেলাম আমি। কথা তো বুঝি। সে যা যা করতে বলে, সব ঠিকঠাক করে দিই। আমার কাজে ভারি খুশি কাপ্তান।

পঞ্চাশ দিন পর এক বন্দরে এসে নোঙর করল জাহাজ। সে দেশের সুলতানের লোকজন এসে উঠল জাহাজে। সওদাগরদের সঙ্গে সেলাম বিনিময় করল। সওদাগরের সুলতানের জন্য নানারকম উপহার তুলে দিল লোকদের হাতে। কিন্তু তারা সেসব নিল না। বলল, কয়েক দিন আগে আমাদের উজির মারা গেছেন। তাঁর মতো বিজ্ঞ লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনাদের মাঝে কেউ যদি থাকেন, আমাদের সঙ্গে চলুন। পদটা নিতে পারেন।

উজিরের পদ, সোজা কথা নয়। অনেকেই পদপ্রার্থনা করে দরখাস্তে সই করল। কাগজটা এক ফাঁকে একজনের হাত থেকে খপ করে কেড়ে নিলাম আমি। হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই। কিন্তু কাগজটা কেউ নিতেও সাহস করছে না। পাছে টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলি। ইঙ্গিতে কলম দিতে বললাম একজনকে।

কাছেই দাঁড়িয়েছিল কাপ্তান। আমার ইশারা বুঝতে পারল, বলল, ঠিক আছে। ওকে দোয়াত-কলম দাও। দেখি কী করে।

দোয়াতে কলম চুবিয়ে নিলাম। নাম সই করলাম না। গোটা গোটা অক্ষরে লিখে চললাম। অল্প সময়েই লিখে ফেললাম কবিতার তিনটে ছত্র। তারপর কাগজটা তুলে

দিলাম সুলতানের এক আমলার হাতে। অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল সে, হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল।

কাগজটা নিয়ে গিয়ে সুলতানকে দেখাল আমলা। আমার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। আমলাকে বললেন, দামি পোশাক-আশাক নিয়ে এখনি চলে যাও। শাহী কায়দায় সাজিয়ে নিয়ে যাও আমার খাস খচ্চরটাকে। ওটার পিঠে চড়িয়েই নিয়ে আসবে এই মহাবিদ্বান লোককে। কাড়ানাকাড়া বাজাতে বাজাতে সসম্মানে আনবে। তাঁকেই উজির করব আমি।

সুলতানের কথা শুনে হাসি চাপতে পারল না আমলারা। তাদেরকে মুখ টিপে হাসতে দেখে রেগে গেলেন সুলতান। ধমক দিয়ে বললেন, কী হল? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?

হাতজোড় করে দাঁড়াল আমলারা। জিভ কাটল। সবিনয়ে বলল একজন, হুজুরের কথা অমান্য করার দুঃসাহস যেন না হয়। মানুষ হলে, এখনি গিয়ে তাকে নিয়ে আসতাম, জাঁহাপনা। কিন্তু ওটা তো মানুষ নয়, একটা বানর।

আমলাদের মুখে সব কথা শুনে থ হয়ে গেলেন সুলতান। শেষে বললেন, কাপ্তানের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এস বানরটাকে। যত টাকা লাগে, নিয়ে যাও। ওই বানর আমার চাই। ওকেই উজির করব। শাহী খচ্চরে বসিয়ে মানুষের মতোই সম্মান করে নিয়ে আসবে তাকে। যাও।

অনেক টাকা দিয়ে কাপ্তানের কাছ থেকে আমাকে কিনে নিল আমলারা। তারপর মানুষের মতোই সম্মান করে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল সুলতানের দরবারে। মানুষের কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানালাম সুলতানকে। তারপর হাতজোড় করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

আমার নিখুঁত দরবারি আদব-কায়দা দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন সুলতান, খুশিও হলেন। উজিরের আসনে বসার ইঙ্গিত করলেন। আমি গিয়ে বসতেই অন্য সব লোককে দরবার ছেড়ে চলে যেতে বললেন সুলতান। সবাই চলে গেল। শুধু রইল তাঁর দশ বছরের একটা প্রিয় চাকর, আর হারেমের প্রধান খোজা হাবশি গোলাম।

আমাকে খাবার দেবার জন্য চাকরকে হুকুম দিলেন সুলতান। ভালো ভালো সব খাবার। অনেকদিন পর পেট পুরে খেলাম। বানরের কোনো লক্ষণই নেই আমার আচার-ব্যবহারে।

খাওয়া শেষে চাকরকে কাগজ-কলম আনতে বললেন সুলতান। কয়েক ছত্র কবিতা লিখতে বললেন। ঝরঝরে অক্ষরে সুন্দর কয়েক ছত্র কবিতা লিখলাম, সবই ফারসি ভাষায়। লাইনগুলো পড়ে আরও অবাক হলেন সুলতান। আপন মনেই বলতে লাগলেন, একটা বানরের এত জ্ঞান! খোদার কী মহিমা!

দাবা খেলা জানি কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। ঘাড় কাত করে সায় দিলাম। চাকরকে দাবার ছক আর ঘুঁটি আনার হুকুম দিলেন তিনি।

কয়েক চালেই মাত করে দিলাম সুলতানকে। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। দাবা খেলায় তাঁর জুড়ি নেই সেদেশে। অথচ মাত্র কয়েক চালেই তাঁকে হারিয়ে দিয়েছি আমি। তিনি বলতে লাগলেন, তুমি যদি মানুষ হতে, দুনিয়ায় সেরা জ্ঞানী লোক বলে মানতে কোনো দ্বিধা থাকত না!

সুলতানের এক রূপসী কন্যা ছিল। তাকে সাংঘাতিক ভালোবাসতেন সুলতান। আজব বানরটা দেখানোর জন্য, মেয়েকে ডেকে আনতে হাবশিকে অন্দরে পাঠালেন তিনি।

একটু পরেই এল শাহজাদি। আমার দিকে চোখ পড়তেই নেকাবে মুখ ঢাকল। বলে উঠল, পরপুরুষের সামনে দরবারে ডেকেছ কেন আমাকে, আব্বাজান?

চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন সুলতান। বললেন, পরপুরুষ কোথায় মা? কই আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!

শাহজাদি বলল, কেন? ওই যে তোমার পাশে বসে আছেন, উনিই তো পরপুরুষ। ফার দেশের বাদশাহ ইফতিমারাসের ছেলে। দৈত্য জারজিসের জাদুতে বানর হয়ে গেছেন। জ্ঞানে-গরিমায় এই শাহজাদার তুলনা নেই তামাম দুনিয়ায়। কিন্তু কপালের দোষে ইনি আজ বানর হয়ে আছেন।

আমার দিকে তাকালেন সুলতান। তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, যা বলছ, সব সত্যি?

শাহজাদি বলল, ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না, আব্বাজান।

আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন সুলতান। ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলাম আমি।

শাহজাদিকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান, তুমি এসব কী করে জানলে মা?

শাহজাদি বলল, ছোটবেলায় আমার বুড়ি চাকরাণির কাছে জাদু শিখেছিলাম। তারপর থেকে এ বিদ্যা চর্চা করে এসেছি, অনেক পড়াশোনা করেছি এ ব্যাপারে। একশো সত্তরটা মন্ত্র শিখেছি আমি। ইচ্ছে করলেই কাজে লাগাতে পারি এসব। এমন জাদু শিখেছি আমি, আব্বাজান, যদি বল এই মুহূর্তে তোমার এই প্রাসাদ ফুঁ মেরে শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারি। এক তুড়িতে শহরটাকে মরুভূমি করে দিতে পারি। এক আঁজলা পানি ছিটিয়ে সমভূমি করে দিতে পারি কাফ পর্বতমালাকে। পাহাড়ের ওপারের লোকালয় আর বনকে করে দিতে পারি অকূল দরিয়া। দরিয়ার পানিতে সাঁতার কেটে বেড়াবে তোমার প্রজারা।

অবাক হয়ে বললেন সুলতান, এমন আজব বিদ্যা তুমি শিখেছ, কই, জানি না তো! অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছ তুমি। যাক, ভালোই হয়েছে। এখন এই বেচারাকে আবার মানুষ করে দাও তো। কত বড় জ্ঞানীগুণী মানুষ, তাকে আমার উজির করে রাখব। জলদি মা, এই বেচারাকে অভিশাপ থেকে মুক্ত কর।

শাহজাদি বলল, তাই হবে, আব্বাজান।

একটা ছুরি নিয়ে এল সে। চুরির ফলার আঁচড়ে হিব্রু ভাষায় কয়েকটা কথা লিখল দরবার ঘরের মেঝের ঠিক মাঝখানে। লেখাটাকে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকল একটা।

তারপর বৃত্তের মাঝে সেই লেখাটার উপর গিয়ে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল, ভাষাটা যে কী, এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না। আচমকা আঁধার হয়ে গেল ঘরের ভিতর। ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যায় না। আমার মনে হল, প্রাসাদটা দুলছে। ধীরে ধীরে আবার কেটে গেল অন্ধকার। ভয়ঙ্করদর্শন সেই দৈত্যকে দেখলাম। বিকট রূপ ধারণ করেছে সে। কিন্তু জারজিসকে চিনতে একটুও ভুল হল না আমার। শিউরে উঠলাম আতঙ্কে।

হেসে বলল শাহজাদি, এস এস জারজিস, তোমার অপেক্ষাই করছি।

বিকট গর্জন করে উঠল দৈত্য। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, আমার বিরোধিতা করে কেউ কখনও পার পায়নি, তুমিও পাবে না। সাজা তোমাকে পেতেই হবে।

চোখের পলকে বিশাল ভয়ঙ্কর এক সিংহের রূপ নিল দৈত্য। বিকট হাঁ করে থাবা বাড়িয়ে ছুটে গেল শাহজাদির দিকে। ভয়ে আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

কিন্তু একটুও ভয় পেল না শাহজাদি। এক টানে মাথার একটা চুল ছিঁড়ে নিয়ে তাতে ফুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাল তলোয়ার হয়ে গেল চুলটা। তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে-তলোয়ার থেকে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমাদের। এক কোপে সিংহের ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে দিল শাহজাদি।

ভেবেছিলাম, মরে গেছে দৈত্য। কিন্তু না, তখনও অনেক বাকি। বিশাল এক বিষাক্ত কাঁকড়া বিছের রূপ নিল কাটা মুণ্ডুটা। শাহজাদির পায়ে কামড় বসাতে ছুটে গেল। চোখের পলকে বিষাক্ত এক সাপ হয়ে বিছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শাহজাদি। প্রচণ্ড লড়াই চলল।

খানিক পরে বিছেটা শকুন হয়ে গেল। সাপটা হয়ে গেল প্রকাণ্ড এক ঈগল। চলল যুদ্ধ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারল না। তারপর শকুনটা হয়ে গেল বনবিড়াল। ঈগলকে আক্রমণ করতে ছুটে গেল। কিন্তু কোনো ক্ষতি করার আগেই ঈগল হয়ে গেল প্রকাণ্ড এক নেকড়ে।

নেকড়ের সঙ্গে আর পেরে উঠছে না বিড়াল। নিমেষে নিজেকে ডালিম করে ফেলল দৈত্য। সরে যাওয়ার জন্য জোরে এক লাফ মারল উপর দিকে। বাড়ি খেল ছাতের সঙ্গে। ভেঙে গেল ডালিমের খোসা। দানাগুলো ছিটকে পড়ল ওদিক-ওদিক।

সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েটা মোরগ হয়ে গেল। খুঁটে খেতে লাগল দানাগুলো। দেখতে দেখতে খেয়ে শেষ করে ফেলল দানাগুলো। একটা বাদে। শেষ দানাটা ঠোঁটে তুলে নিয়েছে, হঠাৎ ফসকে গেল। একটা ফাটলের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল দানাটা। ছুটে গিয়ে ফাটলের মাঝে ঠোঁট ঢোকানোর অনেক চেষ্টা করল মোরগটা, কিন্তু পারল না। ফাটলটা খুবই সরু। চেঁচিয়ে আমাদের কী যেন বোঝাতে চাইল মোরগটা, কিন্তু আমরা বুঝলাম না।

আসলে, মোরগটা বোঝাতে চেয়েছিল, ফাটল থেকে দানাটা বের করে দাও। খেয়ে ফেলব। তাহলেই শেষ হয়ে যাবে দৈত্য। কপালে দুর্ভোগ আছে, তাই বুঝলাম না।

ফাটলটাতে প্রাণপণে ঠোকরাতে লাগল মোরগ। কয়েকবার ঠোকরানোর পরেই ফাটলের একটা জায়গায় ফাঁক একটু বাড়ল। ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল মোরগ, দানাটা তুললও, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। দানাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল চৌবাচ্চার পানিতে। একটা মাছ হয়ে সাঁতরে বেড়াতে লাগল।

পানকৌড়ি হয়ে গেল মোরগটা। তাড়া করে বেড়াতে লাগল চৌবাচ্চার মাছকে। কিন্তু ধরতে পারছে না কিছুতেই। কেটে যাচ্ছে সময়। এক সময় পানির একেবারে তলায় চলে গেল মাছটা। পানকৌড়িও ডুব দিল।

খানিকক্ষণ পরেই উথাল-পাথাল করে উঠল চৌবাচ্চার পানি। তারপরেই পানি থেকে মাথা তুলল এক বিশাল দানব। মাছের চেহারা বদলে তার আসল রূপ নিয়েছে জারজিস। বিশাল দেহ। শরীরটা যেন গনগনে আগুনের তৈরি। ইয়া বড় হ্যাঁ। বড় বড় ধারাল দাঁত। চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মতো।

শাহজাদিও উঠল পানি থেকে। আগুনের আঁচে সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে তার শরীর।

দুজনে দুজনের দিকে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে এগোতে লাগল। শিউরে উঠলাম আবার। পালানোর কথা ভাবলাম। সাংঘাতিক গরম হয়ে উঠেছে ঘরের আবহাওয়া। চৌবাচ্চার পানিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীর ঠাণ্ডা করার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলাম।

আবার শুরু হয়ে গেছে লড়াই। দুটো আগুনের পিণ্ড যেন একে অন্যকে আক্রমণ করছে। হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠে একেবারে আমাদের সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দৈত্য। নাকমুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। আগুনের সেই হলকায় পুড়ে গেল সুলতানের সারা শরীর। আমি একটু দূরে ছিলাম, আগুনের আঁচ পুরোপুরি লাগল না শরীরে। তবে ছোট্ট একটা হলকা এসে লাগল আমার বাঁ চোখে। সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল চোখটা।

সুলতান পড়ে গেলেন। তাকে ধরতে ছুটে এল হাবশি খোজা। আগুনের আরেক হলকা এসে লাগল তার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল বেচারি।

ছুটে এল শাহজাদি। আবার আক্রমণ করল দৈত্যকে। আর পারছে না দৈত্য। শেষমেশ চেঁচিয়ে উঠল সে কাতর কণ্ঠে, ইয়া আল্লা, আর পারছি না আমি। এই শাস্তির চেয়ে মরণ ভালো। আমাকে মৃত্যু দাও। জীবনে যত পাপ করেছি, সব পাপের শাস্তি আজ হয়েছে। দয়া করে তোমার পায়ে এবার ঠাঁই দাও আমাকে, মালিক।

আচমকা থেমে গেল দৈত্যের আর্তনাদ। কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে মেঝেতে পড়ে গেল পাহাড়ের মতো দেহটা। আস্তে আস্তে কমে এল আগুনের তেজ। কমতে কমতে একেবারে শেষ হয়ে গেল। পোড়া কয়লার বিশাল এক পিণ্ডের মতো মেঝেতে রইল লাশটা।

আমাদের দিকে এগিয়ে এল শাহজাদি। চেঁচিয়ে বলল, জলদি আমাকে এ গ্লাস পানি এনে দাও! জলদি!

পানি নিয়ে এল চাকরটা। বিড়বিড় করে মন্ত্র আউড়ে তাতে ফুঁ দিয়ে আবার গ্লাসটা তুলে দিল চাকরের হাতে। বলল, এই পানি ছিটিয়ে দাও এই বানরের গায়ে। তাড়াতাড়ি কর!

আমার গায়ে ছিটিয়ে দেয়া হল পানি।

বিড়বিড় করে পরিষ্কার আরবিতে বলল শাহজাদি, পরম করুণাময়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে আবার আগের চেহারায় ফিরে এস তুমি, শাহজাদা!

দ্রুত রূপ বদলে গেল আমার। বানর থেকে চোখের পলকে আবার মানুষ হয়ে গেলাম। সেই আগের চেহারায়, আগের সবকিছু। শুধু ফিরে পেলাম না বাঁ চোখটা। আগুনের আঁচে পুড়ে গিয়েছিল সেটা।

আমার চোখটার জন্য অনেক দুঃখ করল শাহজাদি। কিন্তু এই চোখ ভালো করা তার ক্ষমতার বাইরে। নরকের আগুনে ধ্বংস হয়েছে এই চোখ।

বাপের পোড়া শরীরের কাছে এসে দাঁড়াল শাহজাদি। কাতর গলায় বলতে লাগল, তোমাদের এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী, আব্বাজান। আমাকে মাপ করে দাও। আমিও আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। আগুনের দহন শুরু হয়ে গেছে আমার ভিতরেও। নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যই এই অবস্থা হল আমার। কিন্তু সেটাও আসল কথা নয়। বড় কথা হল, যার মরণ যখন যেভাবে লেখা আছে, সেভাবেই হবে। কপালের লিখন খণ্ডানোর সাধ্য মানুষের নেই। নইলে, দৈত্য তো কাহিলই হয়ে পড়েছিল। আমার আক্রমণকে শুধু সে ঠেকিয়েই যাচ্ছিল। পাল্টা আক্রমণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। শেষমেশ নিজেই নরকের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আগুনের বিশাল কুণ্ড তৈরি করে তাতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মগোপন করতে চাইল। কিন্তু এত বেশি উত্তাপ হয়ে গিয়েছিল, সইতে পারেনি সে নিজেই। ওকে তাড়া না করলেই পারতাম। নিজের তৈরি আগুনেই পুড়ে মরত সে। কিন্তু কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল। শয়তানটাকে ধরে নিজের হাতে শাস্তি দেব। তার পিছু পিছু আমিও গিয়ে আগুনের ভিতরে ঢুকলাম। তাকে বের করে আনতে পারলাম, কিন্তু নিজেকেও শেষ করে ফেলেছি...আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে আব্বাজান। আমাকে বিদায় দাও।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল শাহজাদি। দেখতে দেখতে ছোট একটা কয়লার ডেলায় পরিণত হল লাশটা।

মেয়ের শোকে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন সুলতান। হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম আমি। রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল। আমি একটা অলক্ষুণে, পোড়াকপালে। যেখানে যাই, নিজের পোড়া কপাল দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করি আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

অনেক অনেকক্ষণ কাঁদলেন সুলতান। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন বেগম আর হারেমের দাসী-বাঁদিরা।

সাতদিন সাতরাত ধরে শোক পালনের ব্যবস্থা করলেন সুলতান।

শোকসপ্তাহ শেষ হলে হাজার হাজার লোক খাটিয়ে এক বেলার মধ্যে মেয়ের কবরের উপর সুন্দর এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করালেন সুলতান। দিনরাত আলো জ্বলার ব্যবস্থা করলেন সেখানে।

মেয়ের শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলেন সুলতান। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, কারো সঙ্গে দেখা করেন না। এইভাবে কেটে গেল এক মাস। তারপর একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর নির্জন কক্ষে। বললেন, শোন বাবা, আমার কথাগুলো খুব খারাপ শোনাবে, তবু না বলে পারছি না। তুমি আসার আগে বেশ সুখেই ছিলাম আমরা। কোনো রকম অশান্তি, কোনো রকম দুর্দশা ছিল না আমাদের। তুমি এলে, আমাদের সৌভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তুমি আমার রাজ্যে আরও থাক, এ আমি চাই না। জানি, তোমার কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার কপালের। তোমার সঙ্গে যে জড়াতে যাবে, তারও তোমারই মতো কপাল পুড়বে। নিজের জীবন দিয়ে তোমার আগের রূপ ফিরিয়ে দিয়েছে আমার মেয়ে। আসল রূপ তো ফিরে পেয়েছ। এবার তুমি আসতে পার। আমার রাজ্যে আর তোমার থাকা চলবে না।

বিশ্বাস করুন, মালকিন, সুলতানের কথা শুনে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল আমার। চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম, ধরণী, দ্বিধা হও, ভিতরে ঢুকে লজ্জা লুকাই আমি। মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম সুলতানের ঘর থেকে। নিজের ঘরে এসে সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেললাম। চোখে ঠুলি পরলাম। কামিয়ে ফেলাম দাঁড়িগোফ। বাদশাহর ছেলে বলে আর কেউ চিনতে পারবে না আমাকে। তারপর ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া কম্বল পরে ভিখিরির বেশে নেমে এলাম পথে। বেরিয়ে এলাম প্রাসাদের আঙিনা ছেড়ে। বেরিয়ে এলাম সুলতানের রাজ্য থেকে। চলতে লাগলাম যেদিকে দুচোখ যায়।

চলতে চলতে অনেক পথ, অনেক পাহাড়, অনেক জঙ্গল, আর বাধা ডিঙিয়ে আজ সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি বোগদাদ শহরে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমারই মতো আরেক কানা ভিখিরিকে। তার খানিক পরেই এসে উদয় হল আরেক কানা কলন্দর। তিনজনে পরামর্শ করে রাতের আশ্রয়ের জন্য বেরোলাম। কড়া নাড়লাম আপনার ঘরের। তারপরের ঘটনা তো আপনি জানেনেই, মালকিন।

কাহিনী শেষ করে বড় বোনের দিকে তাকাল দ্বিতীয় কালান্দর। বলল, এখন মারবেন কি মুক্তি দেবেন, আপনার ইচ্ছে, মালকিন।

দ্বিতীয় কালান্দরের কাহিনী শুনে আরও মুগ্ধ বড় বোন। বলল, অবিশ্বাস্য তোমার কাহিনী! ঠিক আছে, তুমি মুক্ত। যেখানে খুশি, চলে যাও।

কালান্দর বলল, মালকিন, আরেকটু থাকার অনুমতি দিন আমাকে। তৃতীয় কালান্দরের কাহিনী না শুনে যাবার ইচ্ছে নেই আমার।

তৃতীয় কালান্দরের কাহিনী

কাহিনী শুরু করল তৃতীয় কালান্দর :

মালকিন, আমার কাহিনী আগের দুজনের চেয়ে আজব আর অবিশ্বাস্য না-ও হতে পারে। তবে যা বলব, এর সবই সত্যি। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

কপাল আমারও খারাপ, তবে ওদের দুজনের মতো এতটা নয়। তা ছাড়া আমার বাঁ চোখটা হারিয়েছি নিজের দোষে, এতে আর কারো দোষ নেই।

বাদশাহ'র ছেলে আমিও। আমার বাবার নাম কাসিব। তিনি মারা গেলে সিংহাসনে বসলাম আমি। আমার ন্যায়বিচারে আমার ওপর খুব খুশি ছিল প্রজারা।

ছেলেবেলা থেকে সাগরের প্রতি টান ছিল আমার, সাগর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। এর কারণও ছিল। আমাদের দেশটা সাগরের পাড়ে। সাগরের ভিতরে অনেকদূর পর্যন্ত বেশ কিছু ছোট ছোট দ্বীপ আমার দখলে ছিল। বছরে একবার করে রাজ্য সফরে বেরোতাম আমি। দশটা জাহাজ সাজিয়ে বেরোতাম এক মাসের জন্য।

এই রকম সফরের সময়েই একবার পড়লাম বিপদে। মাঝ সাগরে রয়েছে আমার জাহাজের বহর, এই সময় উঠল ঝড়। সারাদিন সারারাত ধরে চলল। থামল পরদিন সকালে। মেঘ কেটে গিয়ে আবার সূর্য দেখা দিল। হেসে উঠল দিন। দেখলাম, ছোট্ট এক অজানা দ্বীপের চড়ায় আটকে আছে আমাদের জাহাজগুলো।

সাগর শান্ত। ঘন নীল পানি দেখে মনেই হয় না, গতরাতে এই পানিতেই ফুঁসে উঠছিল অমন ভয়ানক ঢেউ।

দুই দিন সেই দ্বীপে জিরিয়ে নিলাম আমরা। তারপর এক জোয়ারের সময় জাহাজগুলো আবার সাগরে নামাল কাপ্তান। পাল তুলে আবার যাত্রা শুরু হল আমাদের।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বিশ দিন, কিন্তু হারানো পথের নিশানা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অজানা সাগরে ভাসছে আমাদের জাহাজ।

কাপ্তানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় এসেছি? আর কতদূর?

ঘাড় নেড়ে জানাল কাপ্তান, জানে না সে। বলতে পারবে না। এই সাগর তার অদেখা। অচেনা এ পথে এর আগে কখনও আসেনি।

কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে এক উপায় বের করল কাপ্তান। পানির তলায় এখানে কী আছে জানার জন্য একজন ডুবুরি নামিয়ে দিল।

একটু পরেই ফিরে এল ডুবুরি, মুখে চিন্তার ছাপ। বলল, বড় বড় অনেক মাছ দেখলাম। একটা ডুবো পাহাড়ের ছোট্ট একটা চূড়া দেখলাম। রঙ কালোয়-সাদায় মেশানো।

মাথায় হাত দিয়ে বসল কাপ্তান। মুখ কালো করে বলল, আর রক্ষা নেই। চুম্বক পাহাড়। জাহাজ এখন বাতাসে চলছে না, চলছে চুম্বকের আকর্ষণে। আগামীকালই পৌঁছে যাবে প্রধান চূড়াটার কাছে। জাহাজের সমস্ত লোহা টেনে নেবে চুম্বক পাহাড়। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে জাহাজ। আমাদের মরণের দিন ঘনিয়ে এসেছে জাঁহাপনা। আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন।

শুনেছি, এই পাহাড়ের চূড়ায় একটা গম্বুজ আছে। পিতলের দশটা খুঁটির উপর বসানো এই গম্বুজ। গম্বুজের মাথায় বসানো রয়েছে এক ব্রোঞ্জের ঘোড়ার মূর্তি। পিঠে ব্রোঞ্জের সওয়ারির এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে তলোয়ার। দেহে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ, যুদ্ধের সাজে সজ্জিত এক সৈনিক। তার বুকে আঁটা সিসার ফলকে লেখা আছে দৈববাণী। লোকে বলে, ওই পাহাড়ের চূড়ায় যতদিন ওই ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে থাকবে, ততদিন এদিকে এলে কোনো জাহাজের নিস্তার নেই। ওই ঘোড়সওয়ারকে পাহাড়ের মাথা থেকে ফেলে দিতে না-পারলে ধ্বংসলীলা চলতেই থাকবে। কত হাজার হাজার মানুষ ওখানে গিয়ে জীবন দিয়েছে, তার হিসাব নেই।

মরার আশঙ্কায় কাঁপুনি ধরেছে কাপ্তানের শরীরে। আমাদেরও একই অবস্থা। এক মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। তাঁর কাছে পানাহ্ চাইতে লাগলাম।

দারুণ দুশ্চিন্তার মাঝে রাত কাটল। পরদিন সকালে এসে জানাল কাপ্তান, পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে জাহাজ।

ঠিকই। অল্প সময় পরেই প্রচণ্ড শব্দ তুলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল জাহাজগুলো। উত্তাল ঢেউয়ের পড়ে আমরা কে যে কোথায় হারিয়ে গেলাম ঠিকঠিকানা রইল না। কিছুই ঠাওর করতে পারছি না কে মরল, কে বাঁচল, কোনো হদিসই থাকল না।

জাহাজের একটা ভাঙা কাঠ আঁকড়ে ধরে কোনোমতে ভেসে রইলাম আমি। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভেসে চললাম একদিকে। এলোপাতাড়ি বাতাসে বড় বড় ঢেউ উঠছে। নাকানি-চুবানি খাচ্ছি একনাগাড়ে, কিন্তু কাঠ ছাড়লাম না। হঠাৎ বড় একটা ঢেউ আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলল তীরে, ভেজা বালির চরায়। দেখি, সেই পাহাড়টার গোড়ায় এসে পড়েছি। তারপরই জ্ঞান হারালাম।

কতক্ষণ পর হুঁশ ফিরল, বলতে পারব না। শুধু জানলাম, আমি বেঁচে আছি। আমাকে হাঙরে খায়নি, পানিতে ডুবেও মরিনি। কোনোমতে উঠে বসলাম। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে শরীর, মাথা ঝিমঝিম করছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম একটা পথ উঠে গেছে পাহাড়টার চূড়ায়। আল্লার নাম নিয়ে উঠে পড়লাম। ওই পাহাড়ে চড়ব। দেখব কী আছে ওখানে। সাংঘাতিক খাড়াই পথ। পিছন থেকে বাতাস বইছে। এতে আমার কিছু সুবিধা হল। আস্তে আস্তে উঠে চললাম উপরে।

অনেকক্ষণ পরে আল্লার অশেষ রহমতে উঠে এলাম উপরে। মূর্তির নিচে পৌছে গেছি। পায়ে এক বিন্দু জোর নেই, থরথর করে কাঁপছে শরীর। অবসন্নের মতো ওখানেই এলিয়ে পড়লাম।

ঘুমের ঘোরে দৈববাণী শুনলাম, শোনো কাসিবের পুত্র, উঠে পড়ো। উঠেই তোমার পায়ের তলায় গর্ত খোঁড়। একটা তীর আর একটা ধনুক পাবে। ধনুকে তীর পরিয়ে ছুড়ে মারো ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ করে। ঘোড়াসুদ্ধ ব্রোঞ্জের সওয়ার সাগরে পড়ে তলিয়ে যাবে। ফলে উপকার হবে মানুষের, জাহাজী নাবিকদের। মূর্তিটা পড়ে গেলে তোমার হাত থেকেও ধনুক খসে পড়বে। ওটাকে আগের গর্তে চাপা দিয়ে রাখবে। এরপর দেখবে সাগরের পানি ফুলে উঠছে। উঠতে উঠতে পাহাড়ের চূড়ার সমান হয়ে যাবে পানি। এই সময় একটা ছোট্ট ডিঙি দেখতে পাবে। দাঁড় বেয়ে তোমার দিকেই এগিয়ে আসবে একজন লোক। দেখতে অবিকল ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারের মতো। কিন্তু তাহলেও ঘোড়সওয়ার আর ওই লোক এক নয়। নৌকাটা কাছে এলে দেখবে, সেটা মানুষের মাথার খুলিতে বোঝাই। ভয় পেয়ো না। নৌকাতে উঠে বসবে। তোমাকে নিরাপদে সাগর পার করে দেবে লোকটা। সেরকমই নির্দেশ দেয়া আছে তাকে। একটানা দশ দিন দশ রাত চলার পর চেনা সাগরে পৌছে যাবে তুমি। সেখানে দেখবে একটা সওদাগরি নৌকা। তাতে উঠে বসলেই তোমাকে নিজের দেশে পৌছে দেয়া হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো : খবরদার, ডিঙিতে উঠে ভুলেও নৌকার মাঝির সঙ্গে কথা বলবে না! আবার বলছি, মাঝিকে কোনো প্রশ্ন করবে না, তার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না।

থেমে গেল দৈববাণী। ঘুম ভেঙে গেল। লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। এ কী দেখলাম। স্বপ্ন নয় তো! প্রমাণ করার জন্য পায়ের তলার মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম। না, ভুল বাণী শুনিনি। ঠিকই একটা তীর আর ধনুক পেলাম। ধনুকে তীর পরিয়ে মূর্তিটাকে নিশানা করে ছুড়লাম। বিকট শব্দ উঠল। চূড়া থেকে খসে নিচে সাগরে পড়ে গেল মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ উত্তাল হয়ে উঠল সাগর। ফুঁসে উঠল পাহাড় প্রমাণ ঢেউ। ফুলতে শুরু করল পানি। দেখতে দেখতে উঠে এল আমার পায়ের কাছে। হাত থেকে খসে গর্তে পড়ে গেল ধনুকটা। তাড়াতাড়ি মাটি-চাপা দিয়ে দিলাম। আরও উপরে উঠে পাহাড়ের মাথায় পৌছে গেলাম। পানি চূড়ার সমান হয়ে গেল। এই সময়ই দেখতে পেলাম ডিঙিটা।

ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে একটা লোক, দেখতে হুবহু ঘোড়সওয়ারের মতো। বাণীতে শুনেছি, মূর্তি আর লোকটা এক নয়, তবু অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল আমার আছে।

আরও কাছে এসে গেল নৌকা। তাজ্জব হয়ে দেখলাম, রক্তমাংসের নয় লোকটা, তামার তৈরি। সিসার একটা ফলক আঁটা রয়েছে বুকে। তাতে লেখা আছে কিছু। নৌকাটা আমার একেবারে কাছে এসে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার নৌকা ছাড়ল তামার মূর্তি।

সময় কাটতে লাগল। একে একে কেটে গেল দশটা দিন। নিজের দেশের চেনা সাগরে এসে পড়ল নৌকা। খুশিতে ডগমগ করে উঠলাম, দৈববাণীর কথা ভুলেই গেলাম। জোরে জোরে কৃতজ্ঞতা জানালাম নৌকার মাঝিকে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা পুতুলের মতো বাঁ হাতে তুলে নিয়ে পানিতে ছুড়ে ফেলল মূর্তিটা। এতক্ষণে মনে পড়ল দৈববাণীর কথা। কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে। নৌকাসুদ্ধ কোথায় গায়েব হয়ে গেছে মূর্তিটা। সাগর শান্ত ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ ঢেউয়ের মাতন শুরু হল। বিশাল বিশাল ঢেউ যেন আমাকে লক্ষ করেই ছুটে এল ভয়ানক বেগে। ওদিকে সাঁঝ ঘনিয়ে এসেছে। ভয়ে অবশ হয়ে এল হাত-পা, ভাবলাম, এবার মরণ! আল্লাহকে ডাকলাম মনে মনে। আমার ডাক যেন শুনলেন আল্লাহ। বিশাল একটা ঢেউ আমাকে মাথায় নিয়ে ছুটে চলল। নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলল তীরে। ঢেউটা নেমে গেলে উঠে পড়লাম। শরীর ভীষণ ক্লান্ত। খানিকটা সরে গিয়ে বালির উপরেই বসে পড়লাম আবার। গা থেকে সমস্ত জামাকাপড় খুলে শুকাতে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না।

ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে। কাপড়-চোপড়গুলো শুকিয়ে গেছে। পরে নিলাম আবার। আগের দিন অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি, চেয়ে দেখলাম, সামনেই সবুজ মাঠ। যাক, কোনো মরু অঞ্চলে এসে পড়িনি। তা ছাড়া মানুষ আছে এখানে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। শিগগিরই হাসি চলে গেল মুখ থেকে। কোনো দেশ বা মহাদেশ নয়, দাঁড়িয়ে আছি ছোট্ট এক দ্বীপে। চারদিকে অথৈ পানি।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কপাল চাপড়ানো ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই আমার। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আবার ডাকতে লাগলাম আল্লাহকে।

আবার যেন আমার ডাক শুনলেন আল্লাহ। এক সময় মাথা তুলে সাগরের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম একটা জাহাজ। খুশি হতে গিয়েও হলাম না। এই নির্জন দ্বীপের দিকে জাহাজ আসছে! জলদস্যুর জাহাজ হতে পারে। যা-ই হোক, আগে দেখতে হবে, ওরা কারা। ভালো বুঝলে ওদের সামনে যাব।

একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখে তাড়াতাড়ি তাতে উঠে বসলাম। পাতার আড়াল থেকে তাকিয়ে রইলাম জাহাজটার দিকে।

তীরে এসে ভিড়ল জাহাজ। নোঙ্গর নামল। সিঁড়ি নামানো হতেই তরতর করে নেমে এল জনাদশেক গোলাম। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে কোদাল।

মাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল গোলামেরা। কী যেন খুঁজছে। কোনো ধরনের চিহ্ন হয়তো। চিহ্নটা খুঁজে নিয়ে মাটিতে কোদালের কোপ বসাল ওরা। অল্পক্ষণেই একটা গর্ত করে ফেলল। একটা গুপ্ত দরজা দেখা গেল গর্তের তলায়। দরজা খুলে ভিতরে উঁকি দিল ওরা। সন্তুষ্ট হয়ে আবার ফিরে এসে উঠল জাহাজে।

কিছুক্ষণ পর আবার জাহাজ থেকে নামল ওরা। হাতে মাথায় অসংখ্য বোঝা। দেখে শুনে অনুমান করলাম, ওগুলোতে দামি দামি খাবার, জামাকাপড় আর

ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসপত্র রয়েছে। মালগুলো নিয়ে গুপ্ত দরজা দিয়ে নিচে নেমে গেল ওরা। বেরিয়ে এল খালিহাতে। বুঝলাম মাটির তলার কোনো ঘরে জিনিসপত্রগুলো রেখে এসেছে ওরা।

জাহাজে উঠে আবার মালপত্রের বাক্স-পোঁটলা নিয়ে নেমে এল গোলামেরা। ওগুলো রেখে এল পাতাল-ঘরে। এমনি করে কয়েকবার জাহাজ থেকে পাতালের ঘরে মালপত্র পাচার করল ওরা। মালপত্র নামানো শেষ হলে জাহাজ থেকে নেমে এলেন এক থুরথুরে বৃদ্ধ। চুলদাড়ি সব ধবধবে সাদা। গায়ের পোশাক জমকালো, কাঁধে চাপানো মণিমুক্তাখচিত দামি শাল। দেখে অনুমান করলাম কোনো দেশের বাদশাহ কিংবা সুলতান বা এমনি কেউ হবেন।

বৃদ্ধের পর পরই জাহাজ থেকে নামল একটা ফুটফুটে ছেলে, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েস হবে। ছেলেটার গায়েও দামি পোশাক। দল বেঁধে সবাই গিয়ে মাটির তলার ঘরে ঢুকল তারা। খানিক বাদেই আবার ফিরে এল সবাই, কিন্তু ছেলেটা সঙ্গে নেই।

একে একে জাহাজে উঠল সবাই। ছেড়ে দিল জাহাজ। অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেল জাহাজ। গাছ থেকে নেমে গর্তের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাটি দিয়ে আবার গর্তটা ভরাট করে রেখে গেছে ওরা। দুহাতে মাটি সরাতে লাগলাম।

গুপ্ত দরজা খুলে দেখলাম ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে চমৎকার এক প্রাসাদের ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের ওপাশের দরজায় দামি মখমলের পর্দা ঝুলছে। এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম।

বিরাট ঘর। আনকোরা নতুন দামি পারস্য গালিচায় ঢাকা ঘরের মেঝে। চমৎকার মনোরম সব আসবাবপত্র। মাথার উপরের ছাত থেকে ঝুলছে কারুকাজ করা ঝাড়বাতি। বিশাল এক টেবিলে রাখা বিরাট এক ঝুড়ি ফল। মস্ত খাঞ্চায় নানারকমের মিষ্টি। ঘরের মাঝখানে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে সেই ছেলেটা।

সোনার পাখায় বাতাস খাচ্ছিল ছেলেটা, আমাকে দেখেই চমকে উঠল।

তাকে অভয় দিয়ে বললাম, আমাকে ভয় করার কিছু নেই। আমিও তোমার মতো মানুষ, এক বাদশাহ'র ছেলে, নিজেও বাদশাহ ছিলাম।

আমার মিষ্টি কথায় ভয় দূর হয়ে গেল ছেলেটার চেহারা থেকে। কিন্তু কোনো কথা বলল না সে।

আবার বললাম, তুমি কে? ওরাই-বা কারা? আর তোমাকে এই পাতালপুরীতেই বা রেখে গেল কেন?

হাসল ছেলেটা। কী সুন্দর তার হাসি। যেন মুক্তা ঝরে পড়ল। বড় বড় চোখ, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ দেখলেই কেমন যেন মায়া বসে যায়। আমাকে তার পাশে বসার ইশারা করল ছেলেটা।

গিয়ে বসে পড়লাম তার পাশে।

আপনি হয়তো ভাবছেন, আমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে গেছে ওরা? আসলে তা না। বরং আমাকে বাঁচাতেই এখানে রেখে গেছে।

যে বৃদ্ধ লোকটি সঙ্গে এসেছেন, তিনি আমার বাবা। সারা দুনিয়ার সেরা জহুরি। দুনিয়ায় এমন কোনো রাজা-বাদশাহ, আমির-সুলতান নেই, যার কাছে জহরৎ বিক্রি করেননি তিনি। তাঁর মতো ধনী লোকও খুব কমই আছে আজকের দুনিয়ায়। লোকের মুখে মুখে ফেরে তাঁর ধন-দৌলৎ আর খ্যাতির কথা। তাঁর বুড়ো বয়েসের সন্তান আমি।

আমার জন্মের সময় এক গণক বলেছিল, আমি খুব অল্প বয়েসেই মারা যাব। আমার বয়েস যখন পনেরো হবে বাদশাহ কাসিবের ছেলে খুন করবে আমাকে।

গণক আরও বলেছে, জাহাজডুবি হয়ে এক চুম্বক পাহাড়ে গিয়ে উঠবে কাসিবের ছেলে। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা এক পিতলের ঘোড়সওয়ার মূর্তিকে সাগরে ফেলে দিয়ে হাজার হাজার নাবিকের প্রাণ বাঁচাবে। তারপর মারবে আমাকে।

জন্মের পর থেকেই চোখে চোখে রেখেছেন আমাকে বাবা। পনেরো বছর চলছে এখন আমার। কিছুদিন ধরে একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, কাসিবের ছেলে নাকি সেই মূর্তিটাকে সাগরে ফেলে দিয়েছে। গুজবটা শোনার পর থেকেই আমার বাপ-মায়ের চোখে ঘুম নেই। মাত্র কয়েক দিনেই একেবারে ভেঙে পড়েছেন বাবা। শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে। দেখলে চেনাই যায় না। কেঁদে কেঁদে মায়ের চোখ অন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

গণকের কথা শোনার পরপরই খোঁজ লাগিয়েছিলেন বাবা। এই নির্জন দ্বীপটার খোঁজ পেয়ে এখানে মাটির তলায় এই প্রাসাদ বানিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমার পনেরো বছর বয়েস হলেই এখানে এনে লুকিয়ে রাখবেন। কাসিবের ছেলে যেন আর খুঁজে না পায়, সেই ব্যবস্থা করবেন। গণক বলেছিল, পিতলের মূর্তিটা পানিতে ফেলে দেবার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে মারা যাব আমি। দশ-বারদিন আগে নাকি মূর্তিটা পানিতে পড়েছে। তাই চল্লিশ দিনের জন্য এখানে আমাকে লুকিয়ে রেখে গেছেন বাবা।

ছেলেটার কথা শুনে রাগে সারা গা জ্বলে উঠল আমার। কী মিথ্যেবাদী ভণ্ড, প্রতারক এই গণকগুলো। আজেবাজে কথা বলে নিরীহ মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলে ওরা। আসলে ওই ব্যাটাদেরই ধরে ধরে জবাই করা দরকার। ফুলের মতো ফুটফুটে এক কিশোর, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, তাকে কিনা খুন করব আমি। গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পায়নি গণক ব্যাটা! একবার যদি তাকে তখন হাতে পেতাম...

ছেলেটাকে অভয় দিয়ে বললাম, শোনো ভাই, আল্লার নামে কসম করছি, তোমাকে যে মারতে আসবে, তাকে খুন করব আমি। তোমার গায়ে একটা ফুলের টোকা লাগতে দেব না। আগামী চল্লিশ দিন তোমাকে পাহারা দেব আমি! তারপর তোমার বাবা আসবেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব। আমার সিংহাসন আমি তোমাকেই দিয়ে দেব। দেখো।

শুনে খুব খুশি হল ছেলেটা। আমাকে শুকরিয়া জানাল।

আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছে সে, আমিও খুশি হলাম। অনেক কথা অনেক গল্প শোনাতে লাগলাম তাকে। তারপর খেতে বসলাম, দুজনে একসঙ্গে। কত খাবার ঘরে। একশো লোক সারা বছর খেয়েও শেষ করতে পারবে না। পেট ভরে নানারকম সুখাদ্য খাবার খেলাম আমরা।

গল্পগুজব আর হাসিঠাট্টাতে কেটে গেল দিন। সে-রাতে চমৎকার ঘুম হল আমাদের দুজনেরই।

পরদিন সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা সারলাম আমরা। তারপর গল্পগুজব আর খেলাধুলায় মত্ত হয়ে উঠলাম। গোসলের সময় হয়ে এল। নিজের হাতে সাবান মাখিয়ে তার গা ধুয়ে দিলাম আমি। কাপড় পরিয়ে সুগন্ধী আতর মাখিয়ে দিলাম। দুপুরের খাওয়া সেরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হল আমাদের গল্প আর খেলা। রাত হল। মাংস, রুটি, মাখন, দুধ, মধু, নানারকম মিষ্টি আর ফল দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিলাম তাকে।

এমনি করে দিন যায় রাত আসে। নির্জন সেই দ্বীপে চমৎকার কাটছে আমাদের দিন। আদর যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে মরণের ভয়, বাপ-মায়ের চিন্তা একেবারে ভুলিয়ে দিলাম ছেলেটার মন থেকে।

একে একে কোনদিক দিয়ে যে চল্লিশটা দিন কেটে গেল, দুজনের কেউ টের পেলাম না।

চল্লিশ দিনের দিন। সে ফিরে যাবে দেশে। জাহাজ, লোকজন সহ তার বাবা ফিরে আসবে, তাকে নিয়ে যাবে। আমিও দেশে ফিরে যাব। দুজনেই আনন্দে অধীর। সকাল সকাল উঠেই পানি গরম করলাম। গোসল করালাম ছেলেটাকে। দামি পোশাক পরালাম। ভালো করে আতর মাখালাম কাপড়ে।

ছেলেটার মুখে হাসি নেই। কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, মনটা ভালো নেই। তোমার সঙ্গে কী সুখে ছিলাম এখানে! আবার তো দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।

হেসে বললাম, দূর বোকা ভুলে গেলে নাকি? আমি তো কথা দিয়েছি, তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব। আমার সিংহাসনে বসাব। মন খারাপ করার কিচ্ছু নেই...এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো চটপট বল তো, কী খাবে?

ছেলেটা বলল, তরমুজ খাব।

বড়সড় দেখে একটা তরমুজ বেছে নিলাম। তারপর হাত বাড়ালাম দেয়ালে ঝোলান ছুরিটার জন্য। কিন্তু ছুরিটা বেশ উঁচুতে, নাগাল পাচ্ছি না। একটা কুরসি টেনে দেয়ালের কাছে নিয়ে এলাম। ওতে উঠে দাঁড়িয়ে খুলে নিলাম ছুরিটা। নামার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমনি সময় ঘটল ঘটনাটা।

ছেলেমানুষের খেয়াল। মজা দেখার জন্য নিচে দাঁড়িয়ে আমার পায়ের তলায় আচমকা সুড়সুড়ি দিয়ে বসল ছেলেটা। তাল সামলাতে পারলাম না। পড়ে গেলাম।

আর পড়লাম একেবারে তার ওপর। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। আমার হাতের ছুরি আমূল বিঁধে গেল তার বুকে। আমার হাতের ওপরই মারা গেল ছেলেটা।

তখনকার আমার মনের অবস্থা আপনাকে কী বলব, মালকিন! মনে হচ্ছিল ওই ছুরি দিয়ে নিজের হাতেই নিজের মাংস কুচি কুচি করে কাটি। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম শুধু। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম কিশোরের লাশটার দিকে। নিজের মনেই জ্বলেপুড়ে খাক হতে লাগলাম। গণকের কথাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত। ছেলেটার বাবা আসবেন আজ। এসে ছেলের এই অবস্থা দেখে কী যে করবেন! তাঁর অবস্থা কী হবে! সেই দৃশ্য দেখার দুঃসাহস হল না আমার। বেরিয়ে পড়লাম পাতালপুরী ছেড়ে।

বাইরে বেরিয়ে গুপ্তদরজাটা বন্ধ করে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে দিলাম।

খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কী করা যায়? প্রাণের ভয় বড় ভয়। সেই সাংঘাতিক মুহূর্তেও মনে পড়ল কিশোরের লাশটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খুন করবে গোলামেরা।

আবার এসে উঠলাম সেই আগের গাছটায়। লতাপাতার আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম।

দিন গড়িয়ে বিকেল হল। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। এই সময় দিগন্তে দেখতে পেলাম জাহাজটাকে। দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল জাহাজ, নোঙর করল। সেদিন আর দেরি করলেন না, সবার আগে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ জহুরি। সবার আগে নিচে নামলেন তিনি।

গর্তের কাছে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন জহুরি, হায় হায়! মাটি আলগা কেন? তবে কি আমার খোকা বেঁচে নেই!

তাড়াতাড়ি আলগা মাটি সরাল গোলামেরা। দরজা খুলল। দ্রুত নিচে নেমে গেলেন জহুরি। গাছের উপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছি আমি।

একটু পরেই দেখলাম, জহুরিকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে এল গোলামেরা। ছেলের শোকে মরে গেলেন? না! দেখলাম, পানি এনে বৃদ্ধের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে গোলামেরা। একটু পরেই হুঁশ ফিরে পেলেন বৃদ্ধ। কপাল, বুক চাপড়ে বিলাপ করতে লাগলেন, আমার ছেলে। আমার সোনা। হায় হায়, এখানে এনেও বাঁচাতে পারলাম না তাকে...আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

পাতালপুরী থেকে কিশোরের রক্তাক্ত লাশটাকে তুলে নিয়ে এল গোলামেরা। সাঁঝ হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি কবর খুঁড়ল ওরা। কিশোরকে কবর দিল। পাতালপুরীতে রাখা সমস্ত মালপত্র তুলে এনে জাহাজে ওঠাল। বৃদ্ধ জহুরিকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলল। ছেড়ে চলে গেল জাহাজ।

রাতটা গাছের ডালেই কাটিয়ে দিলাম। সেই নির্জন পাতালপুরীতে ঢোকার মতো আর মানসিকতা নেই। আর সেখানে গিয়েই-বা কী করব? খাবার নেই, ব্যবহারের কোনো জিনিস নেই।

ভোর হলে নেমে এলাম গাছ থেকে। ছোট্ট দ্বীপটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। বেঁচে দেশে ফিরে যাওয়ার আশা ত্যাগ করলাম। খিদে পেলে গাছের ফল খেলাম। আঁজলা ভরে খেলাম ঝরনার পানি। শুয়ে পড়লাম একটা গাছের তলায়।

আবার কাটে দিন। কিন্তু খুব ধীরে, নিরানন্দভাবে। এমনিভাবে আর কিছুদিন কাটাতে হলে পাগলই হয়ে যাব। এই সময়ই এক দিন ঘটল এক আজব ঘটনা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, সাগরের এক জায়গায় চড়া পড়েছে। আরে, একি তাজ্জব কাণ্ড। এমন কথা কে কবে কোথায় শুনেছে! বিশাল চওড়া পায়ে চলার পথের মতো এগিয়ে গিয়ে দিগন্তে হারিয়ে গেছে সেই চড়া!

আর চুপ করে থাকার কোনো মানে নেই। আল্লার নাম নিয়ে চড়ায় উঠলাম। হাঁটতে লাগলাম সামনের দিকে।

দিন শেষ হয়ে এল। বালির চড়া ধরে হাঁটছি তো হাঁটছিই। সাঁঝের বেলায় পৌঁছালাম বালির পথের অন্য মাথায়। দেখেশুনে মনে হল, এটা কোনো দ্বীপ নয়। কোনো দেশই হবে। সামনে মাঠ। মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পায়ে চলা মেঠো পথ। থামলাম না। এগিয়ে চললাম সেই পথ ধরে।

আঁধার নামছে। এই সময় সামনে আগুন চোখে পড়ল। আশা হল, কাছেই কোথাও লোকালয় আছে। চাষির বাড়ির আগুন। হয়তো ভেড়ার মাংসের কাবাব বানাচ্ছে। চনমন করে উঠল খিদে। আরও তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

না, ভুল করেছিলাম। কাছে আসতেই ভুল ভাঙল। কোনো চাষির বাড়ি নয়। বিরাট এক প্রাসাদ। গোটা বাড়িটাই পিতলের তৈরি। সিংহদরজার কাছে আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে হাত-পা গরম করছে এগারোজন মানুষ। তাদের সবাই সুপুরুষ, সুঠামদেহী যুবক, একজন ছাড়া। ওই একজন বুড়ো। তবে দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, যৌবনে সঙ্গীদের মতোই সুঠামদেহী ছিল সে-ও। একটা আজব ব্যাপার লক্ষ করলাম, সবারই বাঁ চোখটা কানা, ঠুলি পরে আছে।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এগিয়ে এল বুড়ো। তার সঙ্গীরাও এল। অবাক হয়ে দেখল আমাকে। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, জানতে চাইল। আমার কাহিনী শোনালাম ওদেরকে। থ হয়ে শুনল সবাই। আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করল তারাও। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকল। বিরাট প্রাসাদ। মহলের পর মহল পেরিয়ে চললাম। শেষ আর হয় না। চমৎকার সাজানো-গোছানো ঝকঝকে তকতকে প্রতিটি ঘর। শেষে বিশাল এক ঘরে নিয়ে এল আমাকে ওরা। দেখেই বুঝলাম, দরবার ঘর।

দশটা বিরাট বিরাট পারস্য গালিচায় মোড়া দরবার ঘর। দুই ধারে চমৎকার সাজানো বড় বড় দামি কাঁউচ। গালিচায় বসে পড়ল বুড়ো। যুবকেরা গিয়ে বসল কাউচে।

বিনীত ভঙ্গিতে আমাকে বলল বুড়ো, আসুন, মালিক, মেহেরবানী করে বসে পড়ুন। সবচেয়ে উঁচু আসনটা আমাকে দেখিয়ে দিল সে।

গিয়ে বসলাম।

আবার বলল বুড়ো, খাবার দিলে খাবেন। তারপর চুপচাপ বসে থাকবেন। যা ঘটবে, মুখ বন্ধ করে দেখে যাবেন। টুঁ শব্দ করবেন না। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

চোখ বন্ধ করল বুড়ো। একইভাবে ঝিম ধরে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর উঠল। পায়চারি করতে লাগল। শেষে গিয়ে মদ আর মাংস নিয়ে এল। আমরা এগারোজন একসঙ্গে বসে খাবার খেলাম, বুড়ো খেল না। চুপচাপ দেখে গেল। খাওয়া শেষ হলে আমাদের এঁটো বাসন নিজের হাতে সাফ করল। তারপর কোনো কথা না বলে আবার গিয়ে নিজের জায়গায় বসল।

কর্কশ গলায় ধমকে উঠল একজন যুবক, কী হল, বসে পড়লে যে? আমাদের জিনিসপত্র আনবে না? প্রার্থনা করবে না?

এবারেও কোনো কথা না বলে উঠে পড়ল বুড়ো। পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। হাতে একটা পাত্র, দামি সাটিন কাপড়ে ঢাকা। পাত্রটা একজন যুবকের হাতে তুলে দিল সে। তারপর আবার চলে গেল পাশের ঘরে। আবার ফিরে এল একই রকমের কাপড়ে ঢাকা আরেকটা পাত্র নিয়ে। আরেকজন যুবকের হাতে পাত্রটা তুলে দিয়ে আবার চলে গেল। এভাবে দশ-বারে দশটা পাত্র এনে দশ যুবকদের হাতে তুলে দিল বুড়ো। তারপর গিয়ে বসে পড়ল আবার আগের জায়গায়।

পাত্রের ঢাকনা খুলল যুবকেরা। উঁকি দিয়ে পাত্রের ভিতরে কী আছে দেখলাম। অবাকই হলাম। এত সুন্দর পাত্রগুলোতে রয়েছে চুলোর ছাই, চেরাগের কালি আর কাজলদানির কাজল। পাত্রগুলো খুলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যুবকেরা। বিড়বিড় করে বলল একজন, যেমন পাপ করেছিলাম তেমনি খেসারত দিচ্ছি।

ছাই তুলে নিজেদের মাথায় ছিটিয়ে দিল ওরা, মুখে মাখল চেরাগের কালি। ডান চোখে কাজল পরল। তারপর বসে রইল চুপচাপ। বোকার মতো বসে বসে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখলাম।

সকাল হতেই উঠে পড়ল সবাই। হাতমুখ ধুয়ে এল ভালো করে। পরিপাটি করে পোশাক পরল। একেবারে ফিটফাট।

এই কাণ্ডকারখানা দেখে আমার তো মুণ্ডু ঘুরে যাবার জোগাড়! পাগল নাকি লোকগুলো! ব্যাপার কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু আগেই মানা করে দিয়েছে বুড়ো, যা দেখব, চুপচাপ দেখে যাব, কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। অনেক কষ্টে কৌতূহল দমন করে চুপচাপ রইলাম।

দিনটা হাসিতামাশা খাওয়াদাওয়ার ভিতর দিয়ে ভালোই কাটল। রাতের খাবার পর আবার সেই একই কাণ্ড করল লোকগুলো। তারপর তিন রাত কাটল একইভাবে।

আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। ওই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কারণ কী, জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

একজন যুবক বলল, একথা জানতে চেয়ো না, সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমারও!

কিন্তু আমি তখন বেপরোয়া। গোঁয়ারের মতো বললাম, হোক সর্বনাশ! তবু আমাকে শুনতেই হবে।

যুবক আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলল, দেখো, তোমার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।

বলে উঠলাম, হোক নষ্ট! কৌতূহলের চোটে ঘুমই যদি না-এল, চোখ দিয়ে কী করব? বল, সব বল আমাকে। যা ঘটে ঘটুকগে!

হাল ছেড়ে দিল যুবক। বলল, বেশ। নিজের দোষেই চোখ হারিয়েছি আমরা। তুমিও হারাবে। পরে কিন্তু আমাদের দোষ দিতে পারবে না। আরও একটা কথা বলে রাখি, চোখ হারিয়ে এখানে ফিরে আসতে হবে আবার। কিন্তু তখন তোমাকে আর জায়গা দিতে পারব না। এখানে মাত্র দশজনেরই জায়গা আছে। বুড়োর দিকে ফিরে কী ইঙ্গিত করল সে।

বেরিয়ে চলে গেল বুড়ো। একটা জ্যান্ত ভেড়া নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা ছুরি। ভেড়াটাকে জবাই করল বুড়ো। ছাল চামড়া ছাড়াল। তারপর আবার বেরিয়ে চলে গেল।

সেই যুবক আবার বলল, এই ভেড়ার চামড়ার ভিতরে তোমাকে ভরে সেলাই করে দেব আমরা। তারপর এই প্রাসাদের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে রেখে আসব। রুখ পাখির নাম শুনেছ? বিশাল পাখি। একটা আস্ত হাতি ঠোঁটে চেপে নিয়ে উড়ে যেতে পারে। সেই রুখ পাখি এসে ছাত থেকে ভেড়া মনে করে তুলে নিয়ে যাবে তোমাকে। উড়তে উড়তে অনেক পথ পেরিয়ে চলে যাবে এক পাহাড়ে, পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বসবে। তোমার সঙ্গে আগেই একটা ছুরি দিয়ে দেব। সেই ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে চামড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে তুমি। ভয় নেই, ওই পাখিটা মানুষ খায় না। তোমাকে দেখে বরং ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তারপর দক্ষিণে নাক বরাবর চলতে থাকবে তুমি। নামতে থাকবে পাহাড় থেকে। এক সময় এক বিশাল প্রাসাদ দেখতে পাবে, আমাদের এই প্রাসাদের দশটার সমান বড়। পুরো প্রাসাদটাই সোনার পাতে মোড়া। দেয়ালে দেয়ালে হীরা চুনি পান্না বসানো। দেখে তাক লেগে যাবে তোমার। এমন প্রাসাদের গল্প শুধু রূপকথাতেই শুনেছ। এরপর যা যা ঘটবে আমাদের বলা বারণ। নিজের চোখেই দেখতে পাবে সব। আমাদের মতো বাঁ চোখটা হারাবে ওখানেই। চোখ হারিয়ে ফিরে এসে প্রার্থনা করার সুযোগ পাচ্ছি আমরা, খোদার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করছি। তুমি সে সুযোগ পাবে না। কারণ আগেই বলেছি, এখানে দশজনের বেশি জায়গা নেই। এখনও বল, সেই প্রাসাদে যেতে চাও তুমি?

ঘাড়ে ভূত চেপেছে তখন। কোনোরকম বিচার-বিবেচনা না করেই জবাব দিলাম, নিশ্চয়ই যাব। সব নিজের চোখে দেখতে চাই।

আর কোনো কথা না বলে আমাকে ভেড়ার চামড়া পরাল যুবকেরা। ছুরিটা দিল আমার হাতে। তারপর বাইরে থেকে জোড়াগুলো সেলাই করে দিল। বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখার জন্য আমার চোখের সামনে চামড়ায় ছোট্ট দুটো ফুটো করে দিল।

ধরাধরি করে আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের ছাতে রেখে এল ওরা। খানিক পরেই দেখতে পেলাম, দিগন্তের কাছে মেঘ করেছে। ক্রমেই বড় হচ্ছে সেই মেঘ। আরেকটু পরেই বুঝতে পারলাম, মেঘ না, বিশাল একটা পাখি উড়ে আসছে। দেখতে ঈগলের মতো, কিন্তু আকারে অনেক, অনেক বড়। ঝড়ের মতো ছুটে এসে আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আবার উঁচুতে উঠে পড়ল পাখিটা। ভয়ে কাঁপছি। অনুমান করলাম, দশটা হাতির সমান ওজন হবে পাখিটার। কুড়িটা উট একটার পিঠে আরেকটা দাঁড়ালে যতখানি উঁচু হবে, উচ্চতায় ততখানি হবে ওই রুখ পাখি।

বিশাল এক পাহাড়ের চূড়ায় এসে নামল রুখ। তাড়াতাড়ি সেলাই কেটে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দেখে ভয়ঙ্কর গলায় কানফাটা চিৎকার করে উঠল পাখিটা। এক লাফে আকাশে উঠে পড়ল। উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল দিগন্তে। চারদিকে তাকানোর সুযোগ পেলাম।

সাংঘাতিক উঁচু পাহাড়। মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেছে। বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না। দক্ষিণে নাক বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম।

হাঁটছি তো হাঁটছিই, পথ আর ফুরায় না। নিচের দিকে নামছি, ভারি কষ্ট। পা ব্যথা হয়ে গেল। কিন্তু থামলাম না। প্রচণ্ড কৌতূহল টেনে নিয়ে চলল আমাকে। যে করেই হোক, প্রাসাদে পৌঁছতেই হবে।

চলতে চলতে দুপুর নাগাদ প্রাসাদের দেখা পেলাম। প্রাসাদটা কেমন হবে, তার মোটামুটি একটা ধারণা আমাকে আগেই দিয়েছে যুবক। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখলাম, সেটা বর্ণনা করে বোঝানো অসম্ভব। আসল সৌন্দর্য কথায় বলে প্রকাশ করতে পারব না। এমন প্রাসাদ জীবনে দেখা তো দূরের কথা, দেখব কল্পনাও করিনি কখনও

সোনার তৈরি বিশাল সিংহদরজা পেরিয়ে আঙ্গিনায় ঢুকলাম। সামনেই একটা বন্ধ দরজা। চন্দন কাঠের তৈরি বিশাল দরজায় ঠেলা দিলাম। খোলাই রয়েছে, খুলে গেল। সামনে আরেকটা একই রকমের দরজা। এমনি নিরানব্বইটা দরজা পেরিয়ে মাঠের সমান বড় এক ঘরে এসে ঢুকলাম। যেদিকে তাকাই ঝলমলে হলুদ সোনা, তার ওপর বসানো হীরা চুনি পান্নার চোখ জুড়ানো রঙ। এ কোথায় এসে পড়লাম! বেহেশত কি এটাই!

স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, এই সময় ঘরের চারদিকের চল্লিশটা দরজা খুলে গেল। তাজ্জব হয়ে দেখলাম, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশজন যুবতী। ধরেই

নিলাম, বেহেশতেই রয়েছি আমি, আর ওরা হল বেহেশতের হুরি। তাদের রূপের বর্ণনা দেবার মতো ভাষা আমার জানা নেই, মালকিন। তবে এটুকু বলতে পারি, এমন রূপসী সারা দুনিয়ায় আর কোথাও মিলবে না। আশ্চর্য নিখুঁত গঠন। হাতে গড়া পুতুল যেন। আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার। দেখতে সবারই চেহারা এক!

গলায় মধু ঢেলে একসঙ্গে আমাকে স্বাগত জানাল ওরা। এগিয়ে এল সবাই। ঘিরে ধরে বলল, তুমি আমাদের মেহমান। এস, এস। আমাদের কাছে তোমার মনের দুয়ার খুলে দাও। ভালোবাস আমাদের। এস।

হাত ধরে নিয়ে গিয়ে উঁচু সিংহাসনে বসাল আমাকে। ওরা বসল নিচে, আমার পায়ের কাছে, দামি গালিচায়। বলল, মালিক, আমরা তোমার দাসী। যা হুকুম করবে, পালন করে ধন্য হব।

কিছুই বলতে পারলাম না। বলার আছেই-বা কী? আমি তো তখন হতভম্ব!

উঠে গেল ওরা। ফিরে এল একটু পরেই। একেকজনের হাতে একেক রকম জিনিস। কেউ নিয়ে এল তোয়ালে, কেউ গরম পানি। কারো হাতে আতর, কারো হাতে দামি সিল্কের পোশাক।

আমাকে গোসল করাল ওরা। পা ধুয়ে দিল। গা মোছাল। কাপড় পরাল। আতর মাখাল। সোনার কোমরবন্ধনী কোমরে এঁটে দিল একজন। কেউ নিয়ে এল গোলাবের খুশবু দেয়া ঠাণ্ডা শরবত।

গোসল শেষে খাবার পালা। সবাই খাবার এগিয়ে দিচ্ছে, এটা ওটা নানারকম খাবার। কটা খাব? তবু দুই হাতে তুলে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

আমি খাচ্ছি। চোখ ঠারাঠারি করছে, আর কথার তুবড়ি ছুটিয়েছে মেয়েগুলো।

আমার খাওয়া শেষ হলে আব্দার ধরলো মেয়েগুলো, তোমার জীবনের কাহিনী শোনাও, মালিক।

আমি বললাম, আগে, তোমরা কে শুনি, তারপর বলব।

সবার হয়ে বলল এক মেয়ে, আমাদের কথা আর কী শুনবে? আমরা এখানে নির্বাসিতার মতো। কালেভদ্রে কখনও এক-আধজন মানুষের দেখা পাই, তখন তাকে নিয়ে মেতে উঠি। আজ তোমার দেখা পেয়েছি, তোমাকে নিয়েই আনন্দ করব। উহ্, কতদিন পর আজ মানুষের দেখা পেলাম!

এরপর আমার জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা শোনালাম ওদেরকে। কথাবার্তায় সময় কেটে গেল। সাঁঝ হয়ে এল।

সূর্য ডুবতেই মোটা মোটা অসংখ্য মোমবাতি নিয়ে এল মেয়েরা। জ্বালাল। দিনের মতো আলো হয়ে গেল ঘরের ভিতর। দেয়ালে বসানো হীরা চুনি পান্নার ওপর আলোর ছটা পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

নতুন চাদর পাতা হল ফরাসে। আবার এল খাবার। এবার এল সবার জন্য। মুরগির মাংস, ভেড়ার মাংসের কাবাব, রুটি, ফল, মিষ্টি, দামি মদ। একসঙ্গে বসে

পেট ভরে খেলাম সবাই। এঁটো বাসনকোসন পরিষ্কার করে ফেলা হল। বাজনার যন্ত্রপাতি নিয়ে এল কয়েকটা মেয়ে। শুরু হল নাচগান। ভূরিভোজনের পর দামি মদ, তার ওপর রূপসীদের নাচগান, খুব উপভোগ করলাম।

গভীর হল রাত। ভোররাতে গানবাজনা থামল। পরদিন সারাটা দিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় জাগলাম। আগের দিনের মতোই আমাকে ঘিরে উৎসবের আয়োজন করল মেয়েগুলো। এভাবে একে একে কেটে গেলে চল্লিশটি দিন চল্লিশটি রাত। কোনদিক দিয়ে যে কাটল, টেরই পেলাম না।

একচল্লিশ দিনের দিন সকালে একসঙ্গে ভিড় করে আমার কাছে এল চল্লিশটি মেয়ে। সবারই চেহারা মলিন। কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল? মন ভালো নেই?

সবার হয়ে বলল একটি মেয়ে, কী করে ভালো থাকে বল? চল্লিশটা দিন আমাদেরকে হাসি দিয়ে আনন্দ দিয়ে সব ভুলিয়ে রেখেছিলে। আজ থেকে তো আমাদের দুঃখের দিন শুরু।

আরও অবাক হয়ে গেলাম। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন কেন?

একটা মেয়ে বলল, বছরে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্যই একজন পুরুষ মানুষকে কাছে পাই আমরা। আজ তো তোমার যাবার দিন।

আঁতকে উঠলাম। এমন বেহেশত ছেড়ে চলে যাব! বললাম, চলে যাব? আমি তো তা বলিনি!

মেয়েটা বলল, না বললেই কী? আমরা চল্লিশ বোন, একই বাপের মেয়ে। তবে সবারই মা আলাদা। বাবা বাদশাহ। বিয়ের আগেই পরপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাদের, এই ভয়ে, এখানে এই দুর্গম এলাকায় প্রাসাদ বানিয়ে আমাদের নির্বাসিত করে রেখেছেন তিনি। বছরের প্রথম দিনে বাপ-মাকে দেখতে পাই আমরা, চল্লিশ দিন পর আবার ফিরে আসি। তারপর সারা বছরটাই এখানে থাকতে হয়। আল্লাহর অনুগ্রহ, বছরে চল্লিশ দিনের জন্য একজন মানুষকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি, তাই বাঁচতে পারছি। তবে এ পর্যন্ত যত পুরুষই এসেছে, এদের কেউ তোমার মতো না। তোমার প্রেমে পড়ে গেছি আমরা। কিন্তু উপায় নেই। আজ বছরের প্রথম দিন। আমাদের যেতেই হবে।

কোনোরকম ভাবনাচিন্তা ছাড়াই ফস করে বলে বসলাম, তা বেশ তো, যেতে হলে যাও, আমি থাকি। চল্লিশ দিন একা একাই কাটিয়ে দিতে পারব। তারপর তো ফিরে আসবে? ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব।

খুশিতে লাফিয়ে উঠল মেয়েগুলো। সত্যি! সত্যি তুমি থাকবে?

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, হ্যাঁ, থাকব।

কতকগুলো চাবি বের করে আমার হাতে দিল ওরা। বলল, তাহলে এই নাও চাবি। আজ থেকে এই প্রাসাদের মালিক তুমি। ঘরের যে কোনো দরজা খুলে যেখানে

খুশি যেতে পার। কিন্তু খবরদার! বাগানের ওপাশে যে তামার দরজা আছে, ওটা খুলবে না কিছুতেই। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। জীবনে আর কোনোদিন আমাদের দেখা পাবে না।

একে একে চোখের পানি নাকের পানি এক করে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল মেয়েগুলো। বিদায়ের মুহূর্তে তাদের করুণ চাহনির কথা আজও ভুলতে পারি না আমি, মালকিন।

মেয়েরা চলে গেল। হঠাৎই বড় খালি মনে হল বাড়িটা। এত বড় নিঝুমপুরীতে কতখানি একা লাগবে, তখন ভাবিনি। যাই হোক, কথা যখন দিয়ে ফেলেছি, থাকতেই হবে। তবে বসে বসে তো সময় কাটাতে পারব না। বাড়িটা ঘুরে দেখতে চললাম।

সামনে প্রথম যে দরজাটা পড়ল, চাবি দিয়ে তার তালা খুলে ফেললাম। দরজার ওপাশে এক সুন্দর ফলের বাগান। এক বাগানে এত বিভিন্ন রকমের ফল গাছের সমাহার এর আগে কখনও দেখিনি। আপেল, আঙুর, কলা, কমলা, পেয়ারা এবং আরও হরেক রকম মিষ্টি ফল পেট ভরে খেলাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম দ্বিতীয় দরজাটার সামনে।

দরজার ওপাশে ফুলের বাগান। ফুলের মিষ্টি গন্ধে মৌ মৌ করছে বাতাস। ভোমরার গুঞ্জন মধু ঝরাল কানে। লাল-নীল-গোলাপি-সাদা-হলুদ-সবুজ রঙে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার জোগাড় হল। এর আগে কোন রাজা-বাদশাহ'র বাগানেই এত বিচিত্র ফুল দেখিনি। যুঁই, বেলি, মালতী, গন্ধরাজ, গোলাপ, হাসনাহেনা, টগর, মল্লিকা, সূর্যমুখী, শেফালি কী ফুল নেই বাগানে। অনেক ফুল রয়েছে যেগুলোর নামই জানি না, এর আগে দেখিওনি কখনও।

তৃতীয় দরজা খুলে ঢুকলাম পাখির রাজ্যে। থমকে যেতে হল। কলকাকলিতে মুখরিত চারদিক। বিচিত্র রঙের হাজারো পাখির মেলা। দুনিয়ার সমস্ত জাতের পাখি ধরে এনে রাখা হয়েছে ওখানে।

চার নম্বর দরজা খুলে বিশাল এক প্রাঙ্গণে এসে ঢুকলাম। তার চারদিক ঘিরে দেয়াল, চল্লিশটা বড় বড় দরজা। সবই চন্দন কাঠের তৈরি। সবকটা দরজা খোলা। একটা দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। ধাঁধিয়ে গেল চোখ। বিশাল এক ঘরের মেঝেতে স্তূপ করে রাখা হয়েছে শুধু মুক্তা। কোনো কোনোটা পায়রার ডিমের সমান বড়। ঠাণ্ডা নীল আগুন ছড়াচ্ছে যেন মুক্তার স্তূপ।

আরেকটা ঘরের মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত ভরে রাখা হয়েছে হীরা দিয়ে। তেমনি আরেকটা ঘরে শুধু চুনি; একটা ঘরে পান্না। দুনিয়ায় যত রকমের দামি পাথর আছে, আলাদা আলাদা ঘরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। একটা ঘরে শুধু সোনার বাঁট। আরেকটা ঘরে রুপা। সারা পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন যেন জড় করা হয়েছে এক জায়গায়। চল্লিশ বোনের বাপ কতটা ধনী, ভেবে তাজ্জব হতে হয়।

ভেবেছিলাম, একা একা কাটাতে পারব না, কিন্তু বেশ পারলাম। টেরই পেলাম না কোনদিক দিয়ে উনচল্লিশটা দিন কেটে গেল। উনচল্লিশটা চাবি দিয়ে উনচল্লিশটা তালা খুলেছি। চোখ ভরে দেখেছি সব, দেখতে দেখতেই দিন কেটে গেছে। আর মাত্র একটা চাবি রয়েছে। এই চাবিটা সেই তামার দরজার। এতদিন খুলব কি খুলব না করে করে কাটিয়েছি। কিন্তু সেদিন আর থাকতে পারলাম না। কৌতূহলেরই জয় হল। কী আছে ভিতরে, না দেখে থাকতে পারব না, বুঝতে পারলাম। চল্লিশজন রূপবতীর সঙ্গসুখ হারাতে হবে। তা হোক। হারালে হারাব। কিন্তু ভিতরে কী আছে, না দেখে ছাড়ব না।

কী বলব মালকিন, কৌতূহল যে কী ভীষণ ক্ষতি করে মানুষের আমিই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। দুরুদুরু করছে বুক। তবু চবিটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম দরজাটার কাছে। মাথায় শয়তান ঢুকেছে, নিস্তার তো নেই। চাবি দিয়ে তালা খুলে ফেললাম। আস্তে করে ঠেলা দিলাম পাল্লায়। কিছু ঘটল না। জোরে ঠেলে খুলে ফেললাম। ভেবেছিলাম সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। শুধু নেশা ধরানো উগ্র একটা গন্ধ এসে লাগল নাকে।

ক্রমেই তীব্র হচ্ছে গন্ধটা। কয়েকবার শ্বাস নিতেই কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল গা, বোঁ করে উঠল মাথার ভিতর। তারপর আর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ পরে হুঁশ হল, তা-ও বলতে পারব না। হুঁশ ফিরলে উঠে বসলাম। তীব্র গন্ধটা চলে গেছে। মাথাঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লাম। ঘরের ওপাশে আরেকটা দরজা চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। তখনও যদি ফিরে আসতাম, মালকিন, বেঁচে যেতাম। কিন্তু বললামই তো, কৌতূহলের শয়তান ভর করেছে ঘাড়ে।

দরজা খুলে আরেকটা বিরাট ঘরে ঢুকলাম। জাফরানি রঙের দেয়াল। রঙিন মোমবাতির আলো ঘরের ভিতরে এক অপূর্ব বর্ণালীর সৃষ্টি করেছে। আতরের মিষ্টি গন্ধে ভরি হয়ে আছে ঘরের বাতাস। চারকোণে চারটে সোনার বাতিদানে চারটে চেরাগ জ্বলছে কিসের তেল বলতে পারব না, তবে পোড়া তেল থেকেও এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো ঘোড়া। তাগড়া, বলিষ্ঠ। এমন তাজা ঘোড়া জীবনে দেখিনি আমি। কপালে একটা সাদা তারা আঁকা। পিছনের বাঁ পা আর সামনের ডান পায়ে সাদা ঝাঁকড়া রোম, মোজার মতো দেখতে লাগছিল। ওস্তাদ স্বর্ণকারের তৈরি নিখুঁত সূক্ষ্ম কারুকাজ করা জিন পরানো রয়েছে পিঠে। সোনার গামলায় যবের আটা বার্লি গোলা রয়েছে, ঘোড়ার খাবার। এক পাশে আরেকটা রুপার গামলায় পানি।

ঘোড়াটা দেখে ভারি লোভ হল। ছেলেবেলা থেকেই ভালো ঘোড়ার প্রতি আমার লোভ। ঘোড়ায় চড়তেও পারি চমৎকার। নিজের প্রশংসা করছি : লোকে বলত, ঘোড়ায় চড়তে আমার মতো ওস্তাদ নাকি তারা কখনও দেখেনি।

এক লাফে উঠে বসলাম ঘোড়ার পিঠে। নিয়ে চলে এলাম বাইরে, বাগানে। তারপর থেমে গেল ঘোড়া। নড়তে চায় না। আমি যতই চেষ্টা করি, এক জায়গায় গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানোয়ারটা। বেয়াড়া, বেতমিজ জানোয়ার! ভীষণ রাগ হল। শপাং করে কষে লাগালাম চাবুকের এক ঘা। ব্যস, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে তীক্ষ্ণ কর্কশ আর্তনাদ করেই লাফ মারল ঘোড়া। এক লাফে একেবারে আকাশে। আমার চোখের সামনেই দুপাশে দুটো পাখা গজিয়েছে ঘোড়াটার। অদ্ভুত কাণ্ড! ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা শুনেছিলাম। নিজের চোখে দেখতে পেলাম সেদিন। শুধু দেখাই নয়, একেবারে জলজ্যান্ত একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বসলাম।

মেঘের ভিতর দিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়ে চলেছে পক্ষীরাজ। শক্ত করে ধরে রইলাম লাগাম। নিচে তাকিয়ে আছি অবাক হয়ে। ঘরবাড়িগুলো অতি খুদে দেখাচ্ছে। মানুষগুলো যেন পিঁপড়ে। এমন আজব দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য দুনিয়াতে খুব কম লোকেরই হয়েছে।

উড়ছে তো উড়ছেই, থামার আর নাম নেই ঘোড়ার। এক সময়ে মেঘের দেশ থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়া। আস্তে আস্তে নিচে নামছে। নিচে তাকাতেই একটা প্রাসাদ চোখে পড়ল। আরও একটু নামতেই চিনতে পারলাম প্রাসাদটা। সেই তামার প্রাসাদ।

প্রাসাদের ছাতে নামল ঘোড়া। প্রচণ্ড গা-ঝাড়া দিয়ে আমাকে ফেলে দিল গা থেকে। আমি উঠে দাঁড়াতেই এগিয়ে এসে বাঁ পাখা দিয়ে বাঁ চোখে ঝাপটা মারল। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠে আবার পড়ে গেলাম। উড়াল দিল ঘোড়টা। উঠে গেল মেঘের রাজ্যে।

বাঁ চোখটা চেপে ধরে আছি। তীব্র ব্যথায় হুঁশ হারানোর জোগাড় হল। কোনোমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। আমারই অপেক্ষা করছিল যেন সেই দশজন কানা যুবক।

আমাকে দেখেই বলে উঠল একজন যুবক, কী মানা করেছিলাম না? তখন তো শুনলে না। এখন হারালে তো চোখ! আগেই বলেছি, দশজনের বেশি জায়গা হবে না। আমরা এখানে কালি মেখে প্রায়শ্চিত্ত করছি, তাহলে আবার চোখ ফিরে পাব। কিন্তু তোমার সে উপায়ও রইল না। এখন নিজের পথ দেখতে পার। তবে তোমাকে একটা পথের নিশানা বাতলে দিতে পারি। এই নিশানা মতো চললে বাগদাদের খলিফা হারুন অর-রশিদের দেশে পৌঁছতে পারবে। শুনেছি তিনি অতি মহান, দয়ালু, দাতা। ওখানে গেলে তোমার আশ্রয় মিলতে পারে। হয়তো তিনি তোমাকে সাহায্যও করতে পারেন।

কী আর করব, মালকিন। নিজের দোষে চোখ হারিয়েছি। যুবকের কাছে জেনেছি, পিঠে সওয়ার হওয়ার মজুরি হিসেবে একটা করে চোখ গেলে দিয়ে যায় পক্ষীরাজ। কৌতূহল জোর করে দমন করে নিলেই পারতাম, আজ আর আমার

এমন দশা হত না। দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেললাম। চোখে ঠুলি পরে ছেঁড়া কম্বল, ছেঁড়া পোশাক নিয়ে ফকিরের বেশে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক অনেকদিন পর আজ সন্ধ্যায় বাগদাদে এসে পৌঁছেছি। পথের মোড়ে দুই ফকিরের সঙ্গে দেখা। ওরাও রাতের আশ্রয় খুঁজছে। ভিড়ে গেলাম ওদের দলে। এসে পৌঁছুলাম আপনার ঘরে।

আমার কাহিনী তো শুনলেন, মালকিন। এখন আমাকে কী করবেন, আপনার ইচ্ছা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তৃতীয় ফকিরের কাহিনী শুনল ঘরের সবাই। বড় বোন বলল, চমৎকার তোমার কাহিনী, ফকির। আমি খুশি হয়েছি। তুমি মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পার।

হাতজোড় করে বলল ফকির, কিন্তু আর কয়েকজনের কাহিনী শোনা তো বাকি আছে। তাদের কাহিনী শুনতেই চাই। থাকার অনুমতি দিন।

বড় বোন বলল, ঠিক আছে, থাক।

খলিফা, উজির, আর মসরুরের দিকে তাকিয়ে বলল ছোট বোন, এবার আপনাদের জীবনের কাহিনী শোনান।

তিনজনের হয়ে বলল উজির, বলার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি আমাদের জীবনে। আমরা কে, কী, তা তো মা তোমাকে আগেই বলেছি। আর কিছু বলার নেই আমাদের।

কী যেন ভাবল বড় বোন। বোধহয় উজিরের কথা ও ব্যবহারে খুশি হল। বলল, ঠিক আছে, আপনাদেরও রেহাই দিলাম। আপনারাও মুক্ত। যান।

রাত ভোর হয়ে এসেছে। প্রাসাদে ঘুমাতে গেলেন খলিফা। কিন্তু ঘুম আর আসে না। কেবলই মনে হয় সেই তিন মেয়ে আর দুটো কুকুরের কথা। ভোর হতে না হতেই দরবারে চললেন তিনি। প্রথমেই উজিরকে ডেকে হুকুম দিলেন, তিন মেয়ে, তিন ফকির আর কুকুর দুটোকে এখনি নিয়ে এস।

খলিফার হুকুম তামিল করা হল। শিগগিরই দরবারে এনে হাজির করা হল তিন বোনকে। বোরখা পরে এল ওরা। কুকুর দুটোও রয়েছে সঙ্গে। এল কালান্দর ফকিরেরাও।

লোকজনে গমগম করছে দরবার। খলিফার ইঙ্গিতে উজির বলল, গতরাতে তোমাদের ওখানে কালান্দররা ছাড়াও আরও তিনজন বন্দি হয়েছিল, তারা কে জান?

নেকাব মুখে ঢেকেই বলল বড় বোন, সওদাগর বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল তারা।

উজির বলল, আসলে তারা সওদাগর নয়। একজন স্বয়ং আমাদের খলিফা, একজন জাঁহাপনার দেহরক্ষী মাসরুর, এবং অন্যজন আমি।

শঙ্কিত গলায় বড় বোন বলল, আমাদের কি কোনো অপরাধ হয়েছে?

উজির অভয় দিয়ে বলল, না না, তা হবে কেন? আমরাই বরং ওয়াদার বরখেলাপ করেছি। তবু আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছিলে তোমরা। তোমাদের কেন

ডেকে আনা হয়েছে, নিশ্চয়ই জানো না। তোমাদের তিনজন আর ওই কুকুর দুটোর কাহিনীও শুনতে চাই আমরা। পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর-রশিদের দরবারে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলবে না। যা বলবে, সত্যি বলবে।

এগিয়ে এসে খলিফার সামনে দাঁড়াল বড় বোন। কুর্নিশ করল। মুখের নেকাব সরাল। বলল, আপনি অতি মেহেরবান, জাঁহাপনা। আপনার দয়ার তুলনা নেই। তা ছাড়া আপনি আল্লার পয়গম্বর। আপনার কাছে মিথ্যে বলব না। অদ্ভুত এক কাহিনী শোনাচ্ছি। বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এক বিন্দু মিথ্যে নেই এতে।

বলতে থাকে বড় বোন :

বড় বোন জোবেদার কাহিনী

আমার নাম জোবেদা। এ হল আমার মেজো বোন, নাম আমিনা, আর ছোট'র নাম ফাহিমা। এরা দুজনেই আমার সৎ বোন। তিন বিয়ে করেছিলেন আমার বাবা। তাঁর প্রথম বিবি আমার আপন মা। একই মায়ের ঘরে আমার বড় আরও দুবোন আছে। দুজনেই আমার বড়। আপন আর সৎ মিলিয়ে আমরা মোট পাঁচ বোন।

মারা যাবার সময় আমাদের জন্য পাঁচ হাজার দিনার রেখে গিয়েছিলেন বাবা। তিনি মারা যাবার পর হাজার দিনার করে ভাগে পড়ল আমাদের। আমিনা আর ফাহিমা যার যার ভাগ বুঝে নিয়ে তাদের মায়েদের কাছে চলে গেল। আমরা সহোদরা তিন বোন রয়ে গেলাম একত্রে।

অল্প কিছুদিন পরেই আমার বড় দুই বোন বিয়ে করল। তাদের যা পয়সাকড়ি ছিল, স্বামীদের দিয়ে দিল। ওই পয়সা দিয়ে সওদাগরি করবে স্বামীরা।

সব কিছু ঠিকঠাক করে, এক শুভদিন দেখে জাহাজে চড়ে সওদাগরি করতে বেরিয়ে পড়ল আমার দুই দুলাভাই। বোনেরাও গেল তাদের সঙ্গে। বাড়িতে একা পড়ে রইলাম আমি।

একে একে কেটে গেল চার বছর। হঠাৎ একদিন ফিরে এল আমার বোনেরা। দেখে তো আঁতকে উঠলাম। কী চেহারা হয়েছে! শরীর হাড় জিরজিরে। মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো।

চোখ গর্তে বসে গেছে। পরনে ছেঁড়া নোংরা ভিখিরির বেশ। কোথায় গেছে রূপের জৌলুষ! পরিচয় দেবার আগে বুঝতেই পারিনি, ওরা আমারই এককালের অপরূপ সুন্দরী দুই বোন।

জিজ্ঞেস করে করে সব জানতে পারলাম। রাতারাতি বড়লোক হবার জন্য সওদাগরি করতে বেরিয়েছিল দুই দুলাভাই। আমার বোনেদেরও সায় ছিল এ ব্যাপারে। একদিন ডাকাতেরা আক্রমণ করল তাদেরকে। টাকা-পয়সা ধনদৌলত সব লুটে নিয়ে সর্বস্বান্ত করে রেখে গেল। নিজেরাই খেতে পায় না, বৌকে কী খাওয়াবে? একদিন অচেনা এক শহরে অচেনা লোকেদের কাছে আমার দুই বোনকে বিক্রি করে পালিয়ে গেল দুলাভাইয়েরা।

এরপর অনেক কষ্ট করল বোনেরা। তবে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পারল তারা একদিন। দিনের পর দিন শুধু নদীর পানি খেয়ে পেট ভরিয়েছে।

কত বন-জঙ্গল-মরুভূমি পেরিয়ে শেষে একদিন এসে পৌঁছল নিজের দেশে, আমার বাড়িতে।

বোনেদের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে চোখের পানি রাখতে পারলাম না। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যা হবার তা তো হয়েই গেছে, ভেবে আর লাভ নেই। আল্লাহরই বোধহয় এ-রকম ইচ্ছে ছিল। যাক, আসতে যখন পেরেছ, বোন হয়ে ফেলব না।

নতুন কাপড়চোপড় দিলাম ওদেরকে। সাবান দিয়ে ভালোমতো গা ঘসেমেজে গোসল করল তারা। একসঙ্গে বসে খাবার খেলাম আমরা। নতুন করে জীবন গড়ার আলোচনায় মশগুল হল তারা। নানারকম আলোচনা করল আমার সঙ্গে।

বললাম ব্যবসা করে করে ভালোই আয় হয়েছে আমার। লাভের টাকাটা খাটিয়েই ওরা দু'জন আবার জীবন শুরু করতে পারে। খুবই খুশি হল বোনেরা।

দিন যায়। বছরখানেক আমার কাছেই রইল বোনেরা, বেশ সুখেই কেটেছে দিন। হঠাৎই এই সময় আবার বিয়ের পোকা ঢুকল তাদের মাথায়। দু'জনেই একদিন এসে আমাকে জানাল, আবার তারা বিয়ে করতে চায়।

রাগই হল। ভয়ও। বললাম, কাজ কী আর বিয়ে করে? কী লাভ? একবার বিয়ে করেও শিক্ষা হয়নি? তা ছাড়া তেমন সাচ্চা মানুষ কোথায় খুঁজে পাবে আজকের দুনিয়ায়?

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কথা। আমার কথায় কানই দিল না বোনেরা। আমাকে না জানিয়ে গোপনে গোপনে বিয়ে পাকাপাকি করে ফেলল। তারপর এসে আমতা আমতা করতে লাগল আমার কাছে।

কী আর করি? হাজার হলেও বড় বোন। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই মতো দিতে হল। দিনক্ষণ দেখে আবার বিয়ে হয়ে গেল দুবোনের। পয়সা খরচ থেকে শুরু করে বিয়ের যা যা দরকার, সবই করলাম। বিয়ের পরে কয়েকদিনও গেল না। আমার আগের দুলাভাইদের মতোই পরের দুজনও সওদাগরি করতে বিদেশে রওনা হল। সঙ্গে নিয়ে গেল যার যার বৌকে।

এবারে আর বেশিদিন লাগল না। কয়েক মাস পরেই ফিরে এল বোনেরা। সেই ভিখিরির বেশ। সেই আগের বারের মতোই ঘটনা। মুখ নিচু করে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলে আমার কাছে মাপ চাইতে লাগল তারা।

বড় বোন, এত করে মাপ চাইছে। লজ্জা পেলাম। আবার সান্ত্বনা দিয়ে আশ্রয় দিলাম তাদেরকে। ওরা ওয়াদা করল, আর কখনও বিয়ের কথা মুখেও আনবে না। বিশ্বাস করলাম।

আমার টাকায় আবার নতুন করে জীবন শুরু করল বোনেরা। তিন বোন একসঙ্গে থাকি। দেখতে দেখতে কেটে গেল এক বছর। দোকানের আয় হিসেব করে বুঝলাম, যা টাকা হয়েছে, এবার আমি নিজেই বাণিজ্যে যেতে পারি। বোনদের জানালাম সে-কথা। আরও বললাম, ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারে ওরা, কিংবা থেকে গিয়ে দোকানের দেখাশোনা করতে পারে। ওরা জানাল, আমার সঙ্গেই যাবে।

সব টাকা সঙ্গে নিলাম না। অনেক রকমের ভয় আছে পথে, যদি খুইয়ে বসি? এজন্য অর্ধেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বাকি অর্ধেক বাড়িতেই এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে একদিন জাহাজে চড়লাম।

জাহাজ চলছে, চলছে। দুয়েকটা বন্দরে থামল পথে। তারপর গিয়ে পড়ল বড় দরিয়ায়। দিন যায়, কিন্তু ডাঙার আর দেখা পাওয়া যায় না। শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। একদিন কাপ্তানকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, ব্যাপার কী?

মুখ কালো করে কাপ্তান জানাল, পথ হারিয়ে ফেলেছে। অচেনা সাগরে এসে পড়েছে জাহাজ। কপালে কী আছে আল্লাহই জানেন!

একটা জিনিস লক্ষ করলাম, ঢেউ বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। জোরালোও হচ্ছে। কিন্তু বাঘা কাপ্তান, হার মানবার লোক নয়। শক্ত হাতে হাল ধরল সে নিজে। বড় বড় ঢেউ ভেঙে পড়ছে জাহাজের উপরে। খেয়ালই নেই যেন কাপ্তানের। যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ দেখে যাবার ইচ্ছে তার।

কাপ্তানেরই জিত হল। দশ দিন পর একটা বন্দরে এসে ভিড়ল জাহাজ। কাপ্তান জানাল, ওই বন্দর তার অচেনা। তা যে বন্দরই হোক, মানুষ যখন আছে, প্রাণ তো বাঁচল।

সওদাপাতি করার জন্য বন্দরে নামলাম আমরা। শহরে ঢুকলাম। যেদিকে তাকাই, অসংখ্য বাড়িঘর দোকানপাট। সব কালো পাথরে তৈরি। ঝকঝকে পথঘাট। সোনারুপা আর হীরামাণিকের ছড়াছড়ি অলংকারের দোকানগুলোতে। খাবারের দোকানে হরেক রকমের খাবার থরে থরে সাজানো। কিন্তু জাহাজ থেকে নামার আগে একটা ভুল অনুমান করেছিলাম। ভেবেছিলাম বন্দর যখন আছে, মানুষও আছে। কিন্তু পথে ঘাটে, বাড়িতে, দোকানে মানুষের ছায়াও চোখে পড়ল না। এ কী আজব কাণ্ড?

লোকজন নেই। আমার সঙ্গের লোকেরা নির্বিচারে অলংকারের দোকানগুলো লুট করতে লাগল। খাবারের দোকানে ঢুকে যার যা খুশি মুখে পুরতে লাগল। কোনো বাছবিচার নেই।

এসব লুটপাট ভালো লাগল না আমার। বিশাল এক প্রাসাদ দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে চললাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, সোনার তৈরি বিরাট সিংহদরজা। এখানেও লোকজন দেখলাম না। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম আঙিনায়।

বিশাল প্রাসাদের সঙ্গে মিল রেখেই তৈরি হয়েছে বিরাট দরজা। দরজার পাল্লা সোনার তৈরি। ভারি মখমলের পর্দা ঝুলছে। এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। দরবার ঘর। এই প্রথম এ শহরে মানুষের মুখ দেখলাম। হীরা-পান্না খচিত সোনার সিংহাসনে বসে আছেন এক বাদশাহ। তাঁর দুই পাশে বসে আছেন উজির, নাজির, আমির, পারিষদেরা। সম্মান অনুসারে কেউ বসেছে সোনার কুরসিতে, কেউ বা রুপার। দরবারের চারধারে জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রধারী সিপাহি।

ঘরে এতগুলো লোক, কিন্তু আজব কাণ্ড! কেউ নড়ছে না। কথা বলছে না। পাথরের মূর্তির মতো স্থির, অনড়।

দরবার পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরেও সেই একই অবস্থা। কোথাও জীবন্ত মানুষের চিহ্ন নেই। হারেমেও একই কাণ্ড। অপরূপ সাজে সাজানো রয়েছে হারেমের ভিতরটা। দরজা-জানালা, পালঙ্ক, কুরসি, সব সোনার তৈরি। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা ভারি মখমলের পর্দা ঝুলছে দরজা-জানালায়। পালঙ্কে আধশোয়া হয়ে আছে এক অপূর্ব যুবতী। হীরা-মণি-মুক্তাখচিত অলংকারের বোঝা শরীরে। বুঝলাম, হারেমের প্রধান বেগম। কিন্তু পাথর হয়ে আছে। আরও অনেক বেগম রয়েছে ঘরে, সবাই পাথর। পরিচারিকারা-ও পাথর। দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না, হঠাৎই পাথর হয়ে গেছে সবাই।

হারেম থেকে বেরিয়ে একপাশে এগিয়ে গেলাম। প্রাসাদে ঢুকে এই প্রথম একটা রুপার দরজা দেখলাম। এগিয়ে গিয়ে ঠেলা মেরে খুলে ফেললাম পাল্লা। ভিতরে, ঘরের ঠিক মাঝখানে শ্বেতপাথরের বিরাট এক মঞ্চ। সাতটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় সেই মঞ্চে। উঠে গেলাম।

মঞ্চের উপরটা পারস্যের গালিচায় মোড়া। সোনার জরিতে কাজ করা কার্পেট। একপাশে মখমলের গদির উপর দামি ফরাস বিছানো। অন্যপাশে একটা শাহী বিছানা বিছানো। আলোয় ঝলমল করছে পুরো মঞ্চটা। কিন্তু মোমবাতি বা চেরাগের আলো নয়। মেহগনি কাঠের ছোট্ট একটা টুলের উপর বসানো রয়েছে একটা হীরা। এতবড় হীরা জীবনে দেখিনি আমি। রাজহাঁসের ডিমের সমান বড়। ঠাণ্ডা আলো বেরোচ্ছে ওই হীরাটা থেকেই।

ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে লাগলাম। মানুষের অভাব নেই, কিন্তু সবাই পাথর। কী করে ঘটল এই ঘটনা! জানার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু জ্যান্ত মানুষ নেই, কার কাছ থেকে জানব? নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে, ওই রহস্যের সমাধান করতেই হবে। তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলাম প্রাসাদের সবখানে। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, সব ভুলে গেলাম। মনে শুধু এক ভাবনা, মানুষগুলো সব পাথর হয়ে যাবার রহস্য আমাকে জানতেই হবে।

কোনদিক দিয়ে দিনটা কেটে গেল, টেরই পেলাম না। সাঁঝ হয়ে এল, রাতের আঁধার নামল। প্রাসাদেই রাত কাটানো স্থির করলাম। কিন্তু কোথায় ঘুমাব? ভাবতে ভাবতে চলে এলাম সেই মঞ্চের ঘরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম উপরে। শুয়ে পড়লাম সেই শাহী বিছানায়।

বিছানার মাথার কাছে সোনার একটা তাক। তাতে সাটিনের কাপড়ে মোড়ানো কিছু রয়েছে। বইয়ের মতো দেখতে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম। সাটিনের গিলাফ খুলে ফেললাম। খুশিতে ভরে গেল মনটা। কোরান শরীফ।

রোজ রাতে ঘুমানোর আগে কোরান পড়া আমার বহুদিনের অভ্যাস। ভেবেছিলাম, ওই রাতে কোরান পড়া বাদ যাবে। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমা। বান্দাকে তিনি কখনও নিরাশ করেন না। তাড়াতাড়ি কোরান খুলে বসলাম। আল্লাহর বাণী পড়তে পড়তে শান্ত হয়ে এল মন, উদ্বিগ্ন ভাবটা কেটে গেল। পড়া শেষ করে, হাত তুলে মোনাজাত করলাম আল্লার কাছে। তারপর আবার কোরানখানি গিলাফে মুড়ে তাকে রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথার কাছে কোরান রয়েছে, কোনো অমঙ্গল আর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। নিশ্চিন্তে চোখ মুদলাম।

রাত দুই প্রহরের সময় আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। কানে এল একটা মধুর কণ্ঠস্বর। সুললিত গলায় কোরান পড়ছে কেউ। উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। মঞ্চ থেকে নামলাম। পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম শব্দ লক্ষ্য করে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের আঙিনা পেরোলাম। সামনে একটা ঘর থেকে আসছে আওয়াজ। এগিয়ে উঁকি দিলাম ভিতরে। ম্লান সবুজ আলো জ্বলছে ভিতরে। মেঝেতে সাধারণ একটা কম্বল বিছিয়ে তাতে বসে গভীর মনোযোগে কোরান পড়ছে এক যুবক। যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি সুন্দর চেহারা। এত সুন্দর করে কোরান পড়তে কাউকে শুনিনি এর আগে।

আমার মনে তখন একটাই ভাবনা চলছে : এই পাষাণপুরীতে আর সবাই যেখানে পাথর হয়ে গেছে, সেখানে এই যুবক কী করে রেহাই পেল? কে এই যুবক?

নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে যুবকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাড়া পেয়ে মুখ তুলল যুবক। সেলাম জানালাম। বললাম, চমৎকার গলা তো আপনার! এত সুন্দর কোরান পড়তে পারেন!

কোরান বন্ধ করল যুবক। সাটিনের গিলাফে মুড়ল। উঠে গিয়ে একটা তাকে তুলে রেখে এল। ফিরে এসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, কে, তুমি, সুন্দরী? এই পাষাণপুরীতে কী করে এলে?

আমি কে, কী করে প্রাসাদে ঢুকেছি, দু-চার কথায় জানালাম তাকে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলাম, এখন বলুন, আপনি কে? প্রাসাদের সবাই পাথর হয়ে গেল কেন?

আবার হাসল যুবক। কী মধুর তার হাসি! সারা শরীরে শিহরণ জাগল আমার। এর আগে পুরুষ মানুষ দেখে কখনও এমন হয়নি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বুকের মাঝে কেমন যেন লাগছে। কেমন এক ধরনের আবেগ, উত্তেজনা। আমি তার মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

যুবক বলল, বেশ, শোন তাহলে। এই দেশের সুলতান ছিলেন আমার বাবা। ধন দৌলত, লোকলস্কর কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। রাজ্যের কারো কোনো অভাব ছিল না। প্রজারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত বাবাকে। প্রজাবৎসল বলে বাবারও খুব সুনাম ছিল। অথচ ভাগ্যের এমনি পরিহাস, মানুষসহ রাজ্যের সমস্ত জীবন্ত প্রাণী এখন পাথর হয়ে গেছে।

দরবারে তো দেখেছ, সিংহাসনে যিনি বসে আছেন, তিনিই আমার বাবা। হারেমের প্রধান বেগম আমার মা। আমার বাপ-মা দুজনেই জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ ছিলেন। ইসলামে বিশ্বাস ছিল না তাঁদের, খোদা রসুলকে মানতেন না, শুধু মেনেছিলেন শয়তান নারদুনকে। সেই পাপেই আজ তাঁদের এই অবস্থা।

অনেকদিন কোনো ছেলেপুলে হয়নি তাঁদের। অনেক রকম চেষ্টা-তদবির চালিয়েও যখন কোনো ফল হল না, হালই ছেড়ে দিয়েছেন আমার বাবা-মা, ঠিক এই সময় মায়ের পেটে এলাম আমি। কাজেই জন্মের পর আমার আদরযত্নের ঘটা কতখানি হবে, বুঝতেই পারছ।

আদরযত্ন করেছেন ঠিকই, কিন্তু ছেলেকে কী করে মানুষের মতো মানুষ করবেন, সেদিকেও পুরোমাত্রায় খেয়াল ছিল তাঁদের। বড় হয়ে সিংহাসনে বসে রাজ্য চালাতে হবে, তাই ছোটবেলা থেকেই সে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল আমাকে। মনেপ্রাণে চাইতেন, আমি তাঁর মতোই শয়তান নারদুনের পূজা করি।

হয়তো তাই করতাম, কিন্তু আমার কপাল ভালো, প্রাসাদে এক বৃদ্ধা ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি গোপনে। প্রাণের ভয়ে সবার সামনে সাহস পেতেন না, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিকমতোই নামাজ আদায় করতেন তিনি, রোজা রাখতেন। আল্লাহ আর তাঁর রসুলের ওপর পুরো বিশ্বাস ছিল বৃদ্ধার।

আমার বাবা খুব ভালো চোখে দেখতেন বৃদ্ধাকে। ভাবতেন বৃদ্ধাও নারদুনের ভক্ত। জন্মের পর আমাকে লালন-পালনের ভার পড়েছিল এই বৃদ্ধার ওপরই। আমার পুরো দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বাবা-মা।

আমি বড় হতে লাগলাম। ইসলাম শিক্ষা দিলেন আমাকে বৃদ্ধা। শোনালেন আল্লাহর বাণী। শোনালেন আল্লাহর রসুলের কথা। জানলাম আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। একমাত্র তাঁর কাছেই মাথা নত করতে হবে। আস্তে আস্তে সাচ্চা মুসলমান করে গড়ে তুললেন আমাকে দাইমা। বোঝালেন, নারদুন এক মহাশয়তান। তার পাল্লায় পড়লে আর নিস্তার নেই। তবে আল্লাহ আর তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান ঠিক রাখলে, শয়তান কারো ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

আমার শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময়ই একদিন পরপারে পাড়ি দিলেন দাইমা। একেবারে একা হয়ে পড়লাম আমি। সব আছে আমার, তবু মনে হতে লাগল কী যেন নেই।

যা-ই হোক। দিন যায়। একদিন গভীর রাতে, শহর তখন ঘুমে অচেতন। একটি লোকও আর জেগে নেই। এই সময় স্বপ্নে দেখল সবাই, নূরানী চেহারা, সৌম্য শান্ত এক বৃদ্ধ এসেছেন শহরে। আল্লাহর নামগান করতে করতে নেমে এসেছেন তিনি আকাশ থেকে। সবাইকে বললেন তিনি : হে মানুষেরা, আমি এসেছি আল্লাহর কাছ থেকে, তাঁর পবিত্র বাণী বয়ে এনেছি তোমাদের জন্য। এই দুনিয়া, এই মানুষ, এই জীবজন্তু, গাছপালা, চাঁদ-সূর্য-তারা যা কিছু আছে, সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

তিনি মহা ক্ষমতাশালী, অসীম দয়ালু। তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই। শয়তান নারদুন তোমাদের ভুল কথা শোনাচ্ছে, মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, দিনে দিনে পাপে ডুবে যাচ্ছ তোমরা। চোখ তোমাদের অন্ধ। এখনও সময় আছে, চোখ খোল। আলোর দিকে তাকাও। আল্লাহর নামগান কর। লাথি মেরে তাড়াও নারদুনকে।

ঘুম ভেঙে গেল শহরবাসীর। সচকিত, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই। এ কী দেখল তারা! এ কী স্বপ্ন! তাড়াতাড়ি দল বেঁধে সুলতানের কাছে ছুটে এল তারা সে রাতেই। এই স্বপ্নের অর্থ কী জানতে চাইল।

হা হা করে হাসলেন আমার বাবা। জানালেন, তিনিও একই স্বপ্ন দেখেছেন। শহরবাসীকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। শয়তান নারদুনই তাদেরকে সব অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে।

আল্লাহর নামগান করল না কেউ। আরও বেশি করে শয়তানের উপাসনায় মেতে উঠল। কেটে গেল এক বছর। আবার এক রাতে স্বপ্নে দেখা দিলেন সেই মহাপুরুষ। আবার লোককে আল্লাহর পথে চলার ডাক দিলেন। শয়তানের কবজা থেকে মুক্তির আহ্বান জানালেন।

ঘুম থেকে উঠে আবার সুলতানের কাছে ছুটে এল শহরবাসী। আবার শয়তান নারদুনের ক্ষমতার কথা জানিয়ে অভয় দিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠালেন বাবা।

পরের বছর আবার স্বপ্নে দেখা দিলেন মহাপুরুষ। হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেলেন, এরপর আর তিনি আসবেন না। এরপর থেকে যদি শহরবাসী আল্লাহর পথে না চলে, তাহলে ধ্বংস তাদের অনিবার্য।

সুলতান এবারেও ভুল কথা শুনিয়ে অভয় দিলেন শহরবাসীকে। ফিরে গেল তারা। পরিণাম হল ভয়াবহ।

কয়েকদিন পরেই আকাশ থেকে নেমে এল ভয়াবহ এক আগুনের পিণ্ড। শাঁ করে পুরো শহরের ওপরে মাত্র একবার পাক খেলো আগুনের গোলা। ব্যস, সব শেষ। নিমেষে পাথরে পরিণত হয়ে গেল শহরের প্রতিটি প্রাণ। বেঁচে গেলাম একমাত্র আমি। আমি ইসলামে বিশ্বাসী, কাজেই রেহাই পেয়ে গেলাম।

তারপর থেকে আমি একা। দিনের বেলা বাইরে বাইরে কাটাই, রাত হলে ফিরে আসি প্রাসাদে। কোরান পড়ে, আল্লাহর নামগান করে করে কাটিয়ে দিই রাত। আজ তুমি এলে। অনেকদিন পর মন খুলে দুটো কথা বলতে পারলাম। আমার কী যে ভালো লাগছে!

জিজ্ঞেস করে ফেললাম, আমাকে তোমার ভালো লেগেছে, শাহজাদা?

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল সে, ভালো মানে! খুবই ভালো লেগেছে! যদি রাজি থাকো, তোমাকে স্ত্রী হিসেবে নিতে চাই আমি।

শাহজাদার কথায়ও কেমন এক জাদু ছিল, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বললাম, বেশ, তাই হবে। বিয়ের পর চল আমার দেশ বাগদাদে ফিরে যাই। এত সুন্দর শহর আর

হয় না। ওখানকার সবাই ইসলামে বিশ্বাসী। সবাই সবাইকে ভালোবাসে। কেউ কাউকে ঠকায় না। আর সেখানকার বাদশাহ, খলিফা হারুন অর-রশিদ তো আল্লাহর পয়গম্বর। মন খুলে আল্লাহর নামগান করতে পারবে তুমি সেদেশে। বাড়িঘর ব্যবসা-বাণিজ্য আমার সবই আছে। আরাম আয়েশে, হাসিখুশির মাঝেই দিন কেটে যাবে আমাদের। আল্লাহরই বোধহয় এরকম ইচ্ছে। নইলে আমার মতো ঘরকুণো মেয়ে বাণিজ্যে বেরোবে কেন, জাহাজই-বা অচেনা সাগর পাড়ি দিয়ে অচেনা এই দেশে এসে পৌঁছবে কেন, আর বয়েস হলেও এতদিন বিয়ের কথা মনে আসেনি কেন? আসলে তোমার সঙ্গে জোড়া আছে, তাই এমন হয়েছে।

আমার কথায় রাজি হল শাহজাদা। দুজনে ফিরে এলাম এই মঞ্চের ঘরে। শাহজাদা জানাল এটা তারই ঘর। সে-ই থাকে এই বিছানায়। আল্লাহকে সাক্ষী করে একে অন্যকে গ্রহণ করলাম আমরা।

সকালে শাহজাদার বুকে ঘুম ভাঙল আমার। দেশে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হলাম। প্রচুর ধনরত্ন পোঁটলা করে বাঁধল শাহজাদা। এত নিল, দুজনের পক্ষে বয়ে নেয়াই কষ্টকর হয়ে উঠল। কোনোমতে সেই ভারি বোঝা নিয়ে জাহাজে এসে উঠলাম আমরা।

আগের রাতে ফিরিনি, জাহাজে সবাই আমার জন্য উদ্বিগ্ন। তাদেরকে সব কথা খুলে বললাম, দুই বোনকে আমার নতুন বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমার বিয়ের কথা শুনে জাহাজের কাপ্তান থেকে কুলিকামিন পর্যন্ত সবাই খুশি। কিন্তু খেয়াল করলাম, আমার দুই বোন খুশি হতে পারেনি। মুখে হাসি বজায় রেখেছে ঠিকই, ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে বলছে, কিন্তু মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলছে তারা, বুঝতে অসুবিধা হল না।

জাহাজ ছাড়ল। সোজা দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলাম কাপ্তানকে। প্রচুর ধনরত্নের মালিক হয়ে গেছি, আর বাণিজ্যের দরকার নেই।

ক্ষণিকের জন্যও আমার কাছছাড়া হয় না শাহজাদা, আমিও তাকে চোখের আড়াল করতে পারি না। দিনরাত ভালোবাসার সাগরে ডুবে থাকি আমরা।

হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছে আমার দুই বোন। দুই-দুইবার বিয়ে করেছে তারা, কিন্তু একবারও স্বামীকে ধরে রাখতে পারেনি। খুশি হয়নি। আমার মতো স্বামীর আদর ভালোবাসাও জোটেনি তাদের কপালে। শেষে আর সইতে না পেরে আমার সর্বনাশ করার জন্য উঠেপড়ে লাগল তারা। ঠিক করল, আমাদের দুজনকে খতম করে ফেলবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে তাহলে। আমরাও মরব, জাহাজসুদ্ধ সব ধনরত্নও ওদের হয়ে যাবে। এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি তখন।

অচেনা সাগর আর অচেনা নেই তখন কাপ্তানের কাছে। বাতাসও অনুকূলে। তরতর করে ঢেউ ভেঙে দেশের দিকে চলছে জাহাজ। নাবিকদেরও কাজকর্ম তেমন নেই। হাসি-আনন্দে দিন কাটছে তাদেরও।

এই সময়ই একদিন, গভীর রাত অবধি হৈ-হুল্লোড় করে ঘুমোতে গেল নাবিকরা। স্বামীকে নিয়ে আমিও নিজের ঘরে শুতে গেলাম। রাত আরও নিশুতি হল। শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছিল রাতের শুরুতে, ডুবে গেছে কবেই। চারদিকে নীরব-নিঝুম। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছি আমি আর শাহজাদা। এই সময় পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল দুই বোন, আমরা জানতে পারলাম না। ঘুমের ভিতরেই আমাদের দু'জনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল পানিতে।

নাকমুখ দিয়ে পানি ঢুকে যাচ্ছে অনবরত। সাঁতার ভালোই জানি। হাত-পা ছুড়ে ভেসে উঠলাম আবার। অন্ধকারে চেঁচিয়ে বারবার স্বামীকে ডাকলাম, সাড়া নেই। একটু দূরে বিশাল একটা আবছা কালো ছায়া চোখে পড়ল। বুঝতে পারলাম জাহাজটা। প্রাণপণে ওটার দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। কিন্তু জাহাজের সঙ্গে কি আর সাঁতরে পারি? তা ছাড়া কতক্ষণ সাঁতরাব? শিগগিরই ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলাম। কাঁদতে কাঁদতে বারবার ডাকতে লাগলাম স্বামীকে। সাড়া পেলাম না। কী আর করি? ঢেউয়ের বুকেই নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে ভেসে রইলাম কোনোমতে।

সারাটা রাত পানিতেই রইলাম। ভোরের দিকে ঢেউ আমাকে নিয়ে এসে ফেলল এক অজানা দ্বীপে। ওঠার শক্তি নেই, কাদাপানিতেই পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। গায়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ঢেউ, নেমে যাচ্ছে আবার। কিন্তু ওসব খেয়াল করার মতো অবস্থা তখন আমার নেই।

রোদ উঠল। জামাকাপড় সব ভিজে। শীত করতে লাগল। উঠে পড়লাম। বালিচরে যতদূর চোখে যায়, জনমনিষ্যির চিহ্নও নেই। সামনে গভীর বন। কী করি! কী করি? ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম বনের দিকে। এই সময় তীব্র হিসহিসানি শুনে চমকে পাশে ফিরে চাইলাম। দেখি, ছোট্ট একটা সাপকে তাড়া করে আনছে বিশাল আরেকটা সাপ। প্রাণের ভয়ে ছুটছে ছোট সাপটা। আমার দিকেই ছুটে আসছে। কাছে এসে আমাকে ঘিরে ঘুরতে লাগল সাপটা। বড় সাপটাও ছোটটাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। মায়া হল ছোট সাপটার জন্য। বড় দেখে একটা পাথর তুলে নিয়ে মারলাম বড় সাপের মাথায়। মাথা থেঁতলে গেল, মারা গেল সাপটা। তারপরই ঘটল এক অবাক কাণ্ড!

আমার চোখের সামনে সাপের রূপ ছেড়ে মানুষের রূপ ধরল ছোট সাপটা। এক কিশোরী। কালো গায়ের রঙ, কিন্তু চমৎকার গঠন। চেহারাও ভালো।

আমার কাছে এগিয়ে এল কিশোরী। বলল, আপনি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমি জিনের মেয়ে। ওই যে সাপটা মরে পড়ে আছে, ওটাও জিন। অনেকদিন থেকেই আমার ওপর নজর ছিল তার, বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। আজ সে জোর করেই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি জানি, বিয়ে করে পরদিন সকালেই আমাকে মেরে ফেলত সে...তা আপনি কে, মালকিন?

আমি কে, কী করে ওই দ্বীপে উঠেছি, অল্প কথায় জানালাম। সব শুনে কী যেন ভাবল কিশোরী। তারপর এক লাফে আকাশে উঠে উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আমি। একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পায়ে কারো হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙল। দেখি, সেই কিশোরী আমার পায়ে হাত বোলাচ্ছে। একটু দূরে গাছের গোড়ায় শিকল দিয়ে বাঁধা আছে দুটো মাদি কুকুর।

আমাকে চোখ মেলতে দেখেই কিশোরী বলল, ওই যে কুকুর দুটো দেখছেন, মালকিন, ও দুটো আপনার বড় দুই বোন। জাদু করে কুকুর বানিয়ে দিয়েছি। বাদশাহ সোলেমানের হুকুম, রোজ রাতে আচ্ছা করে চাবুক মারবেন ও দুটাকে। ওদের এই-ই শাস্তি!

আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু আমার স্বামী? আমার প্রিয়তম কোথায়? তাকে আনোনি?

মাথা নিচু করে বলল কিশোরী, তিনি আর নেই, মালকিন। সাঁতার জানতেন না। পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে গেছেন। আর কোনোদিন আপনার কাছে ফিরবেন না।

ডুকরে কেঁদে উঠলাম। চুপচাপ আমার পায়ের কাছে বসে রইল কিশোরী। শেষে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কেঁদে আর কী হবে, মালকিন? যিনি গেছেন, তিনি তো আর ফিরবেন না। চলুন আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই।

আমাকে আর কুকুর দুটোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল কিশোরী। যাবার আগে তার মাথার কয়েকগাছি চুল দিয়ে বলল, ওই চুল আগুনে পুড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকলেই চোখের পলকে এসে হাজির হবে সে।

কিছুদিন পরে নিরাপদে বাগদাদে ফিরে এল আমার জাহাজ। কাপ্তান আমার সব ধনরত্ন নিজের হেফাজতে রেখেছে, একটা আধলাও খোয়া যায়নি। খোঁজ করে করে আমার বাড়িতে সব নিয়ে এল সে। তার ইচ্ছে ছিল, আমার কোনো আত্মীয় থেকে থাকলে তার হাতে তুলে দিয়ে যাবে সব। আমাকে দেখে খুব খুশি হল কাপ্তান। আমার স্বামীর জন্য দুঃখ করতে লাগল।

আমি আর বিয়ে করিনি, জাঁহাপনা। বাদশাহ সোলেমানের নির্দেশমতো রোজ রাতে চাবুক মারি কুকুর দুটোকে। নিজের মায়ের পেটের বোন। মেরে মেরে নিজেই আর সইতে পারি না। জড়িয়ে ধরে কাঁদি।

এই আমার কাহিনী জাঁহাপনা।

চুপ করল জোবেদা। তার কাহিনী শুনে দরবারসুদ্ধ লোক থ হয়ে গেল।

খলিফা বললেন, আমি ভাবতাম, আমার রাজ্যে কেউ দুঃখে নেই। আজ আমার মস্তবড় ভুল ভাঙল।

খলিফার কথা শেষ হলে আমিনার দিকে তাকাল উজির। বলল, এবার তোমার কাহিনী বল।

মেজো বোন আমিনার কাহিনী

বাবা মারা যাবার পর আমি চলে গেলাম মায়ের কাছে। যৌবনে পা দিয়েছি। দিনে দিনে আরও পূর্ণতা পাচ্ছে আমার শরীর। লোকে বলত, আমার মতো সুন্দরী কমই আছে। এই সময় এক বুড়ো সওদাগরের চোখ পড়ল আমার ওপর।

সওদাগরের অনেক টাকা। বয়েসও অনেক। আজ মরে কি কাল মরে। শরীরে জোর নেই। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে মাকে হাত করে নিল সওদাগর। আমার অমতে জোর করেই সওদাগরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিল মা।

এত পাগল হয়ে আমাকে বিয়ে করল সওদাগর, বিয়ের রাতে আমার সঙ্গে শুলও, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। একবিন্দু সামর্থ্য নেই তার, অথচ আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিল।

বছরও ঘুরল না, মারা গেল বুড়ো। অনেক টাকার মালিক হলাম আমি। নগদই পেলাম আশি হাজার দিনার। কাপড়-গহনা কেনার ধুম লাগিয়ে দিলাম। দশটা পোশাক বানালাম, একেকটার দাম পড়ল হাজার দিনার করে। হীরা-চুনি বসানো অলংকার বানিয়ে বানিয়ে স্তূপ করে ফেললাম। দেখতে দেখতে খরচ করে ফেললাম আশি হাজার দিনার।

সওদাগরের সম্পত্তি থেকে প্রচুর আয় হয়, আমার কোনো ভাবনাই নেই। এই সময় একদিন এক থুরথুরে বুড়ি এসে হাজির বাড়িতে। মেয়েমানুষের এত কুৎসিত চেহারা আর দেখিনি আমি। কুমড়োর মতো মুখ, গর্তে বসে যাওয়া কুৎকুতে চোখ। বিচ্ছিরি মুখের ভিতর কয়েকটা দাঁত আছে, তবে ভাঙা, কী করে জানি কালো হয়ে গেছে। থ্যাবড়া নাকের ডগায় মস্ত এক তিল, তাতে রোম গজিয়েছে, সারসের মতো ইয়া লম্বা সরু গলা। গায়ে এক ছটাক মাংস আছে কিনা সন্দেহ।

বুড়িকে দেখেই শিউরে উঠলাম। মনে করলাম কোনো ভিখিরিটিখিরি হবে। বাঁদিকে ডেকে ভিক্ষে দিয়ে তাড়াতাড়ি আপদ বিদেয় করতে বললাম।

কিন্তু ভিক্ষে নিল না বুড়ি। আমার কাছে এসে সেলাম জানাল। মিনতি করে বলল, মা, আমি একটা এতিম মেয়েকে দেখাশোনা করে বড় করেছি। আজ রাতে তার বিয়ে। আমি বড় গরিব। মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই। তাই বলে ভেব না, তোমার কাছে পয়সা চাইতে এসেছি। তোমার গুণের কথা লোকের মুখে অনেক শুনেছি। তাই তোমাকে আজ আমার গরিবখানায় নিয়ে যেতে চাই। তুমি না করতে পারবে না, মা। তোমার পায়ের

ধুলো পড়লে আমার মেয়ের কল্যাণ হবে। তুমি তৈরি থেক, মা। সাঁঝের পর তোমাকে নিতে আসব। তুমি কিচ্ছু ভেব না, রাতেই আবার পৌঁছে দিয়ে যাব।

বুড়ির চেহারা খারাপ, কিন্তু কথাবার্তা বড় ভালো। রাজি হয়ে গেলাম।

বিয়েবাড়িতে যাব, সাজগোজ করা দরকার। বিকেলে হাতমুখ ধুয়ে সাজতে বসলাম। অনেক দামি দামি পোশাক আছে আমার। সবচেয়ে ভালোটা বের করে পরলাম। গলায় পরলাম সাতনরী হার। হাতে বাজুবন্দ, বাহুতে তাগা, মাথায় টায়রা, কোমরে বিছে হার, নাকে নাকছাবি, কানে দুল, পায়ে মল পরে বেহেশতের হুরির মতো সাজলাম। সাজগোজ শেষ করতে করতেই বুড়ি এসে হাজির।

মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ি। তারপর হেসে বলল, জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছি আমি, মা, কিন্তু তোমার মতো রূপসী চোখে পড়েনি! নাও, চল, দেরি করে লাভ নেই। ছেলের বাড়ির লোকজন সব এসে গেছে। সবাই তোমার পথ চেয়ে আছে। তুমি গেলেই বিয়ের কাজ শুরু হবে।

আমার একটা গোলামকে সঙ্গে নিলাম। সাঁঝের আঁধার নামছে। রাস্তায় রাস্তায় পানি দিয়ে যাচ্ছে ভিস্তিওয়ালা। গা-জুড়ানো ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বেশিক্ষণ চলতে হল না, বিয়েবাড়িতে পৌঁছলাম।

কিন্তু একি! কোথায় বুড়ির ভাঙা বাড়ি। এ যে বিরাট এক প্রাসাদ!

দরজার দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল বুড়ি। খুলে গেল দরজা। আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল বুড়ি। বিরাট বাড়ির বড় বড় ঘর। শাহী কেতায় সাজানো। কড়িবর্গা থেকে ঝুলছে বড় বড় ঝাড়বাতি। হালকা সবুজ আলো জ্বলছে। ঘরে ঘরে সুন্দর সব জিনিস পরিপাটি করে সাজানো। একটা ঘরের দেয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঢাল-তলোয়ার-বল্লম-তীর-ধনুক। ঘরের দরজা-জানালায় নতুন ভারি পর্দা।

চওড়া এক বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা দরবার ঘরে ঢুকলাম। পুরু পারস্য-গালিচায় ঢাকা মেঝে। তার উপর চমৎকার ফরাস বিছানো। এক কোণে কারুকাজ করা মখমলের গদিতে আধশোয়া হয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে এক রূপসী যুবতী। কী তার রূপ। আমার মনে হল যেন আকাশের চাঁদটাই নেমে এসেছে।

আমাকে দেখেই উঠে পড়ল যুবতী। এগিয়ে এসে হাত ধরল। বলল, আরে আরে, কী সৌভাগ্য আমার! তোমার পায়ের ধুলো পড়ল! এস ভাই, বসো। আমাকে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় বসাল।

কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই বলে ফেলল যুবতী, তোমাকে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। আমার একটা ভাই আছে। দেখতে খুবই সুন্দর, সুপুরুষ। পয়সাকড়িরও অভাব নেই। এক বিয়ের আসরে তোমাকে দেখেছিল। তখন থেকেই তোমার জন্য পাগল হয়ে আছে। তোমাকে বিয়ে করতে চায়। আমাকে এসে ধরেছে। আমিই কিছু পয়সা খরচ করে বুড়িকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম। তোমাকে আসলে মিথ্যে কথা বলে আনা হয়েছে। তোমাকে বিয়ে করতে চায় আমার ভাই।

যদি রাজি থাকো, আজ রাতেই বিয়ে পড়িয়ে দিই। সত্যি বলছি, আমার ভাই তোমার অযোগ্য হবে না। দেখই-না তাকে একবার।

সাংঘাতিক রাগ হল। বুড়িটাকে কাছে পেলে সে মুহূর্তে হয়তো তাকে মেরেই বসতাম। শয়তানটার চেহারা যেমন খারাপ, পেটে পেটেও তেমনি বদমাশি।

মনে মনে গাল দিচ্ছি বুড়িটাকে, এই সময় দরজা খুলে গেল। ঘরে এসে ঢুকল এক যুবক। থমকে গেলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম যুবকের দিকে। বুড়িটাকে গাল দেবার জন্য অনুশোচনা হল মনে। পুরুষের এত রূপ জীবনে দেখিনি আমি! তাকিয়েই রইলাম মুগ্ধ চোখে। দেখে দেখে যেন আশ আর মেটে না।

আমার মুগ্ধ দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল যুবকের বোন। উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। হেসে জিজ্ঞেস করল, কী, পছন্দ হয়েছে? রাজি?

চোখ নামালাম। ঘাড় নেড়ে বোঝালাম, আমার অমত নেই।

আমাকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। গালে চুমু খেয়ে বলল, আমি জানতাম, রাজি না হয়ে পারবে না। আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফরাসে বসাল সে।

মেয়েটার নির্দেশে একজন মৌলভি আর চারজন সাক্ষী নিয়ে এল এক নফর। যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আমার।

একে একে বেরিয়ে গেল সবাই! ঘরে রইলাম শুধু আমি, আমার নতুন স্বামী আর তার বোন। কোরান শরীফ নিয়ে এল আমার স্বামী। আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, কসম কর, আমি ছাড়া আর কোনো পুরুষের দিকে নজর দেবে না কখনও।

কসম করলাম।

খুশি হল স্বামী। আমাকে দোয়া করল প্রাণভরে।

এরপর খাবার এল। তিনজনে একসঙ্গে বসে পেট ভরে নানারকম সুস্বাদু খাবার খেলাম আমরা। [illegible] মদ খেলাম প্রচুর। চোখে গোলাপি নেশা ধরল। গভীর হল রাত। আমাদের দুজনকে এক ঘরে রেখে চলে গেল আমার ননদি।

সে রাতটা আমার পরম পাওয়ার প্রথম রাত। এর আগেও একবার বিয়ে হয়েছিল আমার, স্বামীও পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা নামে মাত্র। আমার নারীত্বকে ভোগ করতে পারেনি অক্ষম বুড়োটা, আমিও স্বাদ পাইনি যৌবনের। দ্বিতীয় বিয়ের প্রথম রাতে আমার কুমারী জীবন শেষ হল। সার্থক হল নারী-জনম। দুজনে দুজনকে আপন করে পেলাম আমরা, বেহেশতের সুখ ভোগ করলাম যেন সারাটা রাত।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পরের একটা মাস। কোনদিক দিয়ে উড়ে চলে গেল তিরিশটা দিন, টেরই পেলাম না। আসলে, সুখের দিনগুলো সব তাড়াতাড়িই ফুরিয়ে যায়।

তারপর একদিন। কিছু কেনাকাটা দরকার আমার। জামাকাপড় কিনতে হবে কিছু। স্বামীকে জানালাম। সে অনুমতি দিল। সেই কুরূপা বুড়িকে নিয়ে বাজারে চললাম।

বাজারে একটা বড় কাপড়ের দোকানে এসে ঢুকলাম আমরা। বাহারি সব রেশমি কাপড় থরে থরে সাজানো। ভালো কিছু কাপড় দেখাতে বললাম দোকানিকে।

দামি দামি অনেক কাপড় বের করে আমার সামনে ছড়িয়ে রাখল দোকানি। সবগুলো নিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু একসঙ্গে এত কাপড় নিয়ে কী করব? তাই, ভালো দেখে বেছে কিছু কাপড় পছন্দ করলাম। বেঁধেছেদে ঠিক করে দিতে বললাম দোকানিকে।

কাপড়ের গাঁটরিটা বুড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে দিনার বের করলাম আমি। দোকানিকে দিতে গেলাম। কিন্তু হাত সরিয়ে নিল সে। জিভ কেটে বলল, সে-কী মালকিন! আজ প্রথম আমার দোকানে এসেছেন আপনি। পায়ের ধুলোয় ধন্য করে দিয়েছেন দোকান। আপনার কাছে পয়সা নেব! কিছুতেই না। আজ তো নয়ই।

পয়সা ছাড়া কাপড় নেব কেন আমি? ভিখিরি তো নই। আবার দাম দিতে চাইলাম।

কিছুতেই নেবে না দোকানি, আমিও দাম দেবার জন্য চাপাচাপি করছি। শেষে রেগে গেলাম। বললাম, হয় দাম নিন। নইলে এই রইল আপনার কাপড়। নেব না আমি।

এবার কথা বলল বুড়ি। আমাকে বলল, নাও না, মা। ইচ্ছে করে দিতে চাইছে লোকটা, এত সাধাসাধি করছে, নিলে কী ক্ষতি? ভালোবেসেই তো দিচ্ছে, নাও।

রেগে গিয়ে বললাম, ভালোবাসা! কিসের ভালোবাসা? জলদি চলো এখান থেকে। ওই কাপড়ের দরকার নেই আমার।

দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালাম। লাফ দিয়ে গদি থেকে নেমে এল লোকটা। আমার পথ জুড়ে দাঁড়াল। অনুনয় করে বলল, দোহাই আপনার, রাগ করে আমার দোকান থেকে চলে যাবেন না! কটাই-বা কাপড়, আর কতই-বা দাম। আপনাকে উপহার দিচ্ছি এগুলো। আর একান্তই যদি দাম দিতে হয় তো, দিনার দিয়ে নয়। আপনার গালে ছোট্ট একটা চুমু খাবার অনুমতি চাইছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! বলে কী লোকটা! বুড়ির দিকে তাকালাম, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। বুঝলাম, দোকানির সঙ্গে সাঁট আছে তার। রাগে কথা বেরোল না আমার মুখ দিয়ে।

মিনমিন করে বলল শয়তান বুড়িটা, মা, লোকটা তো আর এমন খারাপ কিছু বলেনি, এমন বেশি কিছু চায়ও না। ছোট্ট একটু চুমু। তাতে কী আর এমন ক্ষতি হবে তোমার? রাজি হয়ে যাও। অনেক বড়লোক সে। চাইলে সোনা-দানা, হিরে-জহরত দিয়ে ভরে দেবে তোমাকে।

বলে উঠলাম, না, হিরে-জহরত আমার দরকার নেই। তা ছাড়া আল্লাহর নাম নিয়ে স্বামীর কাছে কসম খেয়েছি, অন্য পুরুষের দিকে নজর দেব না। বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না আমি। আর স্বামী জানতে পারলে...

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল শয়তান বুড়ি, কী করে জানবে? আমি তো বলতে যাচ্ছি না, দোকানিও বলবে না। রাজি হয়ে যাও মা! আমি কথা দিচ্ছি, কাকপক্ষীও টের পাবে না।

দোকানের দরজা বন্ধ। গায়ের জোরে দোকানির সঙ্গে পারব না। বেশি জোরাজুরি করলে, আরও বেশি ক্ষতি হতে পারে আমার। ভালোয় ভালোয় একটা চুমুর ওপর দিয়েই যদি পার করে দিতে পারি, তো কপাল ভালো মনে করব, ভেবে, শেষে রাজি হয়ে গেলাম। আস্তে করে নেকাব সরিয়ে দিলাম মুখ থেকে।

কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। মুখ নামিয়ে আনল। তারপর হঠাৎই গলা জড়িয়ে ধরল আমার। কামড় বসাল গালে।

দুহাতে ঠেলে তার মাথা সরাবার চেষ্টা করলাম, গলায় পেঁচানো হাতের বাঁধন খুলতে চাইলাম। কিন্তু মেয়েমানুষ আমি, কতখানি জোর আছে গায়ে? পারলাম না। আমার গালে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে সে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলাম। আর একবার চেষ্টা করলাম লোকটাকে সরাতে। পারলাম না। মাথা গুলিয়ে উঠল আমার। চোখের সামনে আঁধার হয়ে এল দুনিয়া।

হুঁশ ফিরল বুড়ির কোলে। আমার মাথাটা কোলে নিয়ে চোখেমুখে পানির ছিটে দিচ্ছে বুড়ি। গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে আমার। সেই দোকানেই রয়েছি আমরা। কিন্তু ঘরে দোকানি নেই। নিজের কপালের কথা ভেবে কাঁদতে লাগলাম।

আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল শয়তান বুড়ি, কেঁদো না, মা। নসিবে যা লেখা ছিল, হয়েছে। চল, বাড়ি ফিরে যাই। মুখ থেকে নেকাব সরাবে না। কাউকে দেখতে দেবে না গালটা। ভালো মলম এনে দেব আমি। লাগালে দুদিনেই সেরে যাবে, দাগ মুছে যাবে। দু'তিনটা দিন শুধু স্বামীকে ঠেকিয়ে রেখ, দেখতে দিয়ো না। তাহলেই আর বুঝতে পারবে না সে।

কী আর করব? ভয়ে দুরুদুরু করছে বুকের ভিতরটা। বাড়ি ফিরে এলাম। এসেই বিছানা নিলাম। বাঁ গাল বালিশে চেপে শুয়ে রইলাম। স্বামী কাছে এল। শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে তখনকার মতো তাকে এড়ালাম। কিন্তু কতক্ষণ আর? মিথ্যা কথা বলে সত্যকে কতক্ষণ ঢেকে রাখতে পারব?

কিছুক্ষণ পরে আবার এল আমার স্বামী। তখনও আমাকে একইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বলল, এই তো, একটু আগেই বাজারে বেরোলে, ভালো শরীর। এরই মাঝে এত খারাপ হয়ে গেল!

বললাম, শরীরটা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে। তেমন কিছু না।

হঠাৎ বালিশের দিকে নজর পড়ল স্বামীর। আঁতকে উঠে বলল, আরে, রক্ত কিসের!

আর ঢেকে রাখতে পারলাম না। আমার গালের ক্ষত দেখে ফেলল স্বামী। মুখ কালো করে বলল, এ কী! এমন হল কী করে?

কোনোমতে বললাম, না, এমন কিছু না। বাজারের পথে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে একটা উট এসে পড়ল। কাঠ বোঝাই ছিল ওটার পিঠে। একটা কাঠের খোঁচা লেগে এমন হয়েছে।

রেগে গিয়ে বলল আমার স্বামী, কী-ই! আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। কাল সকালেই কোতোয়ালকে ধরব আমি। সব শালা কাঠুরেকে ধরে কোতলের ব্যবস্থা করব।

শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অকারণে নিরীহ কাঠুরেদের প্রাণ যাবে! তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না না, এমন কাজ কোরো না! ওদের কী দোষ? দোষ তো আমারই। গাধার পিঠে করে চলছিলাম। হঠাৎ পড়ে যাই নিচে। পিছন থেকে এসে পড়ে উটটা। আমাকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পিঠ থেকে ছুটে আমার গালে পড়ে যায় একটা চ্যালা কাঠ। আসলে দোষটা তো আমারই। কাঠুরে তো ইচ্ছে করে কাঠ ফেলেনি।

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল স্বামী। দু'চোখে সন্দেহ ঝিলিক উঠল, বলল এই না বললে, হাঁটছিলে? আবার গাধার পিঠে গেলে কী করে? আসলে কী হয়েছিল?

ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু কিছুই মুখে এল না আর। আসবেই-বা কী?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, যা বোঝার বুঝে নিল স্বামী। সাংঘাতিক রাগে চেঁচিয়ে উঠল সে, শয়তান! উট? কাঠের খোঁচা? তোর কোন নাগরে কামড়ে দিয়েছে, জলদি বল...কসম খেয়েছিলি না! এই তোর কসম খাওয়া! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!

মেঝেতে জোরে জোরে পা ঠুকল আমার স্বামী। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল সাতটা হাবশি গোলাম। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, কুৎসিত ভয়াবহ চেহারা। আমার স্বামীর নির্দেশে আমাকে মেঝেতে চিত করে শুইয়ে ফেলল ওরা। কোরবানীর দুম্বার মতো চেপে ধরল। একজন একটা তলোয়ার নিয়ে এল।

জোরে চেঁচিয়ে উঠল আমার স্বামী, কাট্! কাট্! কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল। কুকুর দিয়ে খাওয়া! আমার সঙ্গে বেইমানি।

আমার গলায় কোপ মারতে তলোয়ার তুলল হাবশিটা। কী ভেবে আঙুলের ইশারায় তাকে থামতে বলল স্বামী। আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোর কোনো সাধ আছে? মানে শেষ ইচ্ছে?

বললাম, না, কোনো সাধ নেই। তবে আমার কথা যদি একবার শুনতে। আসলে আমার কোনো দোষ নেই...

ধমক মেরে আমাকে থামিয়ে দিল স্বামী, হয়েছে! তোর ওই পাপমুখের কেচ্ছা আর আমি শুনতে চাই না। বেইমান...

মরিয়া হয়ে বললাম, খোদার কসম! আমি বেইমান নই। বিশ্বাস কর, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না...

টিটকারি মেরে বলল স্বামী, আহারে! কী আমার ভালোবাসারে! কেন, ওই লোকটাকে ভালোবাসিস না? যে কামড়ে গাল খুলে ফেলেছে?

জোর গলায় বললাম, না। ওকে আমি ঘৃণা করি। তোমাকে আমার সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছি। বুঝলে না তুমি। শুধু শুধু আমাকে দোষ দিচ্ছ। কেঁদে ফেললাম। আর আমার কোনো কথা নেই। তোমার যা খুশি করতে পার! তবে দুঃখ একটাই, বিনা দোষে আমাকে অপরাধী করে মৃত্যুদণ্ড দিলে!

আবার ধমকে উঠল স্বামী, থাক থাক, আর বুঝে কাজ নেই। বিনাদোষে! ঠিকই তো! বিনাদোষেই তো! বেশ্যাদের কাছে এ আর এমন কী দোষের...এই সাদ্, কাট্, কেটে ফেল!

স্বামীকে আর কিছু বললাম না। মনে মনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালাম : হে আল্লাহ, এই কি তোমার বিচার! পাপ হয়তো করেছি আমি, কিন্তু সে কি ইচ্ছে করে করেছি? তার কি ক্ষমা নেই?

দু'গাল বেয়ে অঝোরে পানি ঝরতে লাগল আমার। এই সময় কোপ মারার জন্য আবার তলোয়ার তুলল সাদ্। হঠাৎ পড়িমরি করে এসে ঘরে ঢুকল সেই শয়তান বুড়িটা। আমার স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, দোহাই তোমার, বাবা। মেয়েটাকে মেরো না। ছোটবেলায় তোমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে তোমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। সেই অধিকারে বলছি, তোমার দোহাই লাগে, বাবা, মেয়েটাকে ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! এবারের মতো মাপ করে দাও ওকে।

চুপ করে গেছে সাদ্। আদেশের জন্য তাকিয়ে আছে আমার স্বামীর মুখের দিকে। গুম মেরে গেছে স্বামী। কী যেন ভাবল একটুক্ষণ। তারপর বলল, শুধু তোমার কথায় ওকে প্রাণে মারলাম না আজ। তাই বলে ওকে নিয়ে ঘর করব না আর আমি। আর, আমার সঙ্গে বেইমানির জন্য কিছু শাস্তি ওকে পেতেই হবে।

সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিল স্বামী। আমার গায়ের সব কাপড়চোপড় খুলে একেবারে ন্যাংটা করে ফেলল। তারপর একটা লিকলিকে বেত নিয়ে সমানে পেটাতে শুরু করল। চামড়ায় কেটে বসে যাচ্ছে আঘাত। রক্ত বেরিয়ে আসছে কাটা জায়গা দিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলাম। শেষে আর সইতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে গেলাম।

হুঁশ ফিরল পরদিন সকালে। দেখলাম, নিজের বাড়িতে একটা ঘরে পড়ে আছি। রাতের বেলা কেউ রেখে গেছে। ওঠার চেষ্টা করলাম। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। নিজের অজান্তেই ককিয়ে উঠলাম। অনুভবেই বুঝলাম, পিঠের চামড়া কেটে ফালাফালা হয়ে গেছে বেতের আঘাতে।

অনেক মলম লাগিয়ে অনেক দাওয়াই খেয়ে ভালো হয়েছি, জাঁহাপনা...ঘা শুকিয়ে গেছে কিন্তু দাগগুলো আজও মিলায়নি। কোনোদিন মিলাবেও না। ওই দাগই আপনারা দেখেছিলেন...তারপর, ভালো হয়ে উঠে একদিন পায়ে পায়ে আমার স্বামীর বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। কৌতূহল, আর কিছু না। কিন্তু অবাক কাণ্ড! পৌঁছে দেখলাম বাড়িটা নেই! তার জায়গায় ইঁট-সুরকির পাহাড়। বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে যেন কোনো দানব! আশপাশে বাড়িগুলো সব ঠিকই আছে, ভেঙেছে শুধু ওই একটা বাড়ি। আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করলাম প্রতিবেশীদের কাছে। কেউ কোনো সঠিক জবাব দিতে পারল না। কেউ বলল, বাড়ি ভাঙার সময় মারা গেছে। কেউ বলল কোথায় জানি চলে গেছে। কাউকে কিছু বলে যায়নি। একেবারে

নিরুদ্দেশ। ভেবেছিলাম, তাকে পেলে পায়ে ধরেটরে মাপ চেয়ে, আবার ঠিক করে নেব সব। আশা বিফলে গেল।

ভাঙা মন নিয়ে ছোট সৎ বোনের কাছে চলে গেলাম। তাকে নিয়ে চলে এলাম বড় সৎ বোনের বাড়িতে। আমার দুঃখের কথা শুনে চোখ দিয়ে পানি ঝরল আপার। অনেক সান্ত্বনা দিল। বলল, দুঃখ করিস না, বোন। দুনিয়ায় একটা মানুষও দেখাতে পারবি না, যে সব দিক থেকে সুখী। সুখে-দুঃখেই মানুষের জীবন। নিয়তির লিখন খণ্ডানোর সাধ্য মানুষের নেই।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল আপা। তিন বোনে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।

এরপর আর বিয়ে করিনি আমরা কেউই। নিজেদের কাজকর্ম ভাগ করে নিয়েছি। আমি বাজার করি, রান্নাবাড়া আর খাবারের দায়িত্ব আমার ওপর। ঘর দেখাশোনার ভার ছোট বোনের ওপর। আর আপা, কর্ত্রী। তার নির্দেশেই চলে ও বাড়ির সব।

বেশ ছিলাম আমরা। কোনো পুরুষের সঙ্গ ছাড়াই চমৎকার কাটছিল দিন। ব্যতিক্রম ঘটল গতকাল। ওই কুলি যুবকটা এল, সুন্দর সুন্দর কথায় মন ভোলোল আমাদের। কাল সারাটা দিন হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে বেশ আনন্দে কেটেছে আমাদের। রাতের বেলা এল তিন কালান্দর ফকির। তারপর এলেন আপনারা... এ-ই আমার কাহিনী, জাঁহাপনা।

আমিনার কাহিনী শুনে খুব খুশি হলেন খলিফা।

জোবেদা আর আমিনার কাহিনী শেষ হল। ছোট বোন ফাহিমার জীবনে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।

জোবেদাকে জিজ্ঞেস করলেন খলিফা, তোমার বোনদের কুকুর বানিয়েছে যে জিন, তার ঠিকানা জানো?

জোবেদা জানাল, জানে না। তবে জিনের মাথার কয়েক গাছি চুল আছে তার কাছে। ওই চুল পোড়ালেই এসে হাজির হবে জিন।

খলিফার হুকুমে চুল পোড়ানো হল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দুলতে শুরু করল সমস্ত মহল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার থেমে গেল দুলুনি। দেখা গেল, দরবারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী হাবশি কিশোরী।

কিশোরীকে দেখিয়ে খলিফাকে বলল জোবেদা, জিন এসে গেছে, জাঁহাপনা।

এগিয়ে গিয়ে খলিফাকে সেলাম জানাল জিন।

জিনকে দোয়া করলেন খলিফা। তারপর বললেন, জোবেদার দুই বোনকে কুকুর বানিয়েছ কেন?

জিন বলল, একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল জোবেদা। তারই প্রতিদান হিসেবে, তার অনিষ্টকারী দুবোনকে কুকুর বানিয়ে দিয়েছি। আপনি হুকুম করলে অবশ্য আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিতে পারি ওদের।

খলিফা বললেন, আমার তো মনে হয় যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওদের। এবার মুক্তি পেতে পারে ওরা।

হাতজোড় করে জিন বলল, ঠিক আছে, জাঁহাপনা, তাই হবে। তবে তার আগে ছোট্ট একটা আর্জি আছে।

বলে ফেলার নির্দেশ দিলেন খলিফা।

জিন বলল, জাঁহাপনা, এই আমিনার কথা বলছি। ওর স্বামী আপনার খুব কাছাকাছিই থাকে। স্ত্রীর ওপর অন্যায় করেছে সে, অবিচার করেছে। তার বিচার করতে হবে।

খলিফা জানতে চাইলেন, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? জিন বলল, বললাম তো, আপনার খুব কাছেই থাকে। আপনার ছেলে, আল-আমিন।

স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো দরবার। কারো মুখে রা নেই। গম্ভীর হয়ে গেলেন খলিফা। নিস্তব্ধ দরবারে তাঁর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ বড় বেশি করেই কানে বাজল। বললেন, আমি তার বিচার করব।

জিনের নির্দেশে একটা পাত্রে করে পানি নিয়ে এল এক গোলাম। সেই পানিতে মন্ত্র পড়ে কুকুর দুটোর গায়ে ছিটিয়ে দিল জিন। চোখের পলকে আবার আগের চেহারা ফিরে পেল জোবেদার দুই বোন। অপরূপ রূপবতী দুই যুবতী। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল দরবারের লোকে।

খলিফার নির্দেশে আল-আমিনকে দরবারে ডেকে আনা হল।

বাদশাহ জেরা করতে লাগলেন তাকে। সব কথা স্বীকার করল আল-আমিন। সব কিছু না জেনে না শুনে আমিনার ওপর পৈশাচিক অত্যাচার করায় ছেলেকে দারুণ বকাঝকা করলেন খলিফা। তারপর মৌলভি ডেকে আনতে লোক পাঠালেন।

আমিনার সঙ্গে আবার নতুন করে বিয়ে পড়ানো হল আল-আমিনের।

জোবেদা আর বড় দুই বোনকে তিন কালান্দর ফকিরের সঙ্গে বিয়ে দিলেন খলিফা। তিন কালান্দরকে যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের দরবারে চাকরি দিলেন। বসবাসের জায়গা দিলেন।

খলিফার মহানুভবতায় অবাক হয়ে গেল দেশের লোক। ধন্য ধন্য করতে লাগল তারা।

গল্প শেষ করে শারিয়ারের দিকে তাকাল শাহরাজাদ। বলল, রাত তো এখনও অনেক বাকি, জাঁহাপনা। ভোর হতে দেরি আছে। তার আগে আরও গল্প শোনার ইচ্ছে আছে?

মুচকি হাসল শারিয়ার। বলল, এত ভণিতা করার কী দরকার? ভালো তো লাগছেই, নইলে রাতের পর রাত শুনছি কেন? বলে ফেল, আর কী গল্প জানা আছে তোমার।

আবার শুরু করল শাহরাজাদ :

তিনটি আপেল

এক সন্ধ্যায় উজির জাফর আল-বারমাকিকে ডেকে বললেন খলিফা হারুন অর-রশিদ, জাফর, আজ রাতে চল আবার বেরোই। শহরের ভিতরটা দেখব আজ। আমার কানে কিছু নালিশ এসেছে। নগরপাল আর ওয়ালিরা নাকি ঠিকমতো কাজ করছে না। ব্যাপারটা নিজে যাচাই করে দেখব।

মাসরুর আর জাফরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন খলিফা। এ গলি ও গলি ঘুরে শেষে এক সরু গলিতে এসে ঢুকলেন। দেখলেন, একটা জাল কাঁধে নিয়ে ক্লান্তভাবে পথ চলছে এক বুড়ো জেলে। মনের দুঃখ চাপা দিতে পারছে না। জোরে জোরেই নিজের কপালকে দোষ দিতে দিতে চলেছে সে : এত্তবড় শহরে কত মানুষ, কত টাকার ছড়াছড়ি। অথচ আমি হতভাগা সারাদিন খেটেও দুটো রুটি দিতে পারি না ছেলেমেয়েদের মুখে। কী কপাল নিয়ে যে জন্মালাম। খোদা, এই কি তোমার বিচার।

বুড়োর কাছে এগিয়ে গেলেন খলিফা। বুড়োকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কাজ কর, বাবা?

বুড়ো বলল, কী আর করব, মালিক, আমি জেলে। দরিয়ায় মাছ ধরি। যা পাই বাজারে এনে বেচি। অনেক বড় সংসার আমার, কোনোমতে আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছি। আজ সারাদিন জাল ফেললাম, এত রাত পর্যন্ত...একটা মাছও পেলাম না। ছেলেমেয়েগুলোর মুখে কী তুলে দেব? এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। খোদাকে কত বলি, আর কেন? এবার কোলে টেনে নাও...চোখ বুজে জ্বালা জুড়াই...

খলিফা বললেন, আমার একটা কথা শুনবে, বাবা? চল, আবার দরিয়ার পাড়ে চল। আরেকবার জাল ফেলবে আজ, মাত্র একবার। জালে যা ওঠে, কিনে নেব আমি। না উঠলেও তোমাকে একশো দিনার দেব। চল। আজ আমার কপাল পরীক্ষা হবে।

খুশি হয়ে উঠল জেলে। বলল, এ আর এমন কী কথা, মালিক, চলুন যাই।

নদীতে আবার জাল ফেলল জেলে। আস্তে আস্তে টান দিল জালে। আরে, বেজায় ভারি তো : কোনো বড় মাছ। সাবধানে জাল গুটিয়ে আনল জেলে। উপরে তুলল। ও-মা, এ কী! তালাবদ্ধ একটা ভারি বাক্স!

ওয়াদা মোতাবেক জেলের কাছ থেকে বাক্সটা নিয়ে একশো দিনার দিয়ে দিলেন খলিফা। খুশিতে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে চলল জেলে।

প্রাসাদে ফিরে এলেন খলিফা। ধরাধরি করে ভারি বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে জাফর আর মাসরুর। একটা বাতি নিয়ে এলেন খলিফা। তালাটা ভাঙল মাসরুর।

বাক্সের ডালা তুলতেই বাতির আলোয় কতকগুলো খেজুরপাতা দেখা গেল। পাতাগুলো সরিয়ে ফেলল জাফর আর মাসরুর। একটা কম্বল বেরোল। কম্বলের তলায় একটা বিছানার চাদর ভাঁজ করে ফেলে রাখা হয়েছে। টান মেরে চাদরটা তুলে আনল জাফর। তলায় কী আছে দেখে, শিউরে উঠল।

একটা মেয়ের খণ্ডিত লাশ। হাত-পা-মাথা কেটে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। ফেলে রাখা হয়েছে বাক্সের তলায়। বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। বাতি নিয়ে সরে এলেন খলিফা। রাগে গর্জন করে উঠলেন, জাফর, তোমরা সব কর কী? আমার রাজত্বে এই কাণ্ড! এভাবে মানুষ খুন। অথচ তোমরা আমাকে কী সব উল্টোপাল্টা বোঝাও—এমন ন্যায়বিচারের দেশ, শান্তির দেশ আর হয় না। শান্তির দেশের এই কি নমুনা! শোন জাফর, তিন দিন সময় দিলাম। এর মাঝে খুঁজে বের করতে হবে খুনিকে। নইলে তোমার প্রাণ যাবে বলে দিলাম। দরবারের সিংহদরজার পাল্লায় পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হবে তোমার শরীর। শুধু তোমাকে না, তোমার বংশ নির্বংশ করে ছাড়ব আমি। বংশের সব ক'জনকে ধরে এনে কোতল করাব...দেশের ভিতর এতবড় অনাচার! মানুষ খেতে পাচ্ছে না, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই আমার রাজত্বে...ছি ছি ছি, আমি আবার নিজেকে ন্যায়বিচারক মনে করি...আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব...যাও, জলদি যাও। খুনিকে খুঁজে বের কর।

মুখ কালো করে ঘরে ফিরে এল জাফর। এত বড় শহর। কে কোথায় কাকে খুন করেছে, কী করে খুঁজে বের করবে সে? তা-ও আবার তিন দিনের মধ্যে। সারাটা রাত ঘুম হল না আর জাফরের। বিছানায় গড়াগড়ি করেই কাটিয়ে দিল।

পরদিন ভোরে উঠেই বেরোল। সারাটা দিন অনেক রকমে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও খুনির কোনো হদিসই পেল না, খুনের কিনারা করা তো দূরে থাক। সাঁঝের বেলা ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে বাড়ি ফিরে এল।

রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে পরদিন আবার বেরোল। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। কোনো লাভ হল না। তারপর দিনও একই অবস্থা। কে খুন করেছে, জানা গেল না।

কেটে গেল তিন দিন। খুনের কিনারা করতে পারল না জাফর। প্রচণ্ড-খাটুনি, তার ওপর মানসিক চাপ, শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেল তার শরীর। দেখলে, চেনাই যায় না, এমন অবস্থা হয়েছে। চার দিনের দিন সকালে ভাঙা মন নিয়ে ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে দরবারে এসে ঢুকল সে। জানে, আজ তার প্রাণ যাবে। প্রাণ যাবে তার পরিবারের চল্লিশজন নারী-পুরুষ-শিশুর।

জাফরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন খলিফা, খুনিকে ধরতে পেরেছ?

জানে, মরতে হবে, আর অকারণে তোয়াজ করে কথা বলে কী লাভ? একটু নরম গলায়ই জবাব দিল জাফর, কোথায় পাব? সারা শহর খুঁজেছি, পাইনি।

সেধে তো আর এসে ধরা দেবে না খুনি। আমিও গোণা জানি না, যে গুণেই বলে দেব, কে খুনি।

জাফরের কথায় রেগে আগুন হয়ে গেলেন খলিফা। গর্জে উঠলেন, তোমাকে কোতল করব আমি! জল্লাদকে ডেকে বললেন, ঢোল পিটিয়ে দাও। লোককে জানিয়ে দাও, আজ অকর্মণ্য উজিরকে কোতল করা হবে। ফরমান জারি করে দাও, দেখতে ইচ্ছুক লোকেরা যেন দরবারের বাইরে এসে জমায়েত হয়।

খলিফার ফরমান শুনে একটুও খুশি হল না শহরের লোক। আহা আহা করতে লাগল তারা উজিরের জন্য। জাফরকে ভালোবাসে তারা। তাকে পছন্দ করে। পারতপক্ষে কারো ক্ষতি করেনি কখনও জাফর। লোকে বলাবলি করতে লাগল : আহা, বড় ভালো লোক ছিল...তার মতো ঈমানদার আজকের দিনে হয় না! কে জানে, কী এমন অপরাধ করল লোকটা...আমাদের খলিফাও খুব ভালো লোক, অকারণে এমন একটা কাজ কিছুতেই করতে পারেন না...এমনি সব কথাবার্তা আলোচনা চলছে শহরবাসীর মাঝে।

খলিফার দরবারের বাইরে সারা শহর যেন ভেঙে পড়ল। উজির জাফরের মৃত্যুদণ্ড হবে, স্বপ্নেও ভাবেনি তারা কোনোদিন। মানুষের চোখে পানি। এদের অনেকেই উজিরের কাছে কোনো না কোনোভাবে ঋণী, উপকার পেয়েছে।

কোতলের সব আয়োজন শেষ। ঝকঝকে ধারাল তলোয়ার নিয়ে জল্লাদ খাড়া। ধরে ধরে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হল জাফরকে। খলিফার হুকুমের অপেক্ষা শুধু। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ যাবে জাফরের। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে শহরবাসী...এই সময় জনতার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল এক যুবক। দু'হাতে ভিড় ঠেলে সরিয়ে খলিফার কাছে এসে দাঁড়াল। সেলাম জানিয়ে বলল, আপনি খলিফা, ন্যায়বিচারক। উজিরকে কোতলের আদেশ দিয়ে অযথা অন্যায়ের বোঝা মাথায় তুলে নেবেন না, জাঁহাপনা। একটু অপেক্ষা করুন। আমার একটা আর্জি আছে, বলার অনুমতি দিন।

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন খলিফা, কী আর্জি?

হাতজোড় করে বলল যুবক, উজিরের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ তুলে নিন। তার বদলে আমাকে কোতল করুন। আমিই খুনি। আমিই ওই মহিলাকে খুন করেছি।

গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে।

এই সময় জনতার মাঝখান থেকে আবার শোনা গেল চিৎকার। এবারে ভিড় ঠেলে খলিফার সামনে এগিয়ে এল এক বৃদ্ধ। কাছে এসে সেলাম জানিয়ে বলল, জাঁহাপনা, এই ছেলেটার কথা সব মিথ্যে। আসলে মেয়েটাকে খুন করেছি আমি। আমাকেই শাস্তি দিন।

চেঁচিয়ে উঠল যুবক, মিথ্যে কথা হুজুর! এঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি খুন করেছি, আমাকে শাস্তি দিন!

মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন খলিফা। এ তো মাথা খারাপ করে দেবে! গর্জে উঠে হুকুম দিলেন তিনি, এই দুটোকে কোতল কর, এই জল্লাদ...

এগিয়ে এল উজির জাফর। হাতজোড় করে বলল, এমন কাজও করবেন না, জাঁহাপনা। কে অপরাধ করেছে, জানি না আমরা। দুজনে একসাথে করে থাকতে পারে, যে কোনো একজনে করতে পারে, আবার এদের কেউ খুনি না-ও হতে পারে। আমাকে ভালোবাসে, আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের কাঁধে দোষ তুলে নিতে পারে। দুজনের কথা ভালো করে শুনুন আগে।

বৃদ্ধ এবং যুবকের দিকে তাকিয়ে ধমক লাগালেন খলিফা, ঠিক করে বল, কে খুন করেছ। নইলে দুজনেরই বংশ নির্বংশ করে ছাড়ব আমি।

যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল বৃদ্ধ, বাবা, তোমার বয়েস কম। দুনিয়া দেখতে এখনও অনেক বাকি আছে। আমার এক পা কবরে। আমাকেই মরতে দাও...

চেঁচিয়ে উঠল যুবক, না না, বাবা, আমার জন্য তুমি কেন...

হাত তুলল জাফর। বলল, ব্যস ব্যস, আর বলতে হবে না। কে খুন করছ, বুঝে গেছি। যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, তা বাবা, কেন এ-কাজ করলে তুমি, খুলে বল তো।

এক অদ্ভুত করুণ কাহিনী বলে গেল যুবক :

জাঁহাপনা, এই যে বৃদ্ধ ইনি আমার শ্বশুর। তাই আমার জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছেন।

অনেক দিন আগে ইনার মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম আমি। তারপর থেকে বিবির সঙ্গে ঘর করেছি, কত সুখ দেখেছি, কত দুঃখ। সুখের দিনে যেমনি হাসিমুখে থেকেছে বিবি, দুঃখের দিনেও তার সে-হাসি বিন্দুমাত্র মলিন হয়নি। আমাকে কোনোদিন এতটুকু কষ্ট দেয়নি সে। এমন বৌকে ভালো না বেসে কি পারা যায়?

একে একে তিনটি সন্তানের মা হল আমার বিবি। তারপর একদিন আমাদের সংসারে নেমে এল দুঃখের কালো ছায়া। অসুখে পড়ল বিবি। কঠিন অসুখ। কত ওষুধ, কত বড়ি খাওয়ালাম। কত কবিরাজ কত হকিম দেখালাম! কিছুতেই কিছু হল না। অসুখ সারল না তার। দিনকে দিন আরও বেড়েই চলল। একেবারে কাহিল হয়ে গেল বেচারি। মুখে রুচি বলতে কিচ্ছু রইল না। কোনো খাবারেই তার রুচি নেই।

কত সাধাসাধি করি খাবার নিয়ে, খায় না বিবি। রুচিই নেই, খাবে কী? দুঃখে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসত আমার। কিন্তু কী করব? জোর করে কিছু খাওয়াতে গেলে বমি করে ফেলে দেয়। এই সময়ই একদিন বলল সে, আপেল খেতে ইচ্ছে করছে। শুনে, খুশিতে আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। ভাবলাম : যাক, এতদিনে অন্তত একটা জিনিসে তার রুচি হয়েছে। তখনি বাজারে রওনা হলাম।

জাঁহাপনা, তখন আপেলের মরশুম নয়। বাজারে আপেল নেই। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পরে যা-ও ইচ্ছে করে একটা জিনিস খেতে চাইল, আমি হতভাগা সে-জিনিস খুঁজে পেলাম না। মনের দুঃখে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি

ফিরে এলাম। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, আপেল পাওয়া যায়নি। এটা ওটা নানা কথা বলে আপেলের কথা তাকে ভুলিয়ে রাখলাম।

রাতে শুয়ে শুয়ে ঠিক করলাম, পরদিন ভোরে উঠেই সোজা কোনো আপেল বাগিচায় চলে যাব। অকালের এক-আধটা ফল যদি পাওয়া যায়, কিনে নিয়ে আসব। তুলে দেব বিবির মুখে।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। শহরের কাছাকাছি যতগুলো আপেল বাগান আছে, সবগুলোতে ঘুরলাম। কত খোঁজাখুঁজি করলাম, একটাও আপেল পেলাম না। হতাশ হয়ে ফিরে আসতে যাব, এক ছোট্ট বাগানের বুড়ো মালিক জানতে চাইল, এত হন্যে হয়ে আপেল খুঁজছি কেন আমি। তাকে সব জানালাম। শুনে ব্যথিত হল লোকটি। আমাকে জানাল, এ তল্লাটে তো এ সময় আপেল পাওয়া যাবে না। পরামর্শ দিল বস্‌রাহ্‌র বাজারে গিয়ে খুঁজে দেখতে। অনেক বড় বাজার। দূর-দূরান্ত থেকে পণ্য আসে। হয়তো আপেল পাওয়া যেতে পারে।

বস্‌রাহ্ অনেক দূর, তবু ঠিক করলাম ওখানেই যাব। গেলামও। কপাল নিতান্তই খারাপ, তাই পেলাম আপেল। এক দোকানে মাত্র তিনটে আপেলই ছিল। অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। খুশিতে ফেটে পড়ছে মন।

বাড়ি ফিরেই কিন্তু আবার মন খারাপ হয়ে গেল। কয়েকদিন বিবির জ্বর একটু কম ছিল, সেদিন আবার বেড়েছে। আপেল তিনটি একপাশে সরিয়ে রেখে তার বিছানায় পাশে বসে রইলাম। কয়েকদিন আপেলের খোঁজে থাকায়, দোকানে বসতে পারিনি। বস্‌রাহ্ থেকে ফেরার পরদিনও দোকানে যাওয়া হল না আমার।

তার পরদিন বিবির জ্বর একটু কমল। একটা আপেল কেটে নিজের হাতে বৌকে খাওয়ালাম। খেলো সে। কী যে দারুণ খুশি লেগেছিল জাঁহাপনা, কী বলব! বাকি দুটো আপেল তার মাথার কাছে রেখে বেরোলাম আমি। আল্লাহর নাম নিয়ে দোকান খুলে বসলাম।

বেচাকেনা বেশ ভালোই চলছে। গত কয়েকদিনের ক্ষতি এক দিনেই পুষিয়ে যাবে যেন। দুপুরে আর বাড়ি গেলাম না। দোকানেই খাওয়া-দাওয়া সারলাম।

দুপুরের পর আবার গদিতে বসেছি, এই সময় দোকানের সামনে দিয়ে চলল এক নিগ্রো যুবক। হাতে একটা অকালের আপেল, দু'হাতে আপেলটা লোফালুফি করতে করতে এগিয়ে চলেছে সে।

বাগদাদে আপেল! অথচ এর জন্য আমাকে বস্‌রাহ্ যেতে হয়েছিল। কৌতূহল হল। নিগ্রোকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, ও ভাই, শুনছ? একটু এদিকে এস তো।

দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল নিগ্রো যুবক। জিজ্ঞেস করলাম, এ আপেল তুমি কোথায় পেলে, ভাই? আপেল খুঁজতে খুঁজতে জান আমার কাবার...

হেসে বলল নিগ্রো, আমার জানের-জান পরাণের পরাণ দিয়েছে।

অবাক হলাম। জানতে চাইলাম, কে ওর প্রেমিকা?

বেশ গর্ব করেই বলল নিগ্রো, এই যে, সওদাগর পাড়ার জাফরানি রঙের বাড়িটা! সেই বাড়ির মালকিন আমাকে প্রাণ দিয়ে পেয়ার করে। বেটা সওদাগরকে কখনও দেখিনি। তবে জানি একটা গাধা, আহাম্মক। আস্ত বৌ-পাগলা। শুনলাম, বিমারি বৌ খেতে চেয়েছে, তাই পনেরো দিন হেঁটে বস্‌রাহ্ থেকে গিয়ে তিনটে আপেল এনেছে গাধাটা। বেটার বাড়িতে গিয়েছিলাম আজ। বৌটা বলল, বেটা দোকানে গেছে। দুটো আপেল দেখলাম মেয়েলোকটার বিছানায়। আমাকে একটা খেতে দিল সে...এই যে, এটা।

বোঁ করে ঘুরে উঠল আমার মাথা। নিমেষে দুনিয়াটা মিথ্যে হলে গেল। একবিন্দু বিশ্বাস কি নেই আল্লাহর দুনিয়ার কোথাও? কী করে যে বাড়ি ফিরে গেলাম, বলতে পারব না, জাঁহাপনা।

সোজা চলে গেলাম বিবির বিছানার পাশে। ঠিকই, দুটো আপেলের একটা অবশিষ্ট আছে। কোনো কিছু ভাবলাম না আর। ছুরি বের করেই বসিয়ে দিলাম ঘুমন্ত স্ত্রীর বুকে।

রোগে এমনিতেই কাহিল হয়ে ছিল বিবি। বেশি নড়াচড়া করতে পারল না। একটা কাতর আর্তনাদ করেই চিরদিনের মতো দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

রাগ তখনও কমেনি আমার। ছুরি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করলাম স্ত্রীর লাশটা। হঠাৎই মনে পড়ল, এই অবস্থায় কেউ দেখে ফেললে মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে আমার। তাড়াতাড়ি একটা বাক্স নিয়ে এলাম। কাটা টুকরোগুলো ভরে ফেললাম। ওপরটা খেজুরপাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে তালা বন্ধ করে দিলাম বাক্সের। তালা বন্ধ করে বাক্সটা রাতের বেলা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম দরিয়ার পানিতে।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, ঘুম ভেঙে বসে কাঁদছে বড় ছেলেটা। জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছে কেন? বলল, মায়ের জন্য তার মন কেমন করছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, তার মা কোথায়? বললাম, জাহান্নামে।

জাহান্নাম কোথায়, জানে না ছেলেটা, বোঝার বয়সই হয়নি। কাঁদতে কাঁদতে বলল, জাহান্নামে চলে গেল, আপেল খেয়ে যেতে পারল না। আগে জানলে কি আর আপেল চুরি করি...

চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী বললি...

কাঁদতে কাঁদতেই বলল ছেলেটা, তুমি রাগ কোরো না, আব্বাজান। মায়ের বিছানায় দুটো আপেল দেখে খেতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব। একটা চুরি করলাম। বাড়িতে খেলে যদি কেউ দেখে ফেলে তাই নিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে, পথে। এক নিগ্রো যাচ্ছিল তখন পথ দিয়ে। আমার হাত থেকে আপেলটা কেড়ে নিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল সে। কত কষ্ট করে বস্‌রাহ্ থেকে আপেল এনেছ তুমি, কত করে এ-সব কথা বললাম নিগ্রোকে, কানই দিল না...

আমার কানে আর কোনো কথা ঢুকছে না তখন। ঝড় বইছে মাথার ভিতর। নিজের চুল নিজে টেনে ছিঁড়তে লাগলাম। বুঝতে পারলাম, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে

নিগ্রো শয়তানটা। তার কথা শুনে খুন চড়ে গিয়েছিল মাথায়। বিবিকে জিজ্ঞেস করার কথাও মনে হয়নি। নিষ্পাপ মহিলাকে খুন করলাম আমি।

পাঁচ দিন হল, বিবিকে খুন করেছি আমি, জাঁহাপনা। আমাকে শাস্তি দিন। কোতল করুন। তাতেও যদি আমার বিবির আত্মা কিছুটা শান্তি পায়। ঘোরতর জাহান্নামি আমি, জাঁহাপনা, আমাকে শাস্তি দিন...শাস্তি দিন...ডুকরে কেঁদে উঠল যুবক।

স্তব্ধ বিস্ময়ে বোবা হয়ে যুবকের কথা শুনলেন খলিফা। যুবকের কাহিনী শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ কথা ফুটল না তাঁর মুখে। তারপর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, জাফর, জলদি ধরে নিয়ে এস সেই নিগ্রো হারামজাদাকে। ব্যাটাকে কোতল করব আমি। যাও, জলদি যাও...আর হ্যাঁ, শোন...যদি নিগ্রোকে ধরে আনতে না পার, তোমাকে কোতল করব। মনে থাকে যেন। যাও, জলদি।

খুনিকে ধরতে না পেরে একবার মরতে যাচ্ছিল জাফর! যুবক এগিয়ে এসে দোষ স্বীকার করে উজিরকে বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু এক বিপদ থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই আবার নতুন বিপদ। এতবড় শহর থেকে আবার একজন লোককে খুঁজে বের করতে হবে, নইলে প্রাণ যাবে। হাজার হাজার নিগ্রো যুবক রয়েছে বাগদাদে। আসামিকে কী করে খুঁজে পাবে উজির? মুখ ভার করে আবার রাতের বেলা বাড়ি ফিরে এল সে।

এবারেও তিনদিনের সময় দিয়েছেন খলিফা। উজির ঠিক করল, তিনদিন বাড়ি থেকেই বেরোবে না। অহেতুক কষ্ট করে লাভ নেই। নিগ্রোকে খুঁজে বের করতে পারবে না। তিনদিন পর খলিফার দরবারে ফিরে যাবে, খালি হাতে। যা হয় হোক। হোক মৃত্যুদণ্ড। পরোয়া করে না সে আর।

পরদিন সকাল হতেই কাজিকে ডেকে পাঠাল উজির। তার সয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজনদের কাকে কিভাবে দিয়ে যাবে, তার একটা ফিরিস্তি বানাল। কাজিকে সাক্ষী রেখে ফিরিস্তির তলায় নিজের নাম সই করল। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করল। বিদায় নিল সবার কাছে। মাপ-টাপ চাইল। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনটা দিন।

চারদিনের দিন সকালে খলিফার দরবারে যাবার জন্য তৈরি হল উজির। সারা বাড়িতে শোকের কালো ছায়া। সবাই জানে, তাদের প্রিয় লোকটি আর কোনোদিন এ বাড়িতে ফিরবে না।

ছলছল চোখে আপনজনদের কাছ থেকে বিদায় নিল উজির। বেরিয়ে যাবে, এই সময় কাঁদতে কাঁদতে এসে তার জামার খুঁট খামচে ধরল ছোট মেয়েটা।

মেয়েকে কোলে তুলে নিল উজির। চুমু খেয়ে আদল করল। সান্ত্বনা দিতে লাগল। হঠাৎ বুকের কাছে একটা কিছুর চাপ অনুভব করল উজির, কঠিন গোল কিছু। মেয়েটার জামার পকেটে রয়েছে জিনিসটা। কৌতূহল হল উজিরের। মেয়ের জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল ওটা। একটা আপেল। শুকিয়ে গেছে। পচন ধরছে জায়গায় জায়গায়। বছরের এই অসময়ে আপেলটা এল কোথা থেকে। অবাক হল উজির। আপেলটা কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করল মেয়েকে।

মেয়ে জানাল, দিন চারেক আগে তাদের নিগ্রো চাকর রায়হান কোথা থেকে এনে দিয়েছে আপেলটা।

নিগ্রো এবং আপেল দুটো শব্দ মগজে ঝড় তুলল উজিরের। যার জন্য আজ মরতে চলেছে, সে তার বাড়িতেই রয়েছে। তারই চাকর! সঙ্গে সঙ্গে রায়হানকে ডেকে পাঠাল সে।

রায়হান এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল উজিরের সামনে। মাথা নিচু করে বলল, আমাকে ডেকেছেন মালিক?

উজির বলল, হ্যাঁ। তারপর আপেলটা দেখিয়ে বলল, এই আপেল তুমি কোথায় পেয়েছ?

মাথা নিচু করেই রেখেছে রায়হান। বলল, সওদাগর পড়ায় একটা ছেলের কাছ থেকে কেড়ে এনেছিলাম। মা-মণিকে দেয়ার জন্য। আমার ভুল হয়ে গেছে, মালিক, আমাকে মাপ করে দিন। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল রায়হান। মনিবের পা জড়িয়ে ধরল।

সমস্যায় পড়ে গেল উজির। সাংঘাতিক সমস্যা। রায়হানকে ভালোবাসে সে, প্রভুভক্ত চাকর। সুলতানের দরবারে নিয়ে গেলে মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে। আবার না নিয়ে গেলে নিজেই মরবে। কোনটা করবে সে?

ভাবনায় পড়ে গেল উজির। অনেক ভেবে উঠতে বলল রায়হানকে। বলল, ঠিক আছে, চল তুই আমার সঙ্গে। দেখি কী করা যায়।

রায়হানকে নিয়ে খলিফার দরবারে এসে হাজির হল উজির। নিগ্রো চাকরকে দেখিয়ে বলল, জাঁহাপনা, এই সেই নিগ্রো। এরই জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে সওদাগর যুবকের বিবিকে।

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন খলিফা। বললেন, দেখলে উজির, অতি সামান্য ভুলের জন্য কী দণ্ড পেতে হয় মানুষকে!

হাতজোড় করে বলল উজির, জাঁহাপনা, জানি, রায়হানকে কোতল করার আদেশ দেবেন আপনি। অতি তুচ্ছ কারণে প্রাণ দিতে হবে বেচারাকে। তবে এতে অবাক হবার কিছুই নেই। এর চেয়ে তুচ্ছ ঘটনায়ও অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় মানুষের।

অবাক হয়ে বললেন খলিফা, এর চেয়ে তুচ্ছ ঘটনা!

উজির বলল, হ্যাঁ। কেন, আপনি নূর-আল-দিন আর তার ভাই সামস আল-দিনের কাহিনী শোনেননি?

মাথা নেড়ে বললেন খলিফা, কই, না-তো! তুমি জান? শোনাও তাহলে।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল উজির। পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখল একবার। হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে আছে রায়হান। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। থরথর করে কাঁপছে বেচারা নিগ্রো। মনে মনে একবার আল্লাহকে ডাকল উজির। তারপর খলিফার দিকে ফিরে কাহিনী শুরু করল :

নূর আল-দিন আলি এবং তার ছেলে

এক সময়ে মিশরে এক সুলতান প্রজাপালন করতেন। খুব ধার্মিক লোক ছিলেন তিনি। দয়ালু বলেও খ্যাতি ছিল তাঁর।

এই সুলতানের এক উজির ছিল, নানা বিদ্যায় বিশারদ। উজিরের ছিল দুই যমজ ছেলে। বড় ছেলের নাম সামস আল-দিন মোহাম্মদ। রূপে গুণে তার জুড়ি ছিল না ও তল্লাটে। ছোট ছেলেটির নাম নূর-আল-দিন আলি। গুণ তো বটেই, রূপও ছিল তার বড় ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি। সে পথে বেরোলে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকত লোকে।

উজির বাপের সঙ্গে সুলতানের দরবারে যায় দুই ভাই, দরবারের আদব-কায়দা কাজ-কর্ম শেখে। বাপের কাজ দেখতে দেখতে শিখে নিল তারা। এই সময় একদিন দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিল উজির।

উজিরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন সুলতান। তারপর দুই ভাইকে ডেকে উজিরের পদে বহাল করলেন। প্রথা অনুসারে নানারকম দামি উপহার দিয়ে সম্মান জানালেন নতুন দুই উজিরকে।

বাপের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মাস শোক পালন করল দুই ভাই। তারপর সেজেগুজে তৈরি হয়ে একদিন এল দরবারে। উজিরের আসনে গিয়ে বসল।

চমৎকারভাবে যার যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে দুই ভাই। সুলতান খুশি, প্রজারাও খুশি। আমির-উমরাহ-অমাত্য-পারিষদ সবাই খুশি।

একদিনের কথা। সকাল বেলা সেজেগুজে ঘোড়ায় চড়ে দরবারে চলেছে দুই ভাই। নানা কথা বলতে বলতে পাশাপাশি চলেছে তারা। এক সময় বড় ভাই বলল, এবার বিয়ে-টিয়ে করা দরকার। সুলতানের দরবারে পাকা চাকরি হয়েছে আমাদের। খাওয়া-পরার কোনো ভাবনা নেই। আমাদের বয়সও হয়েছে। এটাই বিয়ের উপযুক্ত সময়। নইলে বাচ্চাকাচ্চাদের ঠিকমতো মানুষ করে যেতে পারব না। কী বল তুমি, নূর?

বড় ভাইয়ের কথায় সায় দিয়ে বলল নূর, ঠিকই বলছ, ভাই। তবে আমার ইচ্ছে, দুজনে একদিনেই বিয়ে করব।

হেসে বলল সামস, খুব খুশির কথা...আচ্ছা, নূর, ধর একই সঙ্গে দুটো বাচ্চা হল আমাদের। ধর, আমার মেয়ে হল, আর তোমার হল ছেলে। তাহলে তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কী, রাজি?

ছোট ভাই বলল, এতে রাজি না থাকার কী আছে? খুব ভালো প্রস্তাব। তাহলে এখনি ওদের বিয়ে পাকাপাকি করে ফেলা যাক, কী বল? আচ্ছা, তোমার মেয়ের দেনমোহর কত হবে? আর দিতে-থুতে হবে কী?

একটু ভেবে নিয়ে বলল বড় ভাই, বেশি না। এই ধর, তিন হাজার সোনার মোহর। আর দিতে হবে তিনটি খামার। গোটা তিনেক গ্রামও জায়গির দিতে হবে অবশ্য। এরচেয়ে বেশি আর চাওয়া উচিত হবে না, কী বল? হাজার হোক, তোমার ছেলে আর আমার ছেলে তো একই কথা।

মুখ কালো করে ছোট ভাই বলল, তোমার কথাবার্তায় কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না, ভাই। দুই ভাইয়ের ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে, তার মধ্যে এত দর কষাকষি কেন? যৌতুক নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? চামার সুদখোরদের মতো কথা বলছ তুমি, ভাই।

খেপে গেল বড় ভাই। চেঁচিয়ে বলল, কী এত বড় কথা! আমি চামার? সুদখোর...যাও, দেব না বিয়ে। তোমার ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেব না। ফেলনা মেয়ে মনে করেছ!

খেপে গেল নূর আল-দিনও। সমান তেজে বলল, না দাও, নেই। তোমার মেয়েকে ছেলের বৌ করাতে বয়েই গেছে আমার। দেশে যেন আর মেয়ে নেই। ঠ্যাং ভেঙে ঘরে ফেলে রাখব ছেলেকে তবু তোমার মেয়েকে বিয়ে করাব না...ইস্, কী আমার মেয়েওয়ালারে...!

আরও রেগে গেল সামস আল-দিন। বলল, কী-ই, বড় ভাইয়ের সঙ্গে এই ব্যবহার! ঠিক আছে, চল যাই দরবারে। আজ সুলতানকে দিয়ে যদি এর বিচার না করিয়েছি তো আমার নাম সামস আল-দিন নয়...

রেগে বলল নূর আল-দিন, তাহলে দরবারেই যাব না আমি। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করেছি, দরবারের লোক শুনবে...এ মুখই দেখাব না দরবারে...এই আমি বাড়ি ফিরে চললাম...সত্যি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল নূর আল-দিন। বাড়ি ফিরে এল সে।

দরবারে এল বড় ভাই। পথ পেরিয়ে আসতে সময় লাগল, আস্তে আস্তে রাগ পড়ে গেছে সামস আল-দিনের। বিয়েই করেনি এখনও ওরা, ছেলেমেয়ের বিয়ে নিয়ে কী কাণ্ডই-না করে ফেলল। নামী সুলতানের উজির হয়ে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এমন বোকার মতো কাণ্ড করছে, ভেবে, লজ্জায় কান লাল হয়ে উঠল তার। সুলতানের কাছে ভাইয়ের নামে নালিশ জানিয়ে লোকের হাসির খোরাক হল না আর সে।

সুলতানের কাছে মিথ্যে কথা বলল সামস : নূরের অসুখ করেছে, তাই দরবারে হাজির হতে পারেনি।

সুলতান জানাল, সেদিন আর দরবারের কাজ হবে না। তিনি গিজায় যাবেন। উজিরকে অবশ্যই সঙ্গে যেতে হবে। লোকজন সঙ্গে নিয়ে নীল নদের ধারে এলেন সুলতান। তাঁর সঙ্গে একই বজরায় উঠল সামস আল-দিন। সুলতানের সঙ্গে গিজার পিরামিড দেখতে চলল।

সারাটা দিন গুম হয়ে রইল নূর আল-দিন। রাতটাও ছটফট করে কাটাল, ভালো ঘুম হল না! সামান্য ব্যাপার নিয়ে বড় ভাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল! মনটা বিষিয়ে গেছে তার। ঠিক করল, আর দেশেই থাকবে না। নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

নফরকে ডেকে, ছাই রঙের প্রিয় খচ্চরটায় জিন লাগানোর হুকুম দিল নূর আল-দিন। দারুণ দেখতে খচ্চরটা। সোনার কাজ করা মখমলের গদি বিছানো হল ওটার পিঠে। দামি জিন পরাল। বাদশাহি কেতায় সাজাল জানোয়ারটাকে নফর।

শুধু একটা দামি গালিচা আর একটা কম্বল সঙ্গে নিল নূর আল-দিন। খচ্চরের পিঠে চাপল। নফরটাকে বলল, আমি চললাম রে। এদেশে আর থাকব না।

নফর জানতে চাইল, কোথায় যাবেন, হুজুর?

নূর আল-দিন জানাল, আগে কালিয়ুবে যাব। সেখান থেকে যাব যেদিকে খুশি। খোলা হাওয়ায় দিলটা সাফা করব। তোকে বলে যাচ্ছি, আমার ভাই আর আত্মীয়স্বজনদের বলে দিস, আমার খোঁজ-খবর যেন না করে। ফিরিয়ে আনতে না যায়। আমি আসব না। তা ছাড়া ক'দিন একটু একা থাকতে চাই। এই শহরের নোংরামি আর কুটিলতার বাইরে থাকতে চাই কিছুদিন।

রওনা হয়ে গেল নূর আল-দিন। কায়রো ছাড়াল। দুপুর বেলা পৌঁছল বিলবায়েস শহরে।

খচ্চরটার বিশ্রাম দরকার। নিজেরও খুব খিদে পেয়েছে নূর আল-দিনের। একটা সরাইয়ের সামনে এসে থামল। খচ্চরটাকে চরে খেতে ছেড়ে দিয়ে নিজে ঢুকল ভিতরে। কিছু খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। ঢুকল গিয়ে শহরের ভিতরে। টুকিটাকি কিছু দরকারি জিনিস কিনল।

আবার শুরু হল যাত্রা। সাদিয়াহ শহরে এসে পৌঁছল সাঁঝের পর। আগের শহরে কেনা খাবার বের করে খেয়ে নিল নূর আল-দিন। তারপর বালিতে গালিচা বিছাল। উপরে খোলা আকাশ। খচ্চরের পিঠের গদিটা খুলে মাথার তলায় রেখে শুয়ে পড়ল। রাগ এখনও পড়েনি তার। তাই শহরের ভিতরে কোনো সরাইখানায় গিয়ে রাত কাটাল না। লোকজনের মেলামেশা এখনও সইতে পারছে না সে।

ভোর হতেই আবার রওনা হয়ে পড়ল নূর আল-দিন। জেরুজালেমে এসে পৌঁছল। কিন্তু থামল না। শহর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। চলছে তো চলছেই। শেষে আলেপ্পোতে এসে থামল। একটানা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। এখানে তিন দিন বিশ্রাম নিল। খচ্চরটাও বিশ্রাম পেল। তারপর আবার নেমে এল পথে।

চলতে চলতে, চলতে চলতে বসরায় গিয়ে পৌঁছল নূর। রাত নেমেছে তখন। গাঢ় অন্ধকার রাত। অচেনা জায়গা। যেখানে সেখানে রাত কাটানো উচিত না। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে একটা সরাইখানার সন্ধান জেনে নিল সে। খচ্চরটাকে আস্তাবলে পাঠিয়ে দিয়ে সরাইখানার ভিতরে ঢুকল নূর।

পরদিন ভোরে আস্তাবল থেকে খচ্চরটাকে বের করে হাঁটাচলা করাতে লাগল সহিস। সরাইখানার পাশেই বসরার উজিরের বাড়ি। উপর তলায় এক ঘরে জানালার পাশে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন উজির। এই সময় খচ্চরটা চোখে পড়ল তাঁর। চমৎকার জানোয়ার। সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ হয়ে গেল উজিরের। এমন জানোয়ার সচরাচর চোখে পড়ে না। চাকরকে ডাকলেন। সহিসকে ডেকে আনার হুকুম দিলেন।

উজিরের হুকুম। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল সহিস। কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

উজির জিজ্ঞেস করলেন, খচ্চরটা কার?

সহিস বলল, একজন নওজোয়ানের, মালিক। গতরাতে এসেছে সরাইখানায়। পুরুষের এমন রূপ জীবনে দেখিনি আমি। আপনমনেই বললেন উজির, তাই নাকি! কী যেন ভাবলেন। তারপর চাকরকে ঘোড়া সাজানোর হুকুম দিলেন।

সহিসকে নিয়ে সরাইখানায় চলে এলেন উজির। নূর আল-দিনের সঙ্গে দেখা করলেন।

পরিচয় পেয়ে উজিরকে সেলাম জানাল নূর।

উজির জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি, বাবা? কোথা থেকে এসেছ? এ শহরে কী মনে করে?

বিনয়ের সঙ্গে জানাল নূর, আমি কায়রোর বাসিন্দা। বাবা ওখানকার উজির ছিলেন। দেশ দেখতে বেরিয়েছি আমি। ঘুরে বেড়াব দেশ-দেশান্তরে। ঠিক করেছি, পৃথিবীর সমস্ত নামকরা দেশ না দেখে বাড়ি ফিরে যাব না।

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রবীণ বিচক্ষণ উজির। মনে হয়, কিছু একটা হয়েছে তোমার, বাবা। সংসারের প্রতি বিদ্বেষ জন্মেছে কোনো কারণে। তবে যা-ই হয়ে থাকুক, কাজটা ভুল করছ...চলো, আমার বাড়িতে। আমার মেহমান হয়ে। এখানে এই সরাইখানায় পড়ে থাকার কোনো দরকার নেই।

জোর করেই নূর আল-দিনকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে তুললেন উজির। সবচেয়ে ভালো ঘরটায় থাকার জায়গা করে দিলেন মেহমানের। একসঙ্গে বসে দামি খাবার খেলেন। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করে নূর আল-দিনের সমস্ত কথা জেনে নিলেন বুদ্ধিমান উজির।

নূর আল-দিনের কথাবার্তা আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন তিনি। ভালোবেসে ফেললেন ছেলেটাকে। প্রস্তাব দিলেন, বাবা, আমার কোনো ছেলে নেই। কিন্তু একেবারে নিঃসন্তান নই আমি। আল্লাহ আমাকে এক মেয়ে দিয়েছেন। বাপ হয়ে নিজের মেয়ের গুণগান করা ঠিক হবে না। তবে না বলেও পারছি না, রূপেগুণে আমার মেয়ের জুড়ি খুব কমই আছে। তাকে তোমার অপছন্দ হবে না। তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?

হ্যাঁ-না কিছু বলল না নূর। ভাবছে।

আবার বললেন উজির, আমার প্রস্তাবে রাজি হলে বসরার সুলতানের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে। আমার ভাইপো বলে পরিচয় দেব। আমার জায়গায় উজির হিসেবে

তোমাকে বহাল করার অনুরোধ জানাব সুলতানকে। আমি জানি, আমার কথা ফেলতে পারবেন না সুলতান। তোমাকে আমার জায়গায় বসিয়ে কাজ থেকে বিরতি নেব। আল্লাহর এবাদতে মশগুল হব।

উজিরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল নূর আল-দিন।

খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন উজির। হাঁক-ডাক শুরু করলেন। দেরি করতে রাজি নন তিনি। চাকর-বাকর লোকজনকে ডেকে তখনি বিয়ের আসর সাজানোর হুকুম দিলেন।

বসরার উজিরের মেয়ের বিয়ে, সোজা কথা নয়। দেখতে দেখতে সাজিয়ে ফেলা হল বিরাট বৈঠকখানা। উজিরের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে লোক ছুটে গেল দিকে দিকে। দাওয়াত করে এল শহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোককে।

মেহমানদের কাছে পাত্রের পরিচয় দিলেন উজির, নূর আমার ভাই-পো। আমার ভাই মিশরের উজির ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে। ছোটছেলের জন্মের পর আল্লাহ আমাকে মেয়ে দেন। ভাইয়ের সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই আমার। এদিকে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। এখন ভাই তার ছোট ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। বলে পাঠিয়েছেন, নূরের কাছে বিয়ে দিতে হবে আমার মেয়েকে। আমার কোনো আপত্তি নেই এতে। নূর আল-দিন খুবই ভালো ছেলে। আপনাদের কী মনে হয়, কাজটা কি ভালো করছি?

সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, উজির ঠিক কাজই করছেন।

বিয়ে পড়ানোর জন্য কাজিকে অনুরোধ করলেন উজির।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল নূর আল-দিনের সঙ্গে উজিরের মেয়ের। খাওয়া-দাওয়াও শেষ হল। সাঁঝ পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। রাত বাড়ছে। বর-কনেকে দোয়া করে একে একে বিদায় নিল মেহমানেরা।

উপরের ঘরে বাসর সাজানো হয়েছে। সইয়েরা হাসিঠাট্টা করতে করতে বাসর ঘরে নিয়ে গেল কনেকে।

নূরকে বললেন উজির, যাও বাবা, উপরে যাও।

পায়ে হাত দিয়ে শ্বশুরকে সেলাম করল নূর। তারপর বাসরঘরে চলল।

বর-কনেকে একলা ঘরে রেখে চলে গেল কনের সইয়েরা।

রঙিন ওড়নায় মাথা ঢেকে ফুলের বিছানায় বসে আছে কনে। এগিয়ে গিয়ে ওড়না খুলল নূর। আস্তে করে খুলল সদ্য বিয়ে-করা বিবির মুখের নেকাব। ইয়া আল্লাহ! এ তো মানবী নয়! বেহেশতের কোনো হুরি যেন! অপরূপ সাজে সেজে ফুলের বিছানায় বসে আছে যেন ফুলের রানী।

কালো বিশাল আয়ত দুই চোখ মেলে স্বামীর দিকে তাকাল উজিরের মেয়ে। চোখের পলক পড়ছে না তারও। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে অপরূপ সুন্দর স্বামীর দিকে।

রাত বাড়ছে। বাতাসে ফুলের সুবাস। বিছানা থেকে নামল উজিরের মেয়ে। ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত গেলাসে ঢেলে এনে তুলে দিল স্বামীর হাতে। দুই ঢোকে শেষ করে ফেলল নূর। গ্লাসটা নামিয়ে রেখেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল বিবিকে। একটানে নিয়ে এসে ফেলল বুকের ওপর। মুখ নামাল। ঠাণ্ডা শরবত পান করেও বুকের পিয়াস এতটুকু মেটেনি। শরবতে মিটবেও না এই পিয়াস।

মুখ তুলল রূপসী। স্বামীর তৃষ্ণার্ত দুই ঠোঁটের মাঝে গুঁজে দিল নিজের কুসুম কোমল ঠোঁট।

আরও বাড়ছে রাত। বাইরে গভীর অন্ধকার। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে সঙ্গীতের মূর্ছনা। দূরে রবাব বাজাচ্ছে কেউ। অপূর্ব হাত! প্রেমিকার উদ্দেশে প্রেম নিবেদন করছে কোনো বেদুইন যুবক। সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে গলে গলে পড়ছে যেন গভীর প্রেম। এই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। ঝড় উঠবেই প্রেমিকার বুকে।

ঝড় উঠল সদ্য বিবাহিত বর-কনের বুকেও।

ওদিকে পিরামিড-দেখা শেষ করে প্রাসাদে ফিরে এলেন মিশরের সুলতান। সামস আল-দিন নিজের বাড়িতে ফিরে এল। বাড়িতে সবার মুখ বেজার।

সামস আল-দিনকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নূর আল-দিনের খাস চাকর।

সামস আর-দিন জিজ্ঞেস করল, কী রে, কাঁদছিস কেন? নূর কোথায়?

কাঁদতে কাঁদতেই বলল চাকরটা, সেজন্যই তো কাঁদছি, মালিক। সেদিন দরবারে না গিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ছোট হুজুর। গুম হয়ে বসে থাকলেন সারাদিন। খেলেনও না। তারপর আমাকে হুকুম দিলেন খচ্চর বার করতে, জিন পরাতে। বার করলাম, জিনও পরালাম। একটা মস্ত কম্বল নিয়ে খচ্চরের পিঠে বসে চলে গেলেন ছোট হুজুর।

শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল সামস, কোথায় গেছে? বলে গেছে কিছু?

চাকরটা বলল, না, তেমন কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন, বাইরের খোলা হাওয়ায় দম নিতে যাচ্ছেন। কালিবের পথে চলে গেছেন তিনি।

ভাইয়ের শোকে ভেঙে পড়েছে সামস আল-দিন। মহা অপরাধী মনে হতে লাগল নিজেকে। অনুতাপে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। ছি ছি, সে করেছে কী! ছোট ভাইকে এমন খারাপ গালাগাল করতে পারল! খুবই শান্ত মেজাজের ছেলে নূর। বড় ভাইয়ের কথায় নিশ্চয়ই মনে খুব আঘাত পেয়েছে। নইলে এমন করে দেশান্তরী হত না। ঠিক করল সামস, ভাইকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু সেজন্য সুলতানের সাহায্য দরকার।

বাধ্য হয়ে সব কথা সুলতানকে খুলে বলল সামস। সব শুনে তিনিও খুব দুঃখ পেলেন মনে।

দিকে দিকে সুলতানের দূত ছুটল নূর আল-দিনের খোঁজে। অনেক দেশ অনেক শহর খুঁজল তারা। কিন্তু বসরাহ্‌য় যাবার কথা কারো মনে এল না। তারা ধরেই নিল, এত দূরে যায়নি নূর আল-দিন। কাজেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হল সবাইকে।

দূতের ব্যর্থতার খবর পেয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সামস আল-দিন। বুক আর কপাল চাপড়াতে লাগল সে। বিলাপ করতে লাগল, হায়-হায়, এ আমি কী করলাম! নিজের দোষে এমন সোনার টুকরো ভাইকে হারালাম! দেশান্তরী করলাম তাকে! আমি পাপী, মহাপাপী। মায়ের পেটের ভাইয়ের মনে এমন দুঃখ দিতে পারলাম।

দিন গেলে ছেলে হারানোর শোক ভুলে যায় লোকে, আর এ তো ভাই হারানোর ব্যথা। খুব বেশিদিন লাগল না, নূর আল-দিনের শোক আস্তে আস্তে ভুলে গেল সামস-দিন। নিয়মিত দরবারে যেতে লাগল। এই সময় ঘটক আসা-যাওয়া করতে লাগল তার কাছে। সবাই সুন্দরী সুন্দরী মেয়ের বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে। বিয়ের বয়স হয়েছে। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। দিনক্ষণ দেখে কায়রোর এক সম্ভ্রান্ত সওদাগরের অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করল সামস আল-দিন, সংসারী হল।

নিয়তির কী অদ্ভুত যোগাযোগ! যেদিন, যখন নূর আল-দিন উজিরের মেয়েকে বিয়ে করল, ঠিক সেই দিন সেই সময়েই বিয়ে করল সামস আল-দিনও। আরও অদ্ভুত যোগ, একই রাতে অন্তঃসত্ত্বা হল দুই ভাইয়ের দুই বিবি।

মেয়ে বিয়ে দেয়ার পরের দিন নূর আল-দিনকে নিয়ে সুলতানের দরবারে গেলেন উজির।

দরবারের কায়দা-কানুন ভালোই জানা আছে নূর আল-দিনের। শাহী কায়দায় সুলতানকে সেলাম জানাল।

খুব খুশি হলেন সুলতান। উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কে?

উজির বললেন, জাঁহাপনা, ও আমার ভাইপো। এখন আমার জামাই।

ভুরু কুঁচকে বললেন সুলতান। আপনার ভাইপো! কই, আপনার কোনো ভাই ছিলেন বলেন তো শুনিনি কখনও।

উজির বললেন, শোনেননি, কারণ, আমার ভাই বসরাহয় কোনোদিনই ছিলেন না। আজীবন ছিলেন কায়রোয়। ওখানকার সুলতানের উজির ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে। বাপের জায়গায় বড় ছেলেকে বহাল করেছেন ওখানকার সুলতান। ছোট ছেলে এই নূর আল-দিন। ভাইকে কথা দিয়েছিলাম নূরের সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দেব। কথামতো ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

সুলতান বললেন, বেশ করেছেন। খুব ভালো জামাই পেয়েছেন। আল্লাহ মেয়েজামাইকে সুখে রাখুন।

উজির বললেন, জাঁহাপনা, মেহেরবান। একটা আরজি নিয়ে এসেছি হুজুরের কাছে।

সুলতান জানতে চাইলেন, কী আরজি?

সবিনয়ে বললেন উজির, জাঁহাপনা, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। কানে কম শুনি, চোখে ভালো দেখি না। দরবারের প্রচণ্ড খাটুনি সইবার ক্ষমতা হারিয়েছে শরীর। এই পদে এখন নতুন লোক যদি বহাল করেন, তো খুব ভালো হয়।

মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সুলতান, আপনি ঠিকই বলেছেন। তা তেমন লোক কোথায় পাই?

উজির বলল, সেজন্য ভাবনা নেই, এই নূর আল-দিনকেই উজির পদে বহাল করে নিন। বয়সে তরুণ, কর্মঠ, মাথাটাও ঠাণ্ডা। বহুদিন উজিরের কাজ করেছি। আমার কাজটা কে করতে পারবে, ভালোই বুঝতে পারি।

গম্ভীর মুখে মাথা দোলালেন সুলতান। কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে। আপনার বিচক্ষণতার ওপর আমার গভীর বিশ্বাস আছে। আপনার জামাইকেই উজিরের পদে বহাল করলাম। কাজকর্ম বুঝিয়ে দিন ওকে।

হাজার সুচের কারুকাজ করা উজিরের পোশাক দেয়া হল নূর আল-দিনকে। দেয়া হল সুন্দর ঘোড়া, দেহরক্ষী, গোলাম-বাঁদি।

কাজকর্ম আর শেখাবে কী, নূর আল-দিন তো উজিরের কাজ করেছেই, ভালোই জানা আছে তার সবকিছু। উজিরকে শেখাতে হল না কিছু, নিজে নিজেই যা যা করার করে গেল নূর। দেখেশুনে সুলতান আর দরবারের অন্যান্য লোকেরা তো থ। খুব খুশি হলেন সুলতান। বুঝলেন, এ ছেলেকে উজিরের দায়িত্ব দিয়ে ভুল করেননি।

সুলতানকে সেলাম জানিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরে এলেন উজির। সুখবর জানালেন মেয়েকে।

দিন যায়। রোজ নিয়মিত দরবারে যায় নূর আল-দিন। আমির-ওমরাহরা তার বিচারবুদ্ধি দেখে অবাক, সুলতান মুগ্ধ। নতুন উজিরের বেতন আরও বাড়িয়ে দিলেন তিনি, দেহরক্ষী, দাসদাসীর পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিলেন। দ্রুত সম্পদ বাড়তে লাগল নূর আল-দিনের, সেই সঙ্গে ক্ষমতা। খুব সুখেই দিন কাটছে তার।

দেখতে দেখতে কেটে গেল সময়। ছেলে হল উজিরের মেয়ের। ভীষণ খুশি বৃদ্ধ উজির। বাড়িতে খুশির বান বয়ে গেল। সাত দিন সাত রাত ধরে চলল উৎসব। চাঁদের মতো ফুটফুটে ছেলে। জ্যোৎস্না রাতে ছেলের ঘরের চারপাশে পরীদের ভিড় লেগে যায়। ঠেলাঠেলি করে খোলা জানালার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পরীরা, নূর আল-দিনের ছেলেকে দেখে চোখ জুড়ায়। উজির ছেলের নাম রাখলেন : হাসান বদর আল-দিন।

দিন দিন বড় হচ্ছে ছেলে। ছেলে তো নয়, চাঁদ যেন পূর্ণতা পাচ্ছে ধীরে ধীরে। দিনরাত নাতিকে নিয়েই মেতে থাকেন বৃদ্ধ উজির। আল্লাহর কাছে হাত তুলে শুকরিয়া জানান। এ জগতে তাঁর আর কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নেই।

বদর আল-দিনের চার বছর বয়স। এই সময় একদিন আল্লাহর তরফ থেকে ডাক এল, দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন বৃদ্ধ উজির। শোকে আকুল হল বসরার লোকেরা। একজন প্রিয় বন্ধু হারিয়েছে তারা।

দরবার থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিল নূর আল-দিন। শ্বশুরের কোনো ছেলে নেই, তাঁর কাজ তো তাকেই শেষ করতে হবে। চোখের পানিতে বুক ভাসাতে ভাসাতে কাজ শেষ করল নূর আল-দিন।

দিন যায়। আবার কাজে মন দিয়েছে নূর আল-দিন। হাসানও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। এবার তার শিক্ষাদীক্ষা দরকার। ব্যবস্থা করল নূর। হাসানের ওস্তাদ নিযুক্ত হলেন বসরার সবচেয়ে বড় মৌলানা।

লেখাপড়ার দিকে ভীষণ ঝোঁক হাসানের। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে লাগল সে।

ভালো ছাত্র পেয়ে ওস্তাদও খুব খুশি। নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে খুলে দিলেন ছাত্রের কাছে।

শুধু ধর্মশিক্ষাই নয়, হাসান শিখল কাব্য, ইতিহাস, আইন আর অন্যান্য শাস্ত্র।

দশ বছর কেটে গেল। এই সময়ই নূর আল-দিনকে বললেন মৌলানা, আমার আর কিছু শেখানোর নেই নূর। আমার যা বিদ্যে ছিল, সব শিখে নিয়েছে তোমার ছেলে।

খুব খুশি হয়ে মৌলানাকে দামি পোশাক, একটা সেরা খচ্চর আর এক হাজার সোনার মোহর উপহার দিল নূর আল-দিন। কাজ থেকে বিরতি নিলেন মৌলানা।

নূর আল-দিন ঠিক করল, ছেলেকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাবে।

ভালো দিন দেখে হামামে গোসল করানো হল হাসানকে। দামি জামাকাপড় পরে, আতর মেখে, চোখে সুরমা টেনে তৈরি হয়ে এল হাসান। একটা দামি ঘোড়ায় চেপে বাপের সঙ্গে সুলতানের দরবারে চলল সে।

এর আগে এভাবে আর কখনও বসরার পথে বেরোয়নি হাসান। লোকজন থমকে দাঁড়াল। ভিড় লেগে গেল পথের দুপাশে। সবাই বলাবলি করছে, ইয়া আল্লাহ, এত খুবসুরত! এ মানুষ, নাকি চাঁদ নেমে এল আসমান থেকে!

বাপের সঙ্গে দরবারে ঢুকল হাসান। নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল দরবারের গুঞ্জন। হাঁ করে হাসানের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। সুলতানও বোবা হয়ে গেছেন যেন। আলোয় ভরে গেছে যেন পুরো দরবার ঘরটা।

অনেকক্ষণ পর কথা বেরোল সুলতানের মুখ দিয়ে। নূর আল-দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটা কে?

সবিনয়ে বলল নূর আল-দিন, জাঁহাপনা, আমার ছেলে, হাসান বদর আল-দিন।

হাততালি দিতে লাগলেন সুলতান। তোমার ছেলে! বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো...নূর, হাসানকে রোজ আমার দরবারে নিয়ে আসবে। দেখেই ওকে ভালোবেসে ফেলেছি। আর ওকে না দেখে থাকতে পারব না।

মাথা কাত করে বলল নূর আল-দিন, তাই হবে, জাঁহাপনা।

এরপর থেকে রোজ বাপের সঙ্গে সুলতানের দরবারে যায় হাসান। তাকে আদর করে নিজের পাশে বসিয়ে রাখেন সুলতান। দেখেশুনে দরবারের কাজকর্ম শেখে হাসান। শুধু তার রূপই নয়, গুণেও মুগ্ধ হয়ে পড়েছে সবাই।

সুখেই কাটছিল দিন, কিন্তু হঠাৎই একদিন অসুখে পড়ল নূর আল-দিন। কঠিন অসুখ। বড় বড় হকিমদের ডাক পড়ল। অনেক দাওয়াই দিল তারা। হচ্ছে না কিছু। হকিমরা সবাই বৈঠক বসল। মোটা মোটা বই ঘাঁটল। অনেক ভেবেচিন্তে অনেক

বিচার-বিবেচনা করে আবার দাওয়াই দিল। কিন্তু কিচ্ছু হল না। অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে নূর আল-দিনের। হাল ছেড়ে দিল হকিমরা। একে একে তল্পি গোটাল তারা। যাবার সময় বলে গেল, আমাদের শেষ আমরা দেখেছি, আর কিছুই করার নেই। এবার আল্লাহ ভরসা।

যা বোঝার বুঝে নিল নূর আল-দিন। ছেলেকে কাছে ডেকে বলল, বাবা, আমার ডাক এসেছে। এবার যেতে হবে। তোমাদের সাধ্যমতো তোমরা করেছ। আমার সময় ফুরিয়েছে, তাই কিছু করতে পারলে না।

কেঁদে ফেলল হাসান।

ছেলের মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিল নূর আল-দিন, কেঁদো না বাবা। এই সংসারে তো কেউ চিরকাল থাকে না। একদিন সবাইকে যেতে হবে। একটা কথা আমরা সবাই ভুলে যাই। দুনিয়াকে নিজেদের চিরবাসস্থান ধরে নিয়ে সেভাবেই বাস করতে থাকি। আসলে তো তা নয়। পথ চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য যেমন কোনো সরাইখানায় উঠি আমরা, এই দুনিয়াটাও তেমন এক সরাইখানা। এই সংসারের সরাইখানায় সুখ-তাপ-দুঃখ যা পাবার, সব পাবে। তারপর একদিন পৌঁছে যাবে আসল বাড়িতে, সেই তাঁর কাছে। তাঁর কাছে একেবার যেতে পারলে, আর কোনো দুঃখ নেই। একেবারে চিরশান্তি। না কেঁদে, প্রাণ ভরে খোদাকে ডাক বাবা, যেন তাঁর কাছেই যেতে পারি আমি এই প্রার্থনাই কোরো।

একটানা অনেক কথা বলে হাঁফ ধরে গেছে নূর আল-দিনের। চুপ করল সে। তারপর আবার বলল, দুনিয়ায় আমার যা করণীয়, নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছি, শুধু একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। সেটা করে যাবার ক্ষমতা আর আমার নেই। তার ভার দিয়ে গেলাম তোমার ওপর। কী কাজ, শোন এখন। মন দিয়ে শুনবে...তোমার এক চাচা আছে, আমার বড় ভাই। নাম সামস আল-দিন। কায়রোয় থাকে, ওখানকার সুলতানের উজির। আমিও কিছুদিন উজিরের কাজ করেছি ওই দরবারে। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করলাম একদিন। রাগ করে তার পরদিনই দেশ ছাড়লাম।

দম নেবার জন্য থামল একটু নূর আল-দিন। তারপর বলল, কাগজ-কলম নিয়ে এস।

কাগজ-কলম নিয়ে এল হাসান।

নূর আল-দিন বলল, আমি যা বলব, সব লিখে নাও। কিচ্ছু বাদ দেবে না।

বাপ যা যা বলল, লিখে নিতে লাগল হাসান। একে একে বলে গেল নূর আল-দিন : বসরায় কবে এসেছে, কবে বিয়ে করেছে, কবে বসরার সুলতানের উজির হয়েছে, কবে জন্মেছে হাসান, ইত্যাদি সব ঘটনার সন তারিখসহ বিস্তারিত বিবরণ। তারপর নিজের বাড়িঘর কোথায় আছে, ঠিকানা দিল নূর আল-দিন। নিজের আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে বলে, সেসব ঠিকানা লিখতে বলল হাসানকে। সব শেষে বলল, আমি মারা গেলে, কায়রোতে, নিজের দেশে যাবে একবার তুমি। তোমার

চাচার সঙ্গে দেখা করবে। এ জীবনে তো তার সঙ্গে আর দেখা হল না আমার। বোলো, আমাকে যেন মাপ করে দেয় সে।

হাসানকে কাঁদতে মানা করেছে, কিন্তু এখন নিজেই কেঁদে ফেলল নূর আল-দিন। দু'গাল বেয়ে পানির ধারা নামল। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না হাসান। বাপের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

নিজেদের সামলাতে অনেক সময় লাগল দুজনেরই।

চোখের পানি মুছে নিয়ে হাসানকে জিজ্ঞেস করল নূর আল-দিন, সব ঠিকঠাক মতো লিখেছ তো, বাবা?

ঘাড় নেড়ে জানাল হাসান, লিখেছে।

পড়ে শোনাতে বলল নূর আল-দিন।

পড়ে শোনাল হাসান।

নূর আল-দিন বলল, হ্যাঁ সব ঠিক আছে। হাসানের হাত থেকে কাগজ নিয়ে তার তলায় সই দিল। হাসানের হাতে ফিরিয়ে দিল আবার। সইয়ের তলায় বাপের সিলমোহর এঁকে দিল হাসান। কাগজটা সুন্দর করে ভাঁজ করে মোম-কাপড় দিয়ে পেঁচাল। সহজে নষ্ট হবে না আর দলিলটা। নিজের পোশাকের পকেটে কাগজটা ভরে পকেটের মুখ সেলাই করে রাখল। আর হারানোর ভয় নেই।

আর একটা দিন মাত্র বাঁচল নূর আল-দিন। চিরবিদায় নিল তারপরই। শোকের কালো ছায়া নামল বসরায়। আরেকজন প্রিয় উজিরকে হারাল বসরাবাসীরা।

খাটিয়ায় শুয়ে গোরস্থানে চলল নূর আল-দিনের লাশ। পিছনে হাজারো জনতার মিছিল। সবারই চোখে পানি, মুখ কালো। গুম হয়ে বসে রইলেন সুলতান। তাঁর মনে হল নিজের ডান হাতটা খসে পড়ে গেছে।

শাহী মর্যাদায় দাফন করা হল নূর আল-দিনের লাশ। শোকের সাগরে ভাসতে ভাসতে যার যার ঘরে ফিরে গেল বসরাবাসীরা। হাসানও ফিরল। কাঁদছে না আর সে। বাপের শেষ কথাগুলো বার বার মনে বাজছে : একদিন সবাইকে যেতে হবে...একবার তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলে আর কোনো দুঃখ নেই,...

চুপ করে ঘরে বসে থাকে হাসান। কারো সঙ্গে কথা বলে না। খাওয়ার ঠিক নেই, ঘুমের ঠিক নেই, শুধু বসে বসে ভাবে। সুলতানের দরবারেও যায় না আর।

দিন কাটে এভাবেই। দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল। গেল আরও এক মাস। হাসানকে দেখতে না পেয়ে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠেছেন সুলতান। নূর আল-দিন নেই, কোনো উজির নেই দরবারে। উজির ছাড়া চলে না। হাসানকেই বাপের পদটা দেবেন ঠিক করলেন সুলতান। লোক পাঠালেন একদিন হাসানের বাড়িতে।

সুলতানের হুকুম হাসানের কাছে পৌঁছল ঠিকই, কিন্তু গুরুত্ব দিল না সে। একথা গিয়ে দরবারে সুলতানের কাছে জানাল দূত।

ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নিলেন সুলতান, ভুল বুঝলেন। বিরক্ত তো হলেনই, রেগেও গেলেন হাসানের ওপর। তাঁর হুকুম অমান্য করল একটা পুঁচকে ছেলে, সহ্য করতে পারলেন না তিনি। সেদিনই দরবারের একজন বিশিষ্ট আমিরকে উজিরের পদে বহাল করলেন। হাসানের সমস্ত সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দিলেন। তারপর লোক পাঠালেন হাসানকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসার জন্য। হুকুম অমান্য করার শাস্তি পেতে হবে তাকে।

হাসানের এক ভক্ত গোলাম ছিল এই সময় দরবারে। সে তাড়াতাড়ি দরবার থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে খবর দিল হাসানকে।

চমকে উঠল হাসান। এই ধরনের বিপদ হতে পারে, কল্পনাও করেনি সে। দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। গোলামকে বলল, জলদি আমাকে কিছু খাবার আর দিনার এনে দাও।

হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল গোলাম, সে সময় নেই, হুজুর। আপনি জলদি পালান। ওই বুঝি ওরা এসে পড়ল! বলেই আর দাঁড়াল না সে, পালাল ওখান থেকে।

হাসানও বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। এ-গলি ও-গলি ধরে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে চলে গেল গোরস্থানের দিকে। শহর থেকে বেরোনোর আগে বাপের কবরটা শেষবারের মতো দেখে নিতে চায়।

ছুটে এসে কবরের উপর আছড়ে পড়ল হাসান। হুহু কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সাঁঝ হয়ে এসেছে তখন। এই সময় কবরের পাশ দিয়ে চলেছে এক সওদাগর। এই শহরেরই বাসিন্দা। পাশের গাঁয়ে কী একটা কাজ ছিল, সেরে এখন বাড়ি ফিরছে। অবেলায় কবরের উপর পড়ে এক যুবককে কাঁদতে দেখে কৌতূহল হল তার। এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে।

পিছন থেকে হাসানকে ডাক দিল সওদাগর, তুমি কে, বাবা? উজিরের কবরে পড়ে কাঁদছ কেন?

চমকে মুখ তুলে ফিরে তাকাল হাসান।

সওদাগর বলে উঠল, আরে, তুমি! এখানে, এই সময়ে?

সওদাগরকে চিনতে পারল না হাসান। জানতে চাইল, আপনি?

পরিচয় দিল সওদাগর, নাম বললে তো চিনতে পারবে না। তবে আমি তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম। আমাকে খুব ভালোবাসতেন উজির।

হাঁপ ছেড়ে বলল হাসান, ও...বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, চাচা। স্বপ্নে দেখলাম আব্বাজানকে। বলছেন : বাবা, এখনই ভুলে গেলি আমাকে। ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম কবরের কাছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সওদাগর, ভালো করেছ, বাবা। আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হল। দুয়েকদিনের ভিতরই তোমার ওখানে যেতাম। একটা কাজ আছে।

একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল হাসান, আমার কাছে কাজ!

মাথা দুলিয়ে বলল সওদাগর, হ্যাঁ। আমি একজন ব্যবসায়ী। তুমি জানো কিনা জানি না, তোমার বাপের একটা জাহাজ আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বসরার বন্দরে এসে ভিড়বে জাহাজটা। তোমার বাপের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, ওই জাহাজের সব মাল আমার কাছে বেচবেন। তিনি নেই, তবে চুক্তির কথা ভুলিনি আমি। ইচ্ছে করলে মালগুলো সব আমাকে দিয়ে দিতে পার। আর তার জন্য এক হাজার দিনার আগাম দিতেও রাজি আছি আমি।

চাঁদ হাতে পেল যেন হাসান। তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, একটা দিরহাম সঙ্গে নিতে পারেনি। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভিক্ষে ছাড়া খাওয়ার উপায় ছিল না। এই সময় নিতান্ত অযাচিতভাবে এক হাজার দিনার পেয়ে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল হাসান।

কোমরের থলি থেকে হাজার দিনার বের করে হাসানের হাতে তুলে দিল সওদাগর। একটা রশিদ লিখিয়ে নিয়ে চলে গেল। আল্লাহকে বারবার শুকরিয়া জানাতে লাগল হাসান। সারাদিন পেটে তেমন কিছু পড়েনি, তার ওপর সাংঘাতিক উত্তেজনা গেছে। ক্লান্তিতে দুচোখ মুদে এল হাসানের। বাপের কবরে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

চাঁদ উঠল। হলুদ জ্যোৎস্নার বান ডাকল। ঘুরতে বেরোল জিন-পরীর দল।

হাসানের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক পরী। হঠাৎ নিচের দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল। নিজের মনেই বলে উঠল, ইয়া-আল্লা! এত খুবসুরত! খোদা নিজে হাতে ধরে বানিয়েছে যেন! ঘুমিয়ে আছে, এখনি এত সুন্দর। জাগলে কেমন হবে! নিজের অজান্তেই চলা থেমে গেছে পরীর। এক জায়গায় স্থির হয়ে ভাসছে। এক নজরে তাকিয়ে দেখছে হাসানের ঘুমন্ত মুখ।

উল্টো দিক থেকে এই সময় উড়ে এল এক জিন। পরীকে এক জায়গায় ভাসতে দেখে কাছে এসে থামল। সেলাম জানাল।

জিনের সেলামের জবাব দিল পরী। জিজ্ঞেস করল, কোন দিক থেকে আসছ, ভাই?

জিন জবাব দিল, কায়রো থেকে।

জানতে চাইল পরী, ওখানকার খবর সব ভালো তো?

জিন জানাল, ভালোই। তোমাদের এদিককার খবর কী?

পরী বলল, ভালোই।

জিন জিজ্ঞেস করল, তা এমন তন্ময় হয়ে কী দেখছিলে?

আঙুল তুলে নিচে দেখাল পরী। বলল, এমন খুবসুরত আদম এর আগে কখনও দেখেছ?

নিচের দিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিল জিন। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। তবে কায়রোতে এক মেয়ে দেখে এসেছি, উজির সামস

আল-দিনের মেয়ে। ওই মেয়ের তুলনায় এ ছেলেকে তেমন সুন্দর বলা যাবে না। জানো, ওই রূপই হয়েছে মেয়েটার কাল। উজির বড় বিপদে পড়েছে।

পরী জানতে চাইল, বিপদ?

ঠোঁট উল্টে বলল জিন, আর কী? সুন্দরী মেয়ে হলে সাধারণত যা হয়! লোকের মুখে মুখে ফেরে ওই মেয়ের রূপের খ্যাতি। কী করে জানি কথাটা গেছে কায়রোর সুলতানের কানে। ব্যস, অমনি প্রস্তাব পাঠিয়ে দিল সুলতান। ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।

কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল পরী, তারপর?

জিন বলল, ছুটতে ছুটতে দরবারে গিয়ে হাজির সামস আল-দিন। হাতজোড় করে বলল, জাঁহাপনা, আমাকে মাপ করুন। আপনার তো জানাই আছে, আমাদের দুই ভাইয়ের ছেলেমেয়ের বিয়ে নিয়ে রাগ করেই নূর দেশ ছেড়েছে। তাকে আজো ভুলতে পারিনি আমি। তা ছাড়া, আঠারো বছর আগে, যেদিন আমার মেয়ে হল, আল্লার নামে শপথ করেছিলাম, মেয়েকে নূরের ছেলের কাছেই বিয়ে দেব। হুজুর, আপনিই বলুন, আল্লার নামে নেয়া শপথ কী করে ভাঙি? জাঁহাপনা, রাগ করবেন না। এদেশে সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই। দেখেশুনে তাদেরই একজনকে বিয়ে করুন।

আগ্রহ বেড়ে গেছে পরীর। জানতে চাইল, তারপর? তারপর কী হল?

জিন বলল, উজিরের অনুরোধ কানেই তুলল না সুলতান। উল্টে খেপে গিয়ে বলল: কী-ই, আমার মুখের ওপর কথা! আমি তোমার মেয়ের যোগ্য বর নই! বেতমিজ উজির, এতবড় সাহস তোমার! তোমাকে মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের সম্মান দিতে চাইছিলাম, ভালো লাগল না। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি মজা। এ দেশের সবচেয়ে কুচ্ছিত বরের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে। আমি বিয়ে দেব। দেখি, কে ঠেকাতে পারে! রাগে কাঁপতে লাগল সুলতান। দরবারে বসেই উজিরের মেয়ের বর ঠিক করে দিল। সুলতানের আস্তাবলে একটা কুঁজো সহিস আছে। এত কুচ্ছিত চেহারা জীবনে দেখিনি আমি। তার ওপর বেঁটে। দেখলেই বমি আসে, বলে ওয়াক থুহ করে থুতু ফেলল জিন।

উত্তেজনায় জিনের কাছে সরে এল পরী, তারপর? বিয়ে হল...বল না ভাই, জলদি!

জিন বলল, হয়নি এখনও, তবে হবে। দেখে এলাম, আস্তাবলের বাইরে অন্যান্য সহিস আর গোলামরা মিলে গোসল করাচ্ছে কুঁজোটাকে। নোংরা কথা বলে ঠাট্টা করছে।

পরী বলল, আহা, মেয়েটার নিশ্চয় বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার মুখে তার রূপের যা প্রশংসা শুনলাম। ইস্, ওই ছেলেটার সঙ্গে যদি তার বিয়ে হত, তাহলে খুব মানাত।

পরীর কথায় গম্ভীর হয়ে গেল জিন। কী যেন ভাবছে। তারপর হঠাৎই বলে উঠল, আচ্ছা, বোন, এক কাজ করলেই তো পারি। একে নিয়ে গিয়ে ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিই-না কেন আমরা। কুঁজোকে তো ঠেকাতে পারি আমরা ইচ্ছে করলে। পারি না?

খুশি হয়ে উঠল পরী, ঠিক! ঠিক বলেছ তুমি, ভাই। পারি। চলো, একে তুলে নিয়ে কায়রোয় যাই আমরা। উজিরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে পড়িয়ে দিই।

জিন বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, চল। তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। চল যাই।

শাঁ করে নিচে নেমে এল জিন-পরী। হাসানের মুখের উপর নিজের ডান হাত দুলিয়ে আনল একবার পরী। আরও গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল হাসান। আলগোছে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে উড়াল দিল জিন। পরীও চলল তার পিছু পিছু।

জিন-পরীর ব্যাপার। বসরা থেকে কায়রো যত দূরের পথই হোক, ওদের কাছে সেটা সামান্য সময়ের ব্যাপার। দেখতে দেখতে কায়রোয় পৌঁছে গেল ওরা।

সুলতানের বাড়ির সামনে একটা শ্বেতপাথরের বেদি আছে। তার উপর এসে হাসানকে নামিয়ে রাখল জিন। এগিয়ে এসে তার মুখের উপর আবার হাত নাড়ল পরী।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল হাসান। সামনে জিন-পরীকে দেখে হকচকিয়ে গেল। আশপাশে তাকাল ভয়ে ভয়ে। তাজ্জব হয়ে গেল। লাফ দিয়ে উঠে বসল। এ কী! এ কোথায় সে। বাপের কবর কোথায়। সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল এক বলিষ্ঠ পুরুষ। বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে কুচকুচে কালো দাড়ি। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেল সে।

তাড়াতাড়ি হাত তুলে চেঁচাতে নিষেধ করল জিন। হেসে বলল, তোমার কোনো ভয় নেই, বাবা। আমি জিন, কিন্তু মুসলমান। তোমাকে কায়রোয় নিয়ে এসেছি মহৎ উদ্দেশ্যেই। তোমার কোনো ক্ষতি করব না আমরা।

আস্তে করে জানতে চাইল হাসান, কেন এনেছেন?

জিন বলল, বলছি, শোনো। মন দিয়ে শুনবে। ওই যে দেখো, ওই যে মিছিলটা আসছে, ওটা বিয়ের মিছিল। বর এক বেঁটে কুঁজো। তোমাকে ভালো জামাকাপড় পরিয়ে দিচ্ছি, ওই মিছিলে মিশে যাও। বরের পাশে পাশে থাকবে। তারপর নিজের কোর্তার পকেটে হাত ভরে তুলে আনবে মুঠো মুঠো মোহর। ছড়িয়ে দেবে চারপাশে। যত খুশি মোহর ফেলো, কোনো ভাবনা নেই। কমবে না পকেটের মোহর। এরপর কী করতে হবে, বলে দেব আমি। তোমার কাছে কাছেই থাকব। যাও, উঠে পড়ো। মিশে যাও মিছিলে। বলেই গায়েব হয়ে গেল জিন। পরীও গায়েব।

মাথাঝাড়া দিল হাসান। চোখ ডলল। স্বপ্ন দেখল না তো! নিজের গায়ের দিকে চোখ পড়তেই বুঝল, স্বপ্ন দেখেনি। শাহী পোশাক পরে আছে সে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় এই পোশাক ছিল না তার পরনে। কোর্তার পকেটে হাত ঢোকাল হাসান। স্পর্শেই বুঝল, মোহর।

তাড়াতাড়ি বেদি থেকে নেমে পড়ল হাসান। একপাশ থেকে গিয়ে টুক করে মিশে পড়ল মিছিলে। দ্রুত চলে এল বরের পাশে। ও মাগো কী বিচ্ছিরি বর! ঘৃণায় রি রি করে উঠল হাসানের গা।

বরের সামনে সামনে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলছে নাচনেওয়ালিদের দল। পিছন থেকে হাততালি দিয়ে মাঝে মাঝেই বাহবা দিচ্ছে বরযাত্রীরা। কেউ কেউ খুশি হয়ে দুয়েকটা মুদ্রা ছুড়ে দিচ্ছে।

দুই পকেট থেকে মুঠো ভরে মোহর তুলে আনল হাসান। খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে দিল নাচনেওয়ালিদের মাঝে। ব্যস, কোথায় গেল নাচ, আর কোথায় গেল কী। হুল্লোড় করে এসে মোহর কুড়াতে শুরু করল। বরযাত্রীদের অনেকেও এগিয়ে এল মোহর কুড়াতে। হাসানের দিকে নজর দেবার সময় নেই ওদের।

মোহর কুড়ানো শেষ। আবার এগিয়ে চলল বরযাত্রী। এরপর মাঝে মাঝেই পিছিয়ে এসে হাসানের সামনে দাঁড়ায় নাচনেওয়ালিদের কেউ। ওড়না পেতে ধরে বকশিশ চায়। মুঠো মুঠো মোহর ছুড়ে দেয় হাসান। এত ধনী লোকটা কে! তাজ্জব হয়ে মুখের দিকে তাকাতে যায় নাচনেওয়ালি। তারপরই থমকে যায়। ভুলে যায় নাচের কথা, ভুলে যায় মোহরের কথাও। থ হয়ে তাকিয়ে থাকে হাসানের মুখের দিকে। তার রূপের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে মরার নেশা তীব্র হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে নাচনেওয়ালির নাকেমুখে মোহর ছুড়ে মারে হাসান। ব্যথা পেয়ে আবার সচেতন হয়ে উঠে নাচনেওয়ালি। বাঁকা চোখের বাণ মেরে বিদ্ধ করতে চায় হাসানকে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় আবার নিজের জায়গায়।

এমনিভাবেই চলল বরযাত্রী। এক সময় উজিরের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। বিয়ে পড়ানোর আলাদা ঘর আছে। সেখানে মেয়েদের ভিড়। একমাত্র বর ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারে না সে ঘরে। কুঁজোর পাশে পাশে হাসানও এসে দাঁড়িয়েছে এই ঘরের দরজায়। দ্বিধায় পড়ে গেল হাসান। এবার কী করবে? কুঁজো ছাড়া তো আর কেউ ঢুকতে পারবে না এ ঘরে। হঠাৎ কানের কাছে ফিসফিসানি শুনল হাসান। জিনের গলা, কুঁজোর মাথা থেকে পাগড়িটা নিয়ে পরে ফেলো। তারপর ওকে সুদ্ধ টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ো ভিতরে। কোনো ভয় নেই। আশেপাশেই থাকব আমি।

আর দ্বিধা করল না হাসান। চট করে কুঁজোর মাথা থেকে পাগড়িটা তুলে নিয়েই নিজের পাগড়ির উপর বসিয়ে দিল। চলে গেল দরজার ওপাশে। হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে কুঁজোকেও ঢুকিয়ে নিল ঘরের ভিতর। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কুঁজো। কিন্তু বরের বেশি কথা বলার নিয়ম নেই, তাই চুপ করে রইল। বাইরের বর-যাত্রীরা ভাবল অন্য কথা। উজিরের মেয়ের সঙ্গে কুঁজোর বিয়ে হতে যাচ্ছে, ব্যাপারটায় এমনিতেই খটকা ছিল তাদের মনে। তারপর পথের মাঝে হঠাৎ উদয় হল শাহী পোশাক-পরা অপরিচিত এক রূপবান যুবক। মোহরে ভরা তার পকেট, এতই ধনী। সবশেষে বিয়ের ঘরের দরজায় কুঁজোর মাথা থেকে পাগড়ি তুলে নিয়ে নিজে পরে ভিতরে ঢুকে যাওয়া! খুব সাহসের দরকার। যে-সে লোকের কাজ নয়। সব কিছু খতিয়ে দেখে বরযাত্রী আর অন্যান্য লোকেরা ধরেই নিল, আসল বর ওই রূপবান যুবক। কুঁজোকে বর সাজিয়ে পাঠানো সুলতানের এক বিরাট রসিকতা। মজা নষ্ট হয়ে যাবে বলে, আগে কারো কাছে ফাঁস করেননি সুলতান। দারুণ মজা পেয়ে খুব একচোট হেসে নিল তারা।

ঘরে বর ঢুকতেই বর এসেছে, বর এসেছে বলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েরা। দুজন বেগানা পুরুষকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নেকাব টেনে দিল।

কুঁজোর হাত ধরে বিশাল এক ঘরে এসে দাঁড়াল হাসান। চোখ ধাঁধিয়ে যাবার জোগাড় হল। শহরের গণ্যমান্য লোকদের মেয়েবৌরা সব জমেছে বিয়েবাড়িতে, বিয়ের ঘরে। সবাই আজ যার যার সেরা পোশাক, সেরা গয়না পরেছে। সুন্দর সাজানো ঘর। বরকে বরণ করার জন্য দরজার কাছ থেকে দুই সারিতে দাঁড়িয়েছে মেয়েরা। সবারই হাতে একটা করে মোমবাতি। মেয়েদের পরনের গয়নার হীরামোতিতে মোমের আলো পড়ে ঝকমক করছে। এত সাজগোজ জীবনে দেখেনি হাসান, কুঁজোর তো দেখার কথাই ওঠে না। হাঁ করে তাকিয়ে রইল দুজনেই।

হাসানই বর, বুঝতে অসুবিধে হল না কারো। তাহলে কুঁজোটা কেন? সুলতানের কোনো রসিকতা? হবে হয়তো।

কুঁজোকে নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করল না কেউ। সব ক'জন হাঁ করে তাকিয়ে আছে হাসানের দিকে। এমনিতেই যার রূপের জেল্লা নেশা ধরিয়ে দেয় মেয়েদের মনে, তাকে বরবেশে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল মেয়ের দল। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল ওরা।

আস্তে আস্তে মেয়েদের মাঝে মৃদু গুঞ্জন উঠল। পলকহীন চোখে বরের দিকে তাকিয়ে ফিসফাস শুরু করল। সবারই ইচ্ছে, আরও কাছে থেকে দেখে ছেলেটাকে। পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আদর করে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে অনেকেরই। সবাই কেমন এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। শেষ পর্যন্ত লাজলজ্জার বালাই আর থাকল না কারো। একে একে মুখের নেকাব খুলে ফেলল সবাই। নিজের নিজের চেহারা দেখাতে চাইছে হাসানকে। যদি তাদের কাউকে দেখে ভালো লেগে যায় হাসানের। ষোল থেকে ষাট, সবার মনের একই অবস্থা।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দেখছে হাসান, কানের কাছে ফিসফিস করে বলল জিন, বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, বিয়ের মঞ্চে গিয়ে বসো।

ধ্যান ভাঙল যেন হাসানের। তাড়াতাড়ি কুঁজোর হাত ধরে গিয়ে মঞ্চে উঠে বসল। তিন পাশ থেকে দুজনকে ঘিরে এগিয়ে গেল মেয়েরাও। মঞ্চ ঘিরে দাঁড়াল।

হঠাৎ কথা বলে উঠল এক রূপসী। চোখের বাণে ঘায়েল করে দিতে চাইছে হাসানকে। বলল, কোন আসমানের চাঁদ গো তুমি, কোথায় তোমার ঘর? আর কার- বা তুমি বর?

হেসে বলল হাসান, যে আসমানের তারা তোমরা, সেই তো আমার ঘর। আর যারা আমার প্রেমে পড়ে, সবার আমি বর।

খিলখিল হাসির তুফান উঠল ঘরে। প্রশ্ন করেছিল যে রূপসী রাঙা হয়ে উঠেছে সে। গালে এক হাত রেখে টেনে টেনে বলল, ও মা, কী ফাজিল গো।

আগেই ঘরে এসে ঢুকেছিল নাচনেওয়ালি মেয়েগুলো। হাসানের মোহর ছড়ানোর গল্প বলাবলি করতে লাগল ওরা। অবাক হয়ে শুনল ঘরের মেয়েরা।

হাসানের আলোচনায় ব্যস্ত সবাই, এই সময় ঘরের এক পাশের একটা বড় দরজা খুলে গেল। কাজি সাহেব এসে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে কনে, উজির সামস আল-দিনের মেয়ে সিৎ আল-হুসন। সঙ্গে রয়েছে অগুণতি দাসী-বাঁদি আর খোজা নফর।

বেজে উঠল বাজনা। বিয়ের বাজনা বাজাতে শুরু করেছে নাচনেওয়ালিদের সঙ্গে আসা বাজনদাররা।

বিশাল ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল হুসন। তাকে ঘিরে দাঁড়াল মেয়ে-বিবিরা। রূপের ছটা ঠিকরে পড়তে লাগল যেন হুসনের গা থেকে। তাজা গোলাপের নির্যাস থেকে বানানো খুশবো গায়ে মেখেছে হুসন, ঘর মৌ মৌ করছে গোলাপি গন্ধে। কনের সামনে ম্লান দেখাচ্ছে ঘরের আর সব রূপসীদের রূপ।

রেশমের মতো মসৃণ কোমল ঘন চুলের রাশি ঢাকা পড়ে আছে মসলিনের ওড়নার তলায়। চাঁপার কলির মতো কোমল গলা ঘিরে আছে হীরা-জহরত খচিত বহু দামি জড়োয়া মানতাশা। টকটকে লাল মখমলের সালোয়ার-কামিজ হুসনের পরনে, জ্যান্ত আগুন যেন। সোনার জরিতে সূক্ষ্ম কাজ করা হয়েছে পোশাকের জায়গায় জায়গায়, সামান্য নাড়াতেই ঝিকমিক করে উঠছে। গায়ের যেখানে যে অলংকার দরকার, সেখানে ঠিক সেই জিনিসটিই পরানো হয়েছে। দেখেশুনে মনে হয়, অলংকার হুসন পরেনি, অলংকারগুলোই হুসনকে পরেছে।

ধীর পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল কনে। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কুঁজো। বিচিত্র ভঙ্গিতে নেচে কুঁদে স্বাগত জানাল হুসনকে। ধমক মেরে তাকে বসিয়ে দিল এক বুড়ি বাঁদি।

ওড়নার ভিতর দিয়ে স্থির চোখে হাসানকে দেখছে হুসন। কনের ভাগ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছে ঘরের সব কমবয়সী মেয়েরা।

মনে মনে বলছে হুসন, ইয়া আল্লা, ওই চাঁদ আমার স্বামী! কুঁজোর সঙ্গে না বিয়ের কথা ছিল আমার! স্বপ্ন দেখছি না তো!

কনে এগিয়ে আসছে, তার আগে আগে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল দাসী-বাঁদিরা, বরের সামনে ওড়না পেতে বকশিশ চাইল। মুঠো মুঠো মোহরে তাদের ওড়না ভরে দিল হাসান। থ হয়ে গেল মেয়েরা। এদের কারো কারো স্বামী কিংবা বাপ অনেক বড় সওদাগর, কিংবা জহুরি। কিন্তু তারাও কেউ এত মোহর দান করার কথা কল্পনা করতে পারবে না। কতখানি ধনবান ওই বর! ভেবে, তাজ্জব হয়ে গেল ওরা। এমন একটা বিয়ের আসরে শুধু হাজির থাকার জন্যই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করল ওরা।

কনেকে নিয়ে মঞ্চে উঠলেন কাজি সাহেব। এবার বিয়ে পড়ানোর পালা।

এতক্ষণ কুঁজোটা মনে করেছিল, হাসানকে তার সঙ্গে দিয়েছে সুলতান বরের অভিভাবক হিসেবে। তার মাথা থেকে পাগড়ি কেড়ে নিয়ে একটু হাসিমস্করা করছে লোকটা। এতে কিছুই মনে করেনি কুঁজো। বিয়ের সময় এমন ঠাট্টা-মস্করা হয়েই

থাকে। কিন্তু এখন তো দেখছে ব্যাপার পুরো অন্যরকম। কাজি সাহেব হাসানকে বর ধরে নিয়ে তার সঙ্গেই বিয়ে পড়াচ্ছে হুসনের।

আর চুপ করে থাকতে পারল না কুঁজো। প্রতিবাদ করল। উঠে দাঁড়িয়ে নাচাকুঁদা শুরু করল। কিন্তু তার চেঁচানি কারো কানে গেল না। হাসির হুল্লোড় উঠেছে। কুঁজোর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড় হয়েছে সকলের। কাজি সাহেবও গম্ভীর হয়ে থাকতে পারছেন না। হেসে ফেলেছেন।

দারুণ মজা পেয়ে কুঁজোর কাছে এগিয়ে এল কয়েকটা ফাজিল মেয়ে। কুঁজোর মুখের কাছে বুড়ো আঙুল তুলল। সাংঘাতিক খেপে গিয়ে মেয়েদের লক্ষ করে ঘুসি মারল কুঁজো। কিন্তু কাউকে লাগাতে পারল না। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কুঁজো। ছোটখাট একটা টিলার মতো উঁচু হয়ে রইল তার কুঁজ। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল একটা ফাজিল মেয়ে। কুঁজোর টিলা-কুঁজে তবলায় চাটি মারার মতো করে চাপড় মেরে সুর করে গান গান গাইতে লাগল।

হাসির ফোয়ারা ছুটল।

আরেক ছুকরি বলে উঠল, একটা ফিতে নিয়ে আয়তো। দেখি মেপে, বানরটা কয় ইঞ্চি লম্বা।

প্রথম ছুকরি বলে উঠল, মেপেটেপে করবি কী? হুসনের হাঁটুর সমানও হবে না।

জোর করে হাসি থামালেন কাজি। নিজেকে গম্ভীর করে তুলতে বেশ কষ্ট হল তার। ধমক লাগালেন জোর গলায়, এই, ফাজলামি হচ্ছে। থামবে, না বের করে দেব ঘর থেকে!

মুখ টিপে হাসতে হাসতে মঞ্চের কাছ থেকে সরে গেল মেয়েগুলো।

বিয়ে পড়ানো শুরু করলেন কাজি সাহেব। পড়ানো শেষ হলে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না মেয়ের দলকে। আবার এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর। হাসিঠাট্টার বন্যা বইল। কুঁজোকে নিয়ে পড়েছে কয়েকটা মেয়ে। যতভাবে সম্ভব, খেপাচ্ছে বেচারাকে। বিয়ের আশা তো শেষ, কুঁজো এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

রাত বাড়ছে। একে একে বিদায় নিল মেয়ে-বিবিদের দল। ঘরে রইল শুধু হাসান, হুসন, কুঁজো আর হুসনের এক বুড়ি বাঁদি। ফাজিল মেয়েগুলো চলে গেছে দেখে আবার সাহস ফিরে পেল কুঁজো। হাসানকে বলল, জোর করে আমার বৌকে তুমি দখল করেছ। সুলতানকে গিয়ে যদি বলি, এখুনি গর্দান যাবে তোমার। তবে, সেটা আমি করতে চাই না। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। আমার টাকাপয়সা নেই, হাজার হাজার মোহর বকশিশ দিয়ে বরের নাম রেখেছ তুমি। অনেক মজা দিয়েছ। এখন ভালোয় ভালোয় চলে গেলে, তোমাকে মাপ করে দেব আমি। সুলতানকে কিছুই বলব না। কী, যাবে?

হ্যাঁ-না, কোনো কথাই বলল না হাসান। রাগে কান লাল হয়ে উঠেছে তার।

আবার বলল কুঁজো, আমি পেশাব করতে যাচ্ছি। ফিরে এসে যেন তোমাকে না দেখি।

আর সইতে পারল না হাসান। উঠে মারতে যাচ্ছিল কুঁজোকে, কানের কাছে ফিসফিসানি শুনে থেমে গেল। জিন বলল, থামো! কুঁজোর ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি তোমার বিবিকে নিয়ে বাসরঘরে চলে যাও।

কুঁজো বেরিয়ে গেল। বুড়ির দিকে তাকাল হাসান। পকেট থেকে দু'মুঠো মোহর বের করে বুড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরল। ওড়না পেতে নিল বুড়ি। ফোকলা মুখে হাসল। তারপর বলল, মালিক, আর রাত করে লাভ কী? চলুন, ঘরে নিয়ে যাই আপনাদের। আপনার কুঁজো বন্ধুর সঙ্গে এখন আর কথা না বললেও চলবে। চলুন।

হুসনের হাত ধরে বুড়ির পিছু পিছু বাসরঘরে এসে ঢুকল হাসান। দু'জনকে খাটে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল বুড়ি। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেল ঘরের দরজা।

কুঁজো গিয়ে ঢুকেছে পেশাবখানায়। পেশাব করতে বসেছে, এই সময় বিশাল একটা ধেড়ে ইঁদুর হুটোপুটি করতে করতে তার একেবারে পায়ের উপর এসে পড়ল। সুন্দরী কনের ভাবনায় বিভোর ছিল কুঁজো, হঠাৎ ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল। কী দেখে এত ভয় পেয়েছে যখন দেখল, দারুণ রেগে গেল সে। তাড়া লাগাল ইঁদুরটাকে। ছুটে গিয়ে একটা ফাটলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ইঁদুরটা।

কুঁজো বিড়বিড় করে গাল দিল ইঁদুরটাকে। হতচ্ছাড়া ইঁদুরের বাচ্চা ইঁদুর! বলেই আবার পেশাব শেষ করতে বসল সে।

হঠাৎ তার পিঠে লাফিয়ে পড়ল একটা কুচকুচে কালো বিড়াল। মিউ মিউ করে কুঁজোর কুঁজে নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল বিড়ালটা। মাগো, গেছি! বলে চেঁচিয়ে উঠল কুঁজো।

লাফিয়ে কুঁজ থেকে নেমে এল বিড়ালটা। ওটাকে তাড়া করল কুঁজো।

কোণঠাসা হয়ে পড়ল বিড়ালটা। বেঁটে পায়ে লাথি মারতে যাবে হঠাৎ বিশাল এক কুকুর হয়ে গেল বিড়াল। প্রকাণ্ড হাঁ করে কামড়াতে এল কুঁজোকে।

এমনিতেই এই তেলেসমাতি কাণ্ড দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে কুঁজোর। কুকুরকে কামড়াতে আসতে দেখে ভয়ে চোখ উল্টে পড়ে যাবার অবস্থা হল তার। মিনমিনে গলায়, হুস্‌স্‌, হুসস, পালা, যা ভাগ!

খকখক করে হেসে উঠল কুকুর। পরক্ষণেই একটা গাধায় রূপ নিল ওটা। কর্কশ গলায় ব্যাঁ-অ্যা-অ্যা করে হাঁক ছাড়ল। তিড়িং করে লাফিয়ে এসে পড়ল কুঁজোর পায়ের কাছে।

আর্তনাদ করে উঠল কুঁজো, বাবাগো, খেয়ে ফেলল গো। কে আছ, বাঁচাও!

গাধাটা মিলিয়ে গেল।

ভয়ে ভয়ে ঘরের চারদিকে তাকাল কুঁজো। না, নেই গাধাটা। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে রওনা হল সে। বেরোনোর আগেই বিশাল এক মোষ উদয় হল। কুচকুচে কালো চামড়া, বিশাল বাঁকানো শিং, ফোঁস ফোঁস করছে আর ফেনা গড়াচ্ছে মুখ দিয়ে। কুঁজোর দিকে শিং পাকিয়ে তেড়ে এল মোষ।

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল কুঁজো। তাড়াতাড়ি পিছোতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল চিত হয়ে। পেশাবখানার ময়লায় মাখামাখি হয়ে গেল সারা গা। ভয়ানক দুর্গন্ধ।

কুঁজোর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ভেবে কথা বলে উঠল মোষরূপী জিন, কী, বিয়ের সাধ মিটেছে? কুঁজোর বাচ্চার সাহস কত। চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়! এই, এত সাহস হল কী করে তোর, উজিরের মেয়েকে বিয়ে করতে চাস!

হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বলল কুঁজো, দোহাই মহিষবাবা, হুজুর, আমাকে মারবেন না। আমি ইচ্ছে করে আসিনি। জোর করে আমাকে পাঠিয়েছেন সুলতান। রাজি না হলে আমার গর্দান যেত। তা ছাড়া, আমি সত্যিই জানতাম না মেয়েটার প্রেমিক আছে। তাহলে এ-পথ মাড়াতাম না।

ধমকে উঠল জিন, ঠিকই বাড়াতি, এখন ভয়ে ভালো মানুষ সেজেছিস!

মাপ চাইতে লাগল কুঁজো, অপরাধ হয়েছে, মহিষবাবা, হুজুর, জাঁহাপনা, সুলতান! আমাকে মাপ করে দিন! জীবনে আর মেয়েমানুষের দিকে তাকাব না। আপনার দুটো...না না, চার পায়ে পড়ছি, এবারের মতো মাপ করে দিন। এই আমি কান ডলছি।

গলার স্বর নরম করল জিন। বলল, ঠিক আছে, তাহলে আল্লার নামে কসম খা, আমি যা যা করব, করবি।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না কুঁজো। বলে উঠল, আল্লাহর কসম, মহিষবাবা, আপনি যা বলবেন, করব।

জিন বলল, বেশ শোন। মন দিয়ে শুনবি। সকালতক এখানে এই পেশাবখানায় দাঁড়িয়ে থাকবি। এখান থেকে নড়েছিস, কিংবা ঘরে উঁকিঝুঁকি মারতে গেছিস, তো তুই শেষ। বোঝা গেছে?

মাথা কাত করে বলল কুঁজো, জী, জাঁহাপনা।

আবার বলল জিন, আর একটা কথা, আজ রাতে এখানে যা যা ঘটেছে যদি কাকপক্ষীকেও বলেছিস, তো প্রাসাদের গম্বুজ থেকে আছড়ে ফেলে ছাতু করে ফেলব তোকে। ভাবিস না আমাকে ফাঁকি দিবি। যা করবি, ঠিক টের পাব আমি। আরও কথা আছে। কাল সকালে এই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাবি। এরপর যদি কোনোদিন এ-মুখো হয়েছিস, রাস্তার ধারের বড় নর্দমায় চুবিয়ে মারব। কী, বুঝেছিস?

আবার মাথা কাত করল কুঁজো, আর বলতে হবে না, মহিষবাবা, সব বুঝেছি।

জিন বলল, বেশ। তাহলে যা, ওই নর্দমাটায় এক পা ডুবিয়ে দাঁড়া। এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবি সকালতক। যা!

জিনের ধমক খেয়ে আঁতকে উঠে গিয়ে নর্দমায় পা ডুবিয়ে দিল কুঁজো। দেয়ালের দিকে মুখ করে রয়েছে। পিছনে মোষটা আছে কি গেছে, ফিরে দেখার সাহসও হল না।

হাসান আর হুসনের কথায় আসি আবার। হুসন জানতে চাইল, কুঁজোটা কে, বল তো?

হেসে বলল হাসান, ও ওটা? দশ দিনার দিয়ে ভাড়া করেছিলাম ভাঁড়ামি করার জন্য।

মনে মনে একটু শঙ্কা যাও-ও ছিল হুসনের একেবারে সাফ হয়ে গেল।

সে-রাতেই বাচ্চা পেটে এল হুসনের।

সারাক্ষণই ওদের কাছে কাছে রইল জিন-পরী। মাঝে জিন শুধু একটু সময় কুঁজোর সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে।

হাসান আর হুসন ঘুমিয়ে পড়লে পরী বলল, আর দেরি করে কী লাভ? চল, ছেলেটাকে আবার বসরায় নিয়ে যাই। ওই কবরখানায়ই রেখে আসা দরকার। ভোর হয়ে আসছে।

মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে বলল জিন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। চল যাই। ফজরের আযান পড়ল বলে।

ঘুমন্ত হাসানের মুখের উপর হাত দোলাল পরী। আরও গভীর ঘুমে অচেতন হল হাসান। তাকে পিঠে তুলে নিল জিন। ঘর থেকে বেরিয়ে উড়াল দিল জিন-পরী।

এত তাড়াতাড়ি চলে ওরা, তবু বেশি দূর যেতে পারল না। ফজরের আযান পড়ে গেল। সময় নেই জিন-পরীর। হাসানকে বসরায় ফেরত রেখে আসতে আসতে নামাজের দেরি হয়ে যাবে। ওরা তখন দামেস্কের কাছাকাছি এসেছে। ওখানেই, শহরে ঢোকার মুখে নামিয়ে রেখে চলে গেল জিন-পরী।

বেলা হল। শহরের প্রধান ফটক খুলে দিয়েছে প্রহরী। আস্তে আস্তে লোকজন আসা-যাওয়া শুরু হল। এই সময়ই ফটকের কাছে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখল হাসানকে।

একজন দুজন করে করে লোক জমায়েত হল, ঘিরে ধরল হাসানকে। এত সুন্দর একটা ছেলেকে এভাবে রাজপথে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হল লোকে। নানাজনে নানা কথা বলাবলি করতে লাগল, নানাজনের নানা মন্তব্য।

ঘুম ভাঙল হাসানের। চোখ মেলল। আরে এ-কী। এ কোথায় এসে পড়েছে সে। অচেনা এক পথের পাশে পড়ে আছে, চারপাশে লোকজনের ভিড়। এ-কী তাজ্জব কাণ্ড! এক ঝটকায় উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠল হাসান, আমি...আমি কোথায়। আপনারা কে? এভাবে ঘিরে আছেন কেন আমাকে?

একজন বয়স্ক লোক বলল, এটা দামেস্ক। অবাক লাগছে আমাদেরও। তা তুমি কে, বাবা? এখানে এলে কী করে, কোথা হতে। আর এভাবে এখানে পড়ে আছ কেন?

কেঁদে ফেলার অবস্থা হল হাসানের। বলল, কী বলছেন আপনারা। এটা দামেস্ক। অথচ গতরাতে কায়রোতে ছিলাম আমি!

হাসানের কথায় জোরে হেসে উঠল কেউ কেউ। একজন বলল, গাঁজার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে বোধহয়।

কায়রো থেকে দামেস্কের দূরত্ব অনেক। হাঁটা পথে দশদিন দশ রাতের বেশি লেগে যায়। মাত্র এক রাতে হেঁটে পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব। হাসানের কথা তাই বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ।

আরেকজন মন্তব্য করল, আহারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটার। পাগল।

অন্য একজন বলল, একেই বলে কপালের লিখন, ভাই। দেখছ, কী চাঁদের মতো ছেলে। এর এ অবস্থা, বড় খারাপ লাগছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল এক বুড়ো। জিজ্ঞেস করল, স্বপ্ন-টপ্ন দেখনি তো?

জোর গলায় বলল হাসান, স্বপ্ন দেখব কেন? পরিষ্কার মনে আছে, গত সন্ধ্যায় আমি ছিলাম বসরায়, রাতে কায়রো।

হো হো করে হেসে উঠল কয়েকজন। হতাশভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বুড়ো। আফসোস করে বলল, নাহ্, কোনো আশা নেই।

এতক্ষণ চুপ করে হাসানকে দেখছিলেন আরেক বৃদ্ধ। চেহারা আর বেশভূষায়ই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত। শিক্ষাদীক্ষাও আছে। হাসানকে বললেন, মাথা ঠাণ্ডা কর, ছেলে। এভাবে উল্টোপাল্টা কথা বলে লোক হাসাচ্ছ কেন?

ভুরু কুঁচকে গেল হাসানের। বলল, মাথা ঠাণ্ডাই আছে আমার। গতরাতে শুধু কায়রোতেই ছিলাম না, বিয়েও করেছি।

হাসির হুল্লোড় উঠল আবার। হাসতে হাসতেই বলল একজন, তা বাপু, বিবিজান দেখতে কেমন তোমার? হুরি-পরী গোছের কিছু?

রেগে গেল হাসান। ধমকে উঠল, এত হাসির কী হয়েছে, শুনি ইয়ার্কি মারছ কেন? মিথ্যে কথা বলছি নাকি আমি? স্বপ্নে নয়, বাস্তবে বাসর কাটিয়েছি জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে, যার রূপের কাছে হুরি-পরীরাও লজ্জা পাবে। আর কী কাণ্ড দেখো। ওই রূপবতীর বিয়ে হতে যাচ্ছিল এক কুঁজোর সঙ্গে। ঘাড় ধরে ভাগিয়ে দিয়েছি কুঁজোকে। চোগা-চাপকান পরে, মাথায় শাহী পাগড়ি চাপিয়ে...বলতে বলতে মাথায় হাত দিল হাসান নিজের অজান্তেই। খেয়াল হল, তার পাগড়ি নেই। মনে পড়ল, বাসরঘরে খুলে রাখার পর আর পরা হয়নি।

অবাক হয়ে গেল হাসান। চোখমুখ লাল হয়ে উঠল তার। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কী করে এখানে এসেছে। লোকগুলো কি সত্যি বলছে? সে দামেস্কে রয়েছে? যাচাই করে দেখতে হয়। এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে ছুটল সে। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল শহরে।

হাসানের পিছন পিছন তাড়া করে গেল একদল ছেলে। হাসানকে খেপাতে লাগল তারা পিছন থেকে। ঢিল ছুড়তে লাগল। পাগল! পাগল! বলে চেঁচাচ্ছে।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটল হাসান। কিন্তু ছেলেগুলোর হাত থেকে রেহাই পেল না। ওরা যাচ্ছে তো না-ই, সংখ্যায় বাড়ছে আরও। নিরুপায় হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল হাসান।

সবে দোকান খুলেছে এক মিষ্টিওয়ালা, হাজী আবদুল্লা। খোলা দরজা দিয়ে সেই দোকানে ঢুকে পড়ল হাসান।

ভয়ঙ্কর চেহারা আবদুল্লার। বিশাল বুকের ছাতি, ইয়া বড় বড় দাড়ি-গোঁফ, হাত দুটো যেন লোহার মুগুর। এককালে ডাকাতি করত, শেষে আর ভালো না লাগায় খুনোখুনি ছেড়ে খাবারের ব্যবসা ধরেছে। সুন্দর ছেলেটার দিকে এক নজর তাকিয়েই বাইরে উঁকি দিল আবদুল্লাহ। যা বোঝার বুঝে নিয়েই উঠে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। কিছু বলতে হল না। চোখের নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল ছেলের দল।

ফিরে এসে হাসানের সামনে দাঁড়াল আবদুল্লাহ। অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ছেলেটা। মায়া লাগল আবদুল্লার অন্তর। নরম গলায় অভয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে, বাবা? এ বেশে কোত্থেকে?

আন্তরিকতার ছোঁয়ায় কেঁদেই ফেলল হাসান। কিছুই গোপন না করে নিজের জীবনের আজব ঘটনার কথা সব খুলে বলল আবদুল্লাকে।

চুপচাপ সব শুনল আবদুল্লা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আল্লার দুনিয়ায় সবই সম্ভব। হাসানকে বলল, সবই আল্লার মর্জি, বাবা। তাঁর ইচ্ছেতেই বিপদে পড়েছ, আবার ইচ্ছে হলেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন তিনি। তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার এখানেই থাকো, কেউ বিরক্ত করার সাহস পাবে না।

কোনো কথা বলল না হাসান। আবদুল্লার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

হেসে আবার বলল আবদুল্লা, আমার কোনো ছেলেপুলে নেই, বাবা। আমাকে বাপ ডাকে না কেউ। তোমাকে দেখে বড় মায়া লাগছে। যদি আপত্তি না থাকে, আমার ছেলে হয়ে যাও। বাবা বলে ডেকে আমার অন্তরটা জুড়াও।

রাজি হয়ে গেল হাসান।

হাসানের পরনের পোশাক সব ময়লা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়। তখনি বাজারে গেল মিষ্টিওয়ালা। ভালো দেখে জামাকাপড় কিনে এনে পরাল হাসানকে। উজিরের ছেলে, উজিরের জামাই হাসান বদর আল-দিন হয়ে গেল ডাকাত-মিষ্টিওয়ালার পোষ্যপুত্র।

ভালো আচার, হালুয়া বানাতে জানে হাসানের মা। মায়ের কাছে হালুয়া বানাতে শিখেছে হাসান। বিদ্যেটা কাজে লেগে গেল এখন। মিষ্টিওয়ালার সঙ্গে বসে মিষ্টি বানায় হাসান, দোকানে বিক্রি করে। তার বানানো হালুয়ার স্বাদ আর গন্ধই আলাদা। তার ওপর হাসানের সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি ব্যবহার। দেখতে দেখতে খরিদ্দার বেড়ে গেল দোকানে। হাজী আবদুল্লার মিষ্টির নাম ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। ফুলে ফেঁপে উঠল দোকান। সুলতানের ঘরেও জায়গা করে নিল হাজী আবদুল্লার মিষ্টি।

ভাগ্যের সঙ্গে আপোস করে নিল হাসান।

ওদিকে বেলা করেই ঘুম ভাঙাল হুসনের। পাশে তাকিয়ে দেখল, স্বামী নেই। উদ্বিগ্ন হল না। ভাবল গোসলখানায় গেছে।

মেয়েকে আত্মীয়-স্বজনের হাতে তুলে দিয়ে মসজিদে গিয়ে ঢুকেছিল সামস আল-দিন। মেয়ের বিয়ের সময় হাজির থাকেনি। কুঁজোর সঙ্গে সোনার টুকরো মেয়েটার বিয়ে হবে, নিজের চোখে দেখে সহ্য করতে পারবে না, তাই সাঁঝের বেলায়ই মসজিদে গিয়ে ঢুকেছিল। সকালে মসজিদ থেকে বেরোল। মেয়ের কী অবস্থা, দেখতে এল। দরজায় টোকা দিয়ে এসে ঢুকল মেয়ের ঘরে।

মেয়ের মুখ দেখেই থমকে দাঁড়াল সামস। এটা আশা করেনি সে। তাকে দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়া তো দূরে থাক, লাজরাঙা হাসিমুখে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে সেলাম করল মেয়ে।

মেয়ের ভাবসাব দেখে রেগে কাঁই হয়ে গেল সামস আল-দিন। গাল দিয়ে উঠল, নির্লজ্জ, হতভাগী। একটা কুঁজো বামনকে পেয়েই তোর এত আহ্লাদ। তোকে আজ কেটেই ফেলব আমি। রাগে মাথার ঠিক রইল না সামসের। তলোয়ার আনতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

পথরোধ করে দাঁড়ালো হুসন। বলল, ছি, আব্বাজান, মেয়ের সঙ্গে এভাবে তামাসা করে কেউ। সত্যিই, কী ভয়ই-না পাইয়ে দিয়েছিলে। জামাই ঠিক করলে আসমানি চাঁদ, বলে বেড়ালে কুঁজোর সঙ্গে বিয়ে হবে আমার।

হাঁ হয়ে গেল সামস আল-দিন। মেয়ে বলে কী। কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মেয়েকে, কী বলছিস তুই, মা। কুঁজোর সঙ্গে বিয়ে হয়নি তোর? কুঁজোর সঙ্গে রাত কাটাসনি?

হুসন বলল, আবার সেই তামাসা, আব্বাজান। চাঁদ থুয়ে কুঁজোর সঙ্গে রাত কাটাব। কী যা তা বলছ।

কুঁজোর সঙ্গে রাত কাটিয়ে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো! নাকি তার নিজের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। খপ করে মেয়ের একটা হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল সামস, কোথায় তোর ফেরেশতা? কোথায়? দেখি আমি!

অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল হুসন, গোসলখানায় গেছে।

তর সইছে না সামসের। মেয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটল গোসলখানার দিকে।

দরজা খোলাই রয়েছে গোসলখানার। সোজা ভিতরে ঢুকে গেল সামস। গোসলখানায় কেউ নেই। পেশাবখানায় ঢুকে থমকে দাঁড়াল। কোথায় রূপবান যুবক! নর্দমায় পা ডুবিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে কুঁজোটা। রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আবার সামসের। এই কুঁজোকেই এত রূপবান বলছে হতভাগী ডাইনি মেয়েটা। ওই মেয়ের বাপ সে, ভাবতেই ঘেন্নায় রি রি করে উঠল উজিরের মন। হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এগিয়ে গিয়ে ধাঁ করে এক লাথি লাগাল কুঁজোর কুঁজে।

উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতে সামলে নিল কুঁজো। কপাল ঠুকে গেল দেয়ালে। কঁকিয়ে উঠে বলল, দোহাই বাবা মোষ, জিনের রাজা, আমাকে মারবেন

না। আপনার কথার একচুল এদিক-ওদিক করিনি। সারারাত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি এখানে। ভোর হয়েছে, বাবা হুজুর?

ধমকে উঠল সামস, এই হারামজাদা, কে তোর মোষ বাবা! আমি উজির, হুসনের বাপ। উঠে আয় নর্দমা থেকে। কী হয়েছে, সব খুলে বল আমাকে।

একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল কুঁজো। বলল, আমি গোসলখানায় ঢুকতেই এক ইয়া বড় ইঁদুর এল, এরপর একে একে বিড়াল এল, কুকুর এল, গাধা এল, সব শেষে এল দৈত্যের মতো মোষ! মেরেই ফেলেছিল আমাকে, অনেক হাতে-পায়ে ধরে তবে রেহাই পেয়েছি। শেষে আমাকে এভাবে থাকতে বলে বিদায় নিলেন জিনের রাজা। যাবার আগে বলে গেলেন, ভোর পর্যন্ত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমাকে। নইলে আছড়ে মেরে ফেলবেন। তা উজির সাহেব, সত্যিই ভোর হয়েছে? নইলে এক চুল নড়ছি না আমি এখান থেকে।

রাগে বিরক্তিতে থরথর করে কাঁপছে উজির। চুলের মুঠি ধরে নর্দমা থেকে টেনে তুলে আনল কুঁজোকে। লাথি মারল কুঁজোর পাছায়। ছিটকে পড়ল কুঁজো। ফিরে তাকাল। সত্যিই উজির সামস আল-দিন দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে। দাঁত কিড়মিড় করে আবার এগিয়ে এল সামস।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল কুঁজো। রোদ উঠেছে। লাফিয়ে উঠে পড়ল কুঁজো। পড়িমরি করে ছুটে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে কোনোদিকে তাকাল না। ছুটতে ছুটতে ঢুকল তার আস্তাবলে। বিচালির গাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। সঙ্গীসাথীরা হুড়মুড় করে ছুটে এল এদিক ওদিক থেকে। হাসি-ঠাট্টা করতে করতে প্রশ্নের ফোয়ারা ছোটাল। কিন্তু একেবারে চুপ কুঁজো। মোষের ভয়ঙ্কর চেহারাটা জ্বলজ্বল করছে তার মনের পর্দায়। কাউকে কিছু বলে আছাড় খেয়ে মরতে চায় না সে।

গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এল সামস আল-দিন। সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেয়ালে ঝোলানো তলোয়ারটা একটানে খুলে নিল খাপ থেকে। ধুপধাপ পা ফেলে এসে ঢুকল মেয়ের ঘরে। নজর এত নিচে নেমে গেছে মেয়ের! একটা কুঁজোকে বলছে আসমানি চাঁদ! এ মেয়েকে বাঁচিয়ে রেখে লোক হাসানোর কোনো মানে হয় না।

বাপের মারমুখো চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল হুসন। জিজ্ঞেস করল, এমন করছ কেন, আব্বাজান? ওকে দেখেছ!

খেঁকিয়ে উঠল উজির, দেখেছি। লাথি মেরে খেদিয়েছি কুঁজোটাকে। এবার তোকে শেষ করব।

বাপের চোখের দিকে তাকাল হুসন। কিছু একটা অনুমান করে নিয়ে বলল, তোমার জামাই কোথায় গেল, বুঝতে পারছি না আব্বাজান। তবে বিশ্বাস কর, কুঁজোর সঙ্গে বিয়ে হয়নি আমার। আমি মিথ্যে বলছি না। পাগল হয়ে যাইনি, নেশাও করিনি। বিশ্বাস না হলে, ওই দেখো, বলে বিছানার একধারে ফেলে রাখা হাসানের জামা-কাপড় দেখিয়ে দিল হুসন।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল উজিরের। এগিয়ে এল বিছানার ধারে। হাত বাড়িয়ে দুটো পাগড়ির একটা তুলে নিল। এ জিনিস যে সে লোকের হতে পারে না। খাঁটি শাহী জিনিস। কুঁজো বেটা স্বপ্নেও পাবে না কোনোদিন এ জিনিস! পড়ে থাকা জামাগুলোও কুঁজোর না, মাপ দেখেই বোঝা গেল। তা ছাড়া একেবারে শাহী জামাকাপড়। এ জিনিস কখনও কুঁজোকে দেবেন না সুলতান। শাহী জামাকাপড়গুলোর কাছে পড়ে আছে আরেক প্রস্থ জামাকাপড়। এগুলোও একই মাপের। খানদানি পোশাক।

কোর্তার পকেটে পাওয়া গেল একটা থলি। তুলে নিল উজির। বেশ ভারি। খুলল। বেরোল এক হাজার চকচকে সোনার মোহর। সেই সঙ্গে এক টুকরো লেখা কাগজ। টাকা বুঝে পেয়ে মাল বিক্রি করে দেয়া রসিদের একটা নকল নিজের কাছেও রেখেছিল হাসান। এটা সেই নকল। হাসানের বাপের নাম ধাম সব লেখা আছে পরিষ্কার করে।

থরথর করে কেঁপে উঠল সামস আল-দিন। এ কী। তার ভাইয়ের নাম লেখা রয়েছে কাগজে। আরও কিছু পাওয়ার আশায় হাসানের জামাকাপড়গুলো ঘাঁটতে লাগল। কোর্তার এক পকেটে শক্তমতো কী একটা হাতে লাগল। দেখল, পকেটের ভিতরের দিকে কিছু একটা ভরে সেলাই করে দেয়া হয়েছে। সেলাই কেটে ভিতরের জিনিস বের করল সামস। দলিলের মতো দেখতে লাগছে। ভাঁজ খুলল সামস। কাগজের লেখা পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। ঘামছে দরদর করে। হাত-পা কাঁপছে।

পড়া শেষ হলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সামস। এগিয়ে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। হাত দিয়ে কপাল টিপে ধড়ল। বিড়বিড় করে বলল, আমার ভাই। জীবনে আর দেখা হল না তোর সঙ্গে। হায়রে কপাল!

হাঁ করে বাপের দিকে তাকিয়ে আছে হুসন। কী হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে কি তার বাপ শোকে পাগল হয়ে গেল?

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস কাটলে কথা বেরোল সামসের মুখ থেকে। বলল, খোদা, তুমি মেহেরবান, তুমি সর্বশক্তিমান। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, জানিস মা, কী তাজ্জব কাণ্ড হয়েছে? চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তোর। আমার ভাই, নূর আল-দিন, বসরার উজিরের ছেলে তোর স্বামী, হাসান বদর আল-দিন। কী অদ্ভুত যোগাযোগ। আমার যেদিন বিয়ে হয়েছে, নূরও বিয়ে করেছে সেদিনই। তুই যেদিন দুনিয়ায় এলি, হাসানও এল সেদিনই। তবে তোর সঙ্গে হাসানের বিয়েটা একটা রহস্যই রয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে যা মনে হচ্ছে, জিন-পরীর কারসাজি রয়েছে এতে। যাই, সুলতানকে গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে আসি। কুঁজো গিয়ে আবার কী লাগিয়েছে, কে জানে।

হুসন বলল, কিন্তু আব্বাজান, তোমাদের জামাই গেল কোথায়?

মাথা নাড়ল সামস, কী জানি, মা, কিছুই বুঝতে পারছি না। আজগুবি কাণ্ড-কারখানা। বলেই উঠে পড়ল উজির। সুলতানের দরবারে রওনা হল।

কুঁজো গিয়ে কিছু লাগায়নি সুলতানের কাছে। জিনের ভয়ে টুঁ শব্দ করেনি কারও কাছে। উজিরের মুখে সব শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন সুলতানও। সবই আল্লাহর ইচ্ছে, মানুষের এতে কোনো হাত নেই। তাই কুঁজোর সঙ্গে হুসনের বিয়ে হয়নি শুনেও আর কিছু বললেন না সুলতান। রাগ পড়ে গেছে তার। কী সাংঘাতিক ভুল করতে যাচ্ছিলেন, ভেবে লজ্জিতই হলেন মনে মনে। আল্লাহর কাছে বার বার মাপ চাইতে লাগলেন। তারপর নকল-নবীসকে ডেকে এই তাজ্জব ঘটনার কথা দরবারের বিশেষ বইতে লিখে রাখতে বললেন।

খুশি মনে বাড়ি ফিরে এল সামস। কিন্তু মেয়ের মুখ দেখেই হাসি উবে গেল চেহারা থেকে। কেঁদে কেঁদে জানাল হুসন, হাসানকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেক খোঁজাখুজি হল, কিন্তু বৃথা। পাওয়া গেল না হাসানকে। মনের দুঃখে চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না হুসনের।

অনেক সান্ত্বনা দিল, অনেক বোঝাল মেয়েকে উজির। বলল, কাঁদিস না, মা। কপালের ওপর কারো হাত নেই। আল্লাহ হাসানকে তোর কাছে পাঠিয়েছেন, আবার কোনো কারণে তিনিই তাকে সরিয়ে নিয়েছেন। ভাগ্যে থাকলে আবার হাসান ফিরে আসবে তোর কাছে।

নিজের ঘরে এসে ঢুকল সামস আল-দিন। দোয়াত-কলম আর কাগজ নিয়ে বসল। তাজ্জব এই ঘটনার কথা বিস্তারিত লিখল। হাসানের পাগড়ি, অন্যান্য জামাকাপড় আর মোহরের থলির সঙ্গে কাগজগুলো সিন্দুকে তুলে রাখল। তারপর দিকে দিকে লোক পাঠাল হাসানের খোঁজে।

একদিন দুদিন করে হপ্তা যায়, যায় মাস। কয়েক মাস। হাসানের খোঁজে যারা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিল, একে একে ফিরে এল তারা। কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি হুসনের

দিন-রাত গুম হয়ে ঘরে বসে থাকে হুসন, আর ভাবে। অনেকে অনেক রকমে সান্ত্বনা দেয়, অনেক রকমে বোঝায়। কিন্তু হলে হবে কী! চাঁদের মতো সুন্দর স্বামীকে কিছুতেই ভুলতে পারে না হুসন।

এমনি করেই কেটে গেল নয়টা মাস। এক ছেলে হল হুসনের। চাঁদের টুকরো যেন নেমে এসেছে দুনিয়ায়। যে দেখল, সে-ই শতমুখে তারিফ করে গেল। উজির সামস আল-দিন নাতির মুখ দেখে আনন্দে আত্মহারা। নাম রাখল আজিব, মানে তাক-লাগানো।

সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে যতই বড় হল, রূপ আরও বাড়ল আজিবের। কায়রোর এক নামকরা মক্তবে নাতিকে ভর্তি করে দিল উজির। এক বিশ্বস্ত নফরের সঙ্গে মক্তবে যায় আজিব, পড়াশুনা করে, তারপর বাড়ি ফিরে আসে।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল আরও পাঁচ বছর। খুব ভালো ছাত্র আজিব। পড়াশুনায় মন আছে। অনেক কিছুই দ্রুত শিখে ফেলল সে। তবে তার একটা দোষও আছে। খুব অহঙ্কারী সে। সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আজিব, অপমান করে। বলে, আমার সঙ্গে তোদের তুলনা! আমি হচ্ছি উজিরের ঘরের ছেলে, আর তোরা কোথাকার কে! খবরদার, আমার কাছে ঘেঁষবি না! তোদের গায়ে দুর্গন্ধ!

দিনের পর দিন আজিবের অত্যাচারে অসহ্য হয়ে শেষে একদিন দল বেঁধে ওস্তাদের কাছে নালিশ করল ছেলেরা।

ছেলেদের কথা মন দিয়ে শুনলেন ওস্তাদ। দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে ভাবলেন কী যেন। তারপর ছেলেদের বললেন, উজিরের বাড়ির ছেলে, তাকে শাস্তি দিতে গেলে তো আমিও বিপদে পড়ব। তারচেয়ে এক কাজ কর, তোমরাই শায়েস্তা কর ওকে।

একসঙ্গে বলে উঠল ছেলের দল, কিন্তু কী করে, ওস্তাদ? পারলে তো কবেই শায়েস্তা করে ফেলতাম ওকে।

ওস্তাদ বললেন, আমি বাতলে দিচ্ছি উপায়। শোন, কাল আজিব মক্তবে এলেই তার বাপের নাম জিজ্ঞেস করবে তোমরা। কে তার বাপ, কী করে, কোথায় থাকে, জানতে চাইবে। আমি জানি, ও বলতে পারবে না। বাপের নাম বলতে না পারলে আপনাআপনিই জব্দ হয়ে যাবে সে।

পরদিন আজিব আসতেই তাকে ঘিরে ধরল ছেলেরা। একজন জিজ্ঞেস করল, এই যে আজিব, খুব তো বলে বেড়াও, তুমি উজিরের ঘরের ছেলে। তা তোমার বাপের নাম কী?

গম্ভীর হয়ে হাত নেড়ে বলল আজিব, আরে তা-ও জানো না। আমার বাবা মিশরের উজির, সামস আল-দিন।

হো হো করে হেসে উঠল ছেলেরা। হাত নেড়ে টিটকারি মেরে বলল, দূ-র! দূ-র! কিছু জানে না! নিজের বাপের নাম জানে না। আরে উজির সামস আল-দিন যে তোমার বাপ নয়, সে তো সবাই জানে। উনি তো তোমার নানা।

রেগে চোখমুখ লাল করে ফেলল আজিব। খেঁকিয়ে উঠল, তাহলে তোমরাই বল না, কে আমার বাপ?

হাসতে হাসতে বলল ছেলেরা, আরে, আমরা জানলে আর তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম নাকি? এখন তো দেখছি, তুমিও জানো না! আবার দূর দূর করতে লাগল ছেলেরা।

একটা ছেলে বলে উঠল, বাপ কে, জানে না! আরে এ ছেলে তো বাজারে কেনা বান্দার চেয়েও খারাপ! ছি ছি ছি!

রাগে দুঃখে চোখে পানি এসে গেল আজিবের। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সেখানে। বাড়ি ফিরে এল। সোজা ঢুকল মায়ের ঘরে।

ছেলের চেহারা আর ভাবসাব দেখে আঁতকে উঠল হুসন। তাড়াতাড়ি এসে ছেলেকে ধরে জিজ্ঞেস করল, কী রে, আজিব, কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন এমন করে!

ঝটকা দিয়ে মায়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আজিব। ফুঁসে উঠল বলল, আমার বাপ কে, বল!

অবাক হয়ে গেল হুসন। মিনমিন করে বলল, কে আবার। উজির সামস আল-দিন!

চেঁচিয়ে উঠল আজিব, মিথ্যে কথা। উজির আমার বাপ হতে যাবে কেন, সে তো তোমার বাপ! আমার নানা।

আর কী বলবে, চুপ করে রইল হুসন।

চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলার অবস্থা করল আজিব। চুপ করে রইলে কেন। জলদি বল, কে আমার বাপ। মক্তবের ছেলেরা যাচ্ছে-তাই কথা বলেছে আমাকে। আমি বাপের নাম বলতে পারিনি। ভালো চাইলে বল, নইলে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।

কান্নায় ভেঙে পড়ল হুসন। পুরনো ব্যথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার মনে। হাসান বদর আল-দিন তার স্বামী, বলতে পারে ছেলেকে, কিন্তু তারপর? আজিব তো জিজ্ঞেস করে বসবে, কোথায় আছে তার বাবা? মায়ের কাছ থেকে চলে গেল কেন? জিন-পরীর কেচ্ছা বলে কি ফাঁকি দেওয়া যাবে, ভোলোানো যাবে ছেলেকে?

খবর গেল উজির সামস আল-দিনের কাছে। ছুটতে ছুটতে এল সে। দেখে, সমানে চেঁচাচ্ছে আর সারা ঘরে দাপাচ্ছে আজিব। বার বার বলছে, কে আমার বাবা! কে আমার বাবা জলদি বল। নইলে এখনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব! কোনো কথা বলতে পারছে না হুসন। আকুল হয়ে কাঁদছে শুধু।

নাতিকে জিজ্ঞেস করল উজির, কী হয়েছে, আজিব?

উজিরের মুখোমুখি হয়ে বলল আজিব, কেন এতদিন মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়েছ আমাকে, নানা? তুমি আমার বাপ নও, আমার মায়ের বাপ। তাহলে আমার বাপ কে?

থতমত খেয়ে গেল উজির। তারপর এগিয়ে গেল। আস্তে করে আজিবের মাথায় হাত রেখে শান্ত গলায় বলল, আয়, বোস্, আজিব। সব বলছি তোকে। এতদিন তোর বোঝার বয়স হয়নি বলে, বলিনি। তবে আজ তোকে সব বলব।

একে একে সব কথা খুলে বলল সামস আল-দিন। যেদিন সুলতানের দরবারে যাবার পথে ছেলে-মেয়ের বিয়ে নিয়ে ঝগড়া করেছিল দুই ভাই, সেখান থেকে শুরু করে আজিবের জন্ম পর্যন্ত সব কথা বলল আজিবকে। বলল আজিবের বাপের রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা।

সব শুনল আজিব। উজিরের কথা শেষ হলে বলল, তাহলে আমার বাবা কি ফিরবে না নানাভাই?

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না উজির। কান্নায় ভেঙে পড়ল। দীর্ঘদিন চেপে রাখা আবেগ একটা ছোট্ট কথাতেই একেবারে উথলে উঠেছে।

একটু পরে সামলে নিয়ে বলল উজির, তা তো জানি না, ভাই! তবে আর না। আর অন্য লোককে পাঠাব না। চল আমরাই বেরোই। দেখি, হাসানকে খুঁজে বের করতে পারি কিনা!

সুলতানের কাছে ছুটি নিতে গেল সামস আল-দিন।

হঠাৎ ছুটির দরকার হল কেন, জানতে চাইলেন সুলতান।

সব কথা খুলে বলল উজির। শেষে বলল, জাঁহাপনা, লোক হাসাহাসি শুরু হয়ে গেছে। কমবে না আর এখন, বাড়বেই। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এটা বন্ধ করা দরকার। যে করেই হোক, খুঁজে আনতেই হবে হাসানকে।

সায় দিয়ে বললেন সুলতান, ঠিক বলেছ, উজির। যাও, তোমায় ছুটি দিচ্ছি আমি। প্রথমে বসরায় চলে যাও। সেখানে খোঁজ পেতে পার। আশপাশের অঞ্চলগুলোতে খুঁজে দেখবে। অনুরোধপত্র লিখে তাতে আমার সিল-মোহর এঁকে দিচ্ছি। যে কোনো মুসলিম দেশের সুলতান আমার অনুরোধ রাখবেন। তাঁরা সাধ্যমতো সাহায্য করবেন তোমাকে। যাও, আর দেরি কোরো না, উজির। যত তাড়াতাড়ি পার বেরিয়ে পড়ো।

সুলতানের বদান্যতায় খুশি হল সামস আল-দিন। সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে এল দরবার থেকে। হুসন আর আজিবকে নিয়ে সেদিনই বেরিয়ে পড়ল বসরার পথে। সঙ্গে চলল অনেক চাকর নফর বাঁদি।

সারাদিন চলে, রাতের বেলা কোথাও থেমে বিশ্রাম করে। পরদিন সকালে উঠেই আবার শুরু হয় চলা। এমনি করে চলে চলে এক দিন দামেস্কে এসে পৌঁছল ওরা। সাঁঝ হতে দেরি আছে। দুদিন এখানে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিল সামস আল-দিন। তাঁবু খাটানোর হুকুম দিল সাথের লোকদেরকে।

কাজে লেগে গেল উজিরের লোকেরা। কয়েকজন নফর আর আজিবকে সঙ্গে নিয়ে শহর দেখতে বেরোল সামস। বাজারে ঢুকে নানারকম জিনিস কিনল। শহরের বনেদি হাম্মামে গোসল করল।

নামাজের সময় হল। মসজিদে ঢুকল সামস আল-দিন। আজিবকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল উজিরের পুরনো নফর খোজা সাইদ। হাতে একটা লম্বা লাঠি। এটা তার সব সময়ের সঙ্গী।

অপরূপ চেহারা আজিবের, তার ওপর মণিমুক্তার কাজ করা জমকালো পোশাক। তাকে দেখার জন্য রীতিমতো ভিড় জমে গেল। রেগে যাচ্ছে সাইদ। মাঝে মাঝেই লাঠি ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়ে সে। সরে যেতে বলে। কিন্তু কেউ সরে না, হাঁকডাকে লোকজনের ভিড় আরও বাড়তে থাকল।

কী আশ্চর্য! এ দেশের লোক রূপবান কিশোর দেখেনি নাকি এর আগে? ভেবে অবাক হল সাইদ। ওদেরকে কাটানোর নানারকম ফন্দি ফিকির আঁটতে লাগল মনে মনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

হাঁটতে হাঁটতে একটা খাবারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। হাজি আবদুল্লার দোকান। আবদুল্লা মারা গেছে বছর তিনেক আগে। এখন দোকানের পুরো মালিক হাসান বদর আল-দিন, আজিবের বাবা।

রাস্তায় লোকজনের ভিড়। কারণ কী জানার জন্য দরজা দিয়ে উঁকি দিল হাসান। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ল আজিবের ওপর। থমকে গেল সে। বুকের ভিতর এমন করে মোচড় দিয়ে উঠল কেন? সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল। পানি এসে যাচ্ছে চোখে। হাসানের ইচ্ছে হল, এক ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে বুকের মাঝে টেনে নেয়। বারো বছর আগের একটা রাতের কথা মনে পড়ে গেল। কে জানে, তার বিবি এখনও বেঁচে আছে কিনা। তার ছেলে হয়েছে কিনা! হলে, সামনের ওই ছেলেটির মতোই বয়স হবে। আজিবের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না হাসান।

আজিবেরও চোখ পড়েছে হাসানের ওপর। তারও কেমন যেন মায়া লাগতে শুরু করেছে দোকানের দরজায় দাঁড়ানো লোকটিকে দেখে।

হাসান ডাকল, এসো না, বাবা, আমার দোকানে। মিষ্টি খেয়ে যাও। ভালো জিনিস বানিয়েছি আজ। বেদানার হালুয়া। এমন জিনিস আর কোথাও পাবে না তুমি। একবার এসে খেয়েই দেখো।

মিষ্টিওয়ালার ডাকে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আজিব, চোখ পড়ল সাইদের ওপর। আজিবের ইচ্ছে বুঝতে পরল খোজা। হুঙ্কার ছাড়ল সে, এই মিষ্টিওয়ালা! তোমার সাহস তো কম না। উজিরের ঘরের ছেলেকে দোকানে ঢুকে মিষ্টি খেতে বলছ। আরে, ও কি যার তার দোকানে ঢোকে নাকি!

খোজার কাছে এসে দাঁড়াল আজিব। আস্তে করে বলল, অযথা বকাবকি করছ কেন ওকে, সাইদ ভাই? দোকানে ঢুকলেই-বা কী হবে? কে চেনে এখানে আমাদের? না চিনলে ইজ্জত যায় না। তা ছাড়া মিষ্টিওয়ালার চেহারা দেখেছ? নিশ্চয়ই কোনো বড় ঘরের ছেলে। কপালের দোষে হয়তো আজ সামান্য মিষ্টিওয়ালা হয়েছে।

আজিবের কথা শুনে আবার চোখে পানি এসে গেল হাসানের। ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে খোজাকে বলল, আসুন না জনাব। আমার দোকানে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ুক। আমার দিলটা ঠাণ্ডা হবে...

গলা ধরে এল হাসানের। কথাটা শেষ করতে পারল না। চোখের কোণে পানি টলমল করছে

অবাক চোখে হাসানের দিকে তাকিয়ে আছে আজিব। খোজাকে বলল, চলো, ওর দোকানে ঢুকি। আমার বয়সী ছেলেটেলে আছে হয়তো লোকটার। দূর দেশে থাকে, কিংবা হয়তো মারা গেছে। দেখছ না কেমন কাঁদছে। চলো যাই। বলে একবার পিছনে তাকাল আজিব। তাদের কাছে থেকে খানিক দূরে লোকের ভিড় এখনও আছে। আবার বলল সে, তা ছাড়া, ওই শকুনগুলোর হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে।

পিছনের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল সাইদ। তারপর বলল, ঠিক আছে চলো ঢুকি। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা চলবে না।

দুজনে ঢুকল দোকানে। ভালো দুটো কুরসিতে দুজনকে বসতে দিল হাসান। যত ভালো ভালো খাবার বানিয়েছে সেদিন, সবগুলোরই কিছু কিছু এনে দিল পরিষ্কার রেকাবিতে করে।

বলতে হল না, হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল আজিব। খুশি উপচে পড়ছে চোখেমুখে। বোঝা গেল, খাবারগুলো পছন্দ হয়েছে তার। আর সাইদের তো কথাই নেই। তার গম্ভীর মুখেও খুশির আমেজ।

সবশেষে বেদানার হালুয়া এনে দিল হাসান।

মুখে দিয়েই বলে উঠল আজিব, আরে, এ তো দারুণ জিনিস। জীবনে কোনোদিন খাইনি এমন!

দেখতে দেখতে খেয়ে শেষ করে ফেলল দুজনে।

আরও এনে দিল হাসান। তারপর আরও, আরও।

পেটে হাত বোলাতে লাগল আজিব। ঢেকুর তুলে বলল, নাহ, আর দিয়ো না। আর পারছি না। উঠে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিল। জিজ্ঞেস করল, কত দাম হয়েছে?

জিভে কামড় দিয়ে হাসান বলল, কী বলছ বাবা? তোমার কাছ থেকে দাম নেব। খেয়ে যে ধন্য করেছ এতেই খুশি আমি। দেশে ফিরে গিয়ে আমার খাবারের নাম কর, তাতেই চলবে আমার। বিদেশেও আমার জিনিসের নাম ছড়াবে।

দাম দিতে অনেক চেষ্টা করল আজিব, কিন্তু কিছুতেই নিল না হাসান।

মিষ্টিওয়ালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁবুতে ফিরে চলল আজিব আর সাইদ।

আজিবকে আরও দেখার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারল না হাসান। দোকান বন্ধ করে দিল সে। তারপর দুজনের পিছু পিছু চলতে লাগল।

শহরের সীমানা ছাড়ানোর আগে হঠাৎ পিছনে ফিরে তাকাল সাইদ। মিষ্টিওয়ালাকে দেখে ফেলল। মনে করল, কোনো বদ মতলব আছে লোকটার। একটু পিছিয়ে এসে ধমকে উঠল সে, এই, আমাদের পিছু নিয়েছ কেন? মতলবটা কী তোমার?

থতমত খেয়ে গিয়ে বলে উঠল হাসান, এই, মানে, শহরের বাইরে কাজ আছে আমার...

হাসানের হয়ে বলে উঠল আজিব, ওকে ধমকাচ্ছ কেন, সাইদ ভাই? এই সড়ক কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, সবার জন্যই খোলা।

আবার চলতে লাগল দুজনে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল হাসান। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনি এক প্রচণ্ড আকর্ষণে পড়ে গেছে যেন সে। থাকতে পারছে না কিছুতেই। আবার আজিবের পিছু পিছু চলতে শুরু করল।

তাঁবুর কাছাকাছি এসে গেছে দুজনে। পিছনে তাকিয়ে দেখল আজিব, এখনও আসছে মিষ্টিওয়ালা। রাগ হল এবার। নানা দেখতে পেলেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করবে, কেন আসছে জানতে চাইবে। জেরার মুখে মুখ ফসকে যদি দোকানে ঢুকে মিষ্টি খাওয়ার কথা বলে দেয় সাইদ। তাহলে ভীষণ বকুনি খেতে হবে নানার কাছে।

আজিব ধরেই নিল, মুখের কথায় কোনো কাজ হবে না। তার পিছনে আসবেই মিষ্টিওয়ালা। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারল সে। সোজা গিয়ে হাসানের কপালে লাগল পাথর। আ-হ্ করে উঠল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

হুঁশ ফিরলে হাসান দেখল, তার কাপড়ে রক্তের দাগ। কপাল ব্যথা করছে। আঙুল ছুঁইয়ে দেখল, রক্ত। কপালের চামড়া কাটা। নিজের পাগড়ি দিয়ে কপালের রক্ত মুছল। বার বার নিজেকেই দোষ দিতে লাগল সে। বেশি কৌতূহলের জন্যই এই শাস্তি পেতে হয়েছে।

মুখ তুলে দেখল হাসান। ছেলেটা বা তার সঙ্গীকে দেখা গেল না কোথাও। চলে গেছে ওরা। দোকানে ফিরে এল সে।

এত সবের কিছুই জানতে পারল না সামস আল-দিন। ব্যাপারটা তখনকার মতো ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

তিনদিন পরে তাঁবু তুলে লটবহর গুছিয়ে লোকজন নিয়ে আবার রওনা হল উজির। পথে হিমস্ হামাহ্, আলেপ্পো, দিয়ারবকর, মারিদীনে থামল। খোঁজ করল হাসানের। পাওয়া গেল না।

শেষে একদিন বসরায় এসে পৌঁছল দলটা। তাঁবু ফেলার হুকুম দিয়েই বেরিয়ে পড়ল সামস আল-দিন। প্রথমেই গিয়ে দেখা করল সুলতানের সঙ্গে।

পরিচয় পেয়ে সামসকে অনেক খাতির যত্ন করলেন সুলতান। নিজের পাশে বসিয়ে সামসের আসার কারণ জানতে চাইলেন।

সব কথা খুলে বলল সামস আল-দিন।

সুলতান বললেন, জনাব, আপনার ভাই নূর আল-দিন আমার এখানেই উজিরের কাজ করেছে। পনেরো বছর আগে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছে আমার প্রিয় লোকটি। তাঁর ছেলে ছিল, হাসান। ওই ছেলেটাকে একদিন না দেখে থাকতে পারতাম না আমি। বাপ মারা যাবার পর কেমন যেন হয়ে গেল ছেলেটা। আমার দরবারেও আসে না। ছটফট করি আমি। শেষে আর থাকতে না পেরে একদিন পাঠালাম হাসানকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু এল না ছেলেটা। ভীষণ রাগ হল। বোকার মতো রাগ করে বসলাম একটা এত্তোটুকুন ছেলের ওপর। তাকে ধরে বেঁধে আনতে লোক পাঠালাম। কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না হাসানকে। কোথায় জানি গায়েব হয়ে গেছে। এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাইনি। অনেক খোঁজখবর করেছি তার, কিন্তু বৃথা। আমার রাগের শাস্তিই যেন দিয়েছে আল্লাহ। চোখের কোণে পানি টলমল করছে সুলতানের। হাত দিয়ে মুছে নিয়ে বললেন, নূর আল-দিনের বিবি, হাসানের মা এখনও বেঁচে আছে। স্বামী-ছেলে হারিয়ে বেচারির যে কী করে কাটছে! মাঝে মাঝে দেখতে যাই তাকে। তার চোখের পানি দেখলে নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারি না।

নূর আল-দিনের বিবি বেঁচে আছে শুনে আর দেরি করল না সামস। ভাইয়ের বাড়ির ঠিকানা নিল। সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল দরবার থেকে।

বিশাল বাড়ি নূর আল-দিনের। দামি আসবাপত্র। কিন্তু হলে হবে কী? কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে বাড়িটা। লোকজন কেউ আছে বলেই মনে হল না সামস আল-দিনের।

না, ভুল করেছে সামস আল-দিন। লোকজন অনেক আছে বাড়িতে। তবে সবাই চুপচাপ। একেবারে গুম মেরে থাকে। একজন বাঁদিকে নিজের পরিচয় দিল সে হাসানের মায়ের কাছে নিয়ে যেতে বলল।

একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে দিনরাত পড়ে থাকে হাসানের মা। কখনও কাঁদে, কখনও গুম হয়ে বসে বসে ভাবে। খাবার ঠিক নেই, ঘুমানোর ঠিক নেই।

মনিবানির ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল বাঁদি।

সাড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকল সামস। জানালার ধারে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে হাসানের মা। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। তাড়াতাড়ি নেকাব টেনে দিল মুখে। চোখের পানি মোছার কোন চেষ্টা করল না।

বলে উঠল সামস, আমাকে লজ্জা পাবার কিছু নেই, বোন। আমি নূর আল-দিনের বড় ভাই। হাসানের চাচা।

উঠে এসে ভাশুরকে সেলাম করল হাসানের মা। বসতে বলল।

বসরায় কেন এসেছে, সব কথা খুলে বলল সামস আল-দিন। শেষে বলল, আমার মনে হয়, তোমার ছেলে এখনও বেঁচে আছে বোন।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাসানের মা বলল, আল্লাহ যেন তাই করেন। আপনার মুখের কথা যেন সত্যি হয়, ভাইজান। আমি কাপড়টা বদলে আসি। এখনি আজিবকে দেখতে যাব।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এল হাসানের মা। নাতিকে দেখার জন্য তর সইছে না আর।

হাসানের মাকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এল সামস। নাতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

দু'হাতে নাতিকে জাপটে ধরল হাসানের মা। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল আজিবকে।

হাসানের মা একটু শান্ত হলে সামস আল-দিন বলল, বোন, একা একা এখানে আর থেকে কী করবে? আমাদের সঙ্গে চল। স্বামীর আসল বাড়িতে ফিরে যাবে। পথে হাসানকে খুঁজতে খুঁজতে যাব আবার। কপালের জোরে যদি পেয়েই যাই তাকে, সে-ও তোমাকে পেয়ে খুশি হবে।

সামস আল-দিনের কথায় রাজি হয়ে গেল হাসানের মা। লোক সঙ্গে নিয়ে তখনি নিজের বাড়িতে চলে গেল। জমানো ধনরত্ন আর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। নফর বাঁদিদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল আবার তাঁবুতে।

সেই দিনই তাঁবু তুলল আবার সামস আল-দিন। আবার রওনা হল কায়রোর পথে।

পথে, জায়গায় জায়গায় আবার খোঁজা হল হাসানকে। পাওয়া গেল না। তারপর একদিন এসে আবার দামেস্কে তাঁবু ফেলল সামস আল-দিনের লোকেরা।

উজির ঠিক করল, এবার এখানে এক হপ্তা থাকবে। আরও ভালোমতো খুঁজবে হাসানকে। দরকার হলে প্রতিটি ঘর, প্রতিটি দোকানে দোকানে খোঁজখবর করবে।

শহরের বাইরে সেই আগের জায়গাতেই সামস আল-দিনের তাঁবু পড়েছে। নফর সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল উজির। উদ্দেশ্য : হাসানের খোঁজ তো করবেই, সেই সঙ্গে কায়রোর সুলতানকে উপহার দেবার জন্য দামেস্কের কিছু বিখ্যাত জিনিস কিনবে।

নানা বেরিয়ে যেতেই সাইদকে ধরল আজিব। অনুরোধ করে বলল, সাইদ ভাই, চলো না মিষ্টিওয়ালার দোকানে যাই। কী মিষ্টি খাইয়েছিল সে। স্বাদ লেগে রয়েছে এখনও জিবে। তা ছাড়া লোকটার কুশল জানা দরকার। আহা, ঢিল মেরেছিলাম ওকে। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। চলো, তার কাছে মাপ চেয়ে নেব।

আজিবের কথায় রাজি হয়ে গেল সাইদ। বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

রক্তের টান আবার মিষ্টিওয়ালার দোকানে টেনে নিয়ে এল আজিবকে। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিল আজিব। এক মনে মিষ্টি বানাচ্ছে লোকটা। কপালের একপাশে একটা ক্ষত। দেখে ব্যথায় টনটন করে উঠল আজিবের মন। নিজেকে গালমন্দ করতে লাগল মনে মনে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ডাকল আজিব, কী গো, মিষ্টিওয়ালা, কী করছ?

ডাক শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাল হাসান। আজিবকে দেখে খুশিতে ভরে গেল তার মুখ। খাবার বানানো ফেলে এক লাফে উঠে পড়ল। কাছে এসে দাঁড়াল। চোখে পানি এসে যাচ্ছে তার। বলল, বাবা, এস এস। বসো। মিষ্টি খাও। তা এতদিন কোথায় ছিলে?

আজিব বলল, বসরা গিয়েছিলাম। আবার দেশে ফিরছি, কায়রোয়। আজই এসেছি এখানে। তোমাকে দেখতে এলাম।

হাসান বলল, তাই নাকি বাবা। ভালো করেছ, খুব ভালো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো! মিষ্টি খাও।

সম্মতির জন্য সাইদের দিকে তাকাল আজিব।

আজিবের দৃষ্টির মানে ঠিকই বুঝতে পারল সাইদ। মনে মনে হাসল। তারও লোভ হচ্ছে। মিষ্টি সত্যিই খুব ভালো এই দোকানের। তবু দোকানিকে চাপে রাখার জন্য গম্ভীর হয়ে বলল সে, বড় সাংঘাতিক লোক তুমি, মিষ্টিওয়ালা। সেবার কী ভয়টাই-না পাইয়ে দিয়েছিলে। হুজুর জানতে পারলে আর আস্ত রাখতেন না। মিষ্টি খেতে পারি, যদি কথা দাও, আর আমাদের পিছু নেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল হাসান, আল্লার কসম, ভাই, এবারে আর পিছু নেব না। কী বোকার মতো কাজই করে ফেলেছিলাম সেবার।

বসল আজিব আর সাইদ। ভালো ভালো মিষ্টি এনে দিল হাসান।

কোনোটার দিকেই ফিরে তাকাল না আজিব। সোজা বেদানার হালুয়ার রেকাবিটা টেনে নিল। খেয়ে শেষ করে ফেলল। আরও এনে দিল হাসান।

খেয়ে খেয়ে পেট ভরে ফেলল আজিব। পানি খাওয়ারও আর জায়গা নেই পেটে।

হাতমুখ ধুয়ে উঠল আজিব আর সাইদ। মিষ্টিওয়ালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

এদিন আর পিছু নিল না হাসান। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ আজিবকে দেখা গেল, তাকিয়ে রইল সে। ছেলেটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পরেও দাঁড়িয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুছে ফিরে এসে ঢুকল দোকানে, অবাক হয়ে ভাবছে, কে ছেলেটা! এমন এক দুর্নিবার আকর্ষণে কেন টানছে তাকে? ওই ছেলেটাকে দেখলেই বুকের ভিতর এমন করে ওঠে কেন? সেদিন আর মিষ্টি বানাতে ইচ্ছে করল না হাসানের। দোকান বন্ধ করে দিল।

তাঁবুতে ঢুকতেই আজিবের কাছে ছুটে এল তার দাদি। কাছে টেনে নিয়ে বার বার চুমু খেয়ে বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ, মানিক? বুড়ি দাদিকে কষ্ট দিতে পারলেই বুঝি তোর ভালো লাগে?

আজিবকে কোলে নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ আদর করে শান্ত হল দাদির মন। আবার জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে, ভাই?

আজিব বলল, বাজার দেখতে গিয়েছিলাম, দাদি। কী বড় বাজার, আর কত দোকান! কত জিনিসপত্র!

আজিবের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল দাদি, তাহলে তো নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোর। যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। একটা জিনিস খাওয়াব তোকে।

আজিবের পেটে জায়গা নেই, তবু হাতমুখ ধুয়ে এসে বসল। খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, নইলে ধরে ফেলবে দাদি। তারপর জোর বকুনি খেতে হবে নানার কাছে।

একটা চিনামাটির পাত্র থেকে বেশ অনেকখানি বেদানার হালুয়া নিয়ে এল দাদি। একটা পাত্রে করে আজিবকে দিল। আর খানিকটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরল সাইদের দিকে, নে, তুইও একটু চেখে দেখ। এ জিনিস খাসনি কখনও, আমি জানি।

বোকার মতো ফস করে বলে বসল সাইদ, না দাদিজান, আমার খিদে নেই।

সাইদের দিকে মুখ তুলল দাদি। বলল, সেকি রে! বাজারে খেয়ে এসেছিস নাকি কিছু?

আঁতকে উঠল সাইদ। বোকামির জন্য গাল দিতে শুরু করল নিজেকে।

বাঁচাল আজিব। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, দাদি, ওর পেটে অসুখ করেছে। সেই তখন থেকেই খালি বলছে, পেট ব্যথা করছে।

হাত কচলে ফ্যাকাসে হাসি হাসল সাইদ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দাদি বলল, ও তাই বল। তা বাছা, পেটের অসুখ তো ভালো কথা নয়। ঠিক আছে, আমি এখনি ওষুধ নিয়ে আসছি। দাঁড়া এখানে। এই আজিব, তুই খেয়ে নে। খেতে পারলে আরও নিস রেকাবি থেকে। আমি এই এলাম বলে।

দাদি চলে যেতেই ফিক করে হেসে ফেলল আজিব। বলল, কেমন মজা, সাইদ ভাই? মুখে তো লাগাম দিতে পার না। এবার খাও তেতো ওষুধ।

মুখ গোমড়া করে বলল সাইদ, তোমার জন্যই তো! আবার এখন হাসছ!

হেসে বলল আজিব, খালি আমার দোষ দিচ্ছ কেন? তুমি কি কম খেয়েছ... দাদিকে ফিরে আসতে দেখে চুপ করে গেল সে।

দাদি জিজ্ঞেস করল, কী খাবার কথা বলছিসরে, আজিব?

কথা কাটাল আজিব, আরে দাদি, আর বোলো না। এই পেটুকটাকে বলছি। খাবার সময় তো হুঁশ থাকে না। এখন বুঝুক ঠেলা!

সহানুভূতি ঝরল দাদির গলায়। ওষুধের পাত্রটা সাইদের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, না, তেমন আর কিছু হবে না। এই ওষুধটুকু খেয়ে নিলেই সেরে যাবে। নে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, খেয়ে ফেল।

হাত বাড়িয়ে নিল সাইদ। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। মুখ বিকৃত করল একবার। দাদির চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে গিলে ফেলল ওষুধটুকু। পাত্রটা ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে গলা ধরে ওয়াক ওয়াক করতে লাগল।

হেসে বলল দাদি, দূর বোকা। ওষুধ খেয়ে অমন করলে গুণ নষ্ট হয়ে যাবে যে।

হেসে ফেলল আজিব। সাইদের করুণ অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছে।

রেকাবির দিকে নজর পড়ল দাদির। ভুরু কুঁচকাল। বলল, আরে আজিব, ছোঁসইনি দেখছি এখনও! খা খা, জলদি খা। এটুকু খেতে আর কতক্ষণ লাগবে? খেয়ে ফেল।

নিতান্ত অনিচ্ছায়ও হাত বাড়াল আজিব। পেটে একটুও জায়গা নেই। কিন্তু সাইদের মতো সে-ও যদি না খায়, সন্দেহ জাগবে দাদির মনে। বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে ওরা, ধরে ফেলবে তখন সহজেই।

সামান্য একটু হালুয়া নিয়ে মুখে পুরল আজিব। এক চিবান দিয়েই বলে উঠল, দূর, দাদি! কিচ্ছু হয়নি! মিষ্টিই হয়নি, এ আবার হালুয়া হল!

তাজ্জব হয়ে নাতির মুখের দিকে তাকাল দাদি। তার বানানো বেদানার হালুয়া খেতে ভালো না, জীবনে এই প্রথম শুনল। বলল, তুই কী বলছিস, আজিব! আমার হালুয়া ভালো হয়নি। জানিস, এই জিনিস দুনিয়ায় আর কেউ বানাতে পারে না! পারত আমার মা। সে শিখেছিল তার মায়ের কাছে, তার মা আবার তার মায়ের কাছে। এমনি বংশগতভাবে চলে এসেছে। আমি ছাড়া এখন যদি আর কেউ বানাতে পারে, সে তোর বাবা। ছোটবেলায় আমার কাছে বানানো শিখেছিল। জীবনে খাসনি, অথচ বলছিস খেতে ভালো না!

একটু ভয়ে ভয়েই বলল আজিব, দাদি, তুমি রাগ কোরো না। একটা কথা বলব তোমাকে, মাকে কিংবা নানাকে বলবে না, যদি কথা দাও।

কোনো কিছু না ভেবেই বলে ফেলল দাদি, না বলব না। কী কথা, বল।

আজিব বলল, বাজারের পথে ঘুরতে ঘুরতে এক মিষ্টিওয়ালার দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। খাবারের এমন দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছিল, পানি এসে গেল জিভে। সামলাতে পারলাম না। ঢুকে পড়লাম দোকানে। ওখানেও এই বেদানার হালুয়াই

খেয়েছিলাম। কী যে তার স্বাদ, দাদি, কী বলব তোমাকে! এখনও যেন লেগে রয়েছে জিবে। তুমি রাগ কোরো না, দাদি, ওই জিনিসের কাছেও না তোমার হালুয়া।

আজিবের কথায় ভীষণ রেগে গেল দাদি। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বেচারা সাইদের ওপর। ধমকে উঠল, তুই...তুই আমার নাতিকে নষ্ট করেছিস! উজিরের ঘরের ছেলেকে তুই নিয়ে গেছিস বাজারের মিষ্টিওয়ালার ঘরে!

তাড়াতাড়ি সাফাই গাইবার চেষ্টা করল সাইদ, না না দাদিজান, দোকানে ঢুকিনি। শুধু বাইরে থেকেই একটু চেখে...

বাধা দিয়ে বলে উঠল আজিব, সাইদ ভাই মিথ্যে কথা বলছে, দাদি। আমরা দোকানে ঢুকে পেট ভরে হালুয়া খেয়েছি। কী যে স্বাদ, কী বলব দাদি!

সাইদের দিকে তাকিয়ে রাগে ফুঁসে উঠল দাদি, এই কাণ্ড। আর এদিকে বলছিস পেটে অসুখ। রাক্ষসের মতো কী না কী গিলে এসেছিস, ছেলেটাকেও গিলিয়ে এনেছিস। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। ছুটে গিয়ে সামস আল-দিনকে সব বলে দিলে দাদি।

সব শুনে রেগে গেল সামস আল-দিন। সাইদকে ডেকে পাঠাল। জিজ্ঞেস করল, কী রে হতভাগা। যা শুনলাম, সব সত্যি?

হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল সাইদ, কিছু বলল না।

ধমকে উঠল উজির।

ভয়ে মিনমিন করে বলল সাইদ, না হুজুর, শুধু দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দারুণ খোশবু বেরোচ্ছিল...

খেঁকিয়ে উঠল উজির, একটু চেখে দেখেছিস, এই তো?

ইতস্তত করে বলল সাইদ, আমি চেখে দেখেছি। কিন্তু আজিব ভাইজানকে ছুঁতে দিইনি।

খেঁকিয়ে উঠল উজির, এই হারামজাদা! আবার মিথ্যে কথা, সত্যি কথা বল!

সাইদ তবু আজিবের খাওয়ার কথা স্বীকার করল না।

শেষে নফরদেরকে ডেকে সাইদকে বাঁধতে বলল সামস আল-দিন। একটা বেত নিয়ে খোজার পিঠে আচ্ছা করে কয়েক ঘা লাগাল। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল সাইদ। উজির আবার মারতে যেতেই কাঁপতে কাঁপতে বলল, হুজুর, আর মারবেন না। সত্যিই পেট পুরে খেয়েছি আমি। আজিব ভাইজানও খেয়েছেন। আর খাব না-ই বা কেন। কী যে স্বাদ সে হালুয়ার!

অনেক কষ্টে হাসি চাপল উজির।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল দাদি। ধমকে উঠল, আবার মিথ্যে কথা! আমার হালুয়া খারাপ হতেই পারে না। ঠিক আছে, যা আবার বাজারে যা। আধ দিনার দিচ্ছি। বেদানার হালুয়া কিনে নিয়ে আয়। ভাইজান খেয়ে বিচার করুন, কারটা ভালো হয়েছে। আমারটা না বাজারেরটা। যা।

আবার বাজারে ছুটল সাইদ। ঢুকল হাসানের দোকানে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আরে ভাই, কী জিনিস খাইয়েছ তুমি। কী বিপদেই-না পড়েছি। ভালো হয়েছে বলতে গিয়ে পড়েছি ভালো বিপদে। হালুয়া নিয়ে তর্ক বেধেছে তাঁবুর এক বিবিজানের সাথে। তিনিও বেদানার হালুয়া বানিয়েছেন। কিন্তু তোমারটার মতো ভালো হয়নি। দাও তো ভাই, আধ দিনারের হালুয়া। ভালো দেখে দিয়ো। উজির হুজুর খাবেন। কারটা ভালো হয়েছে, বিচার করবেন। দাও জলদি দাও।

হেসে বলল হাসান, নিশ্চিন্তে হালুয়া নিয়ে যান, ভাই। কোনো ভাবনা নেই। আপনার কথাই ঠিক হবে। আমি আর আমার মা ছাড়া এ জিনিস আর কেউ বানাতে পারবে না। আমার মা বসরায় থাকেন। ছেলেবেলায় তার কাছেই হালুয়া বানানো শিখেছি।

অনেকখানি হালুয়া এনে দিল হাসান।

মিষ্টিওয়ালা দাম নিতে চাইল না, তবু জোর করে তার হাতে আধ দিনার গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এল সাইদ। ছুটতে ছুটতেই ফিরল তাঁবুতে।

পাত্রের ঢাকনা খুলে হালুয়ার গন্ধ নিয়েই সন্দেহ হল দাদির। আঙুল দিয়ে খানিকটা হালুয়া তুলে নিয়ে মুখে দিল। এক চিবান দিয়েই চেঁচিয়ে উঠে হুঁশ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

বেচারা সাইদের তখন অবস্থা কাহিল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে।

সেবাযত্ন করে হুঁশ ফেরান হল দাদির। চোখ খুলে উজিরকে সামনে দেখে বলে উঠল, আল্লা এতদিনে মুখ তুলে চাইল, ভাইজান। আমার ছেলে হাসানকে পেয়েছি। ওই বেদানার হালুয়া সে ছাড়া আর কেউ বানায়নি। এত ভালো জিনিস বানানোর কায়দা আর কেউ জানে না। খুশিতে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল হাসানের মায়ের চোখ থেকে।

উজিরের মাথায় তখন ভাবনা চলছে। গম্ভীর মুখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সামস আল-দিন। আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, আল্লা মেহেরবান।

নিজের তাঁবুতে ফিরেই নফরদের ডাকল উজির। নফরদের সর্দারকে হুকুম দিল, তোর বিশজন লোক নিয়ে এখনি সাইদের সঙ্গে যা। বাজারের ওই মিষ্টিওয়ালাকে ধরে নিয়ে আসবি। তার দোকানের ব্যবস্থা আমি করছি।

নফরেরা বেরিয়ে গেল। উজিরও বেরোল। দামেস্কের কোতোয়ালের বাড়ি খুঁজে বের করল। নিজের পরিচয় দিল কোতোয়ালকে। মিশরের সুলতানের অনুরোধপত্র দেখাল।

রীতি মোতাবেক উজিরকে সম্মান জানাল কোতোয়াল। বলল, হুজুর নিশ্চয় কোনো কথা বলতে চান। তা কী খিদমত করতে পারি?

সামস আল-দিন বলল, বাজারের এক মিষ্টিওয়ালাকে ধরে নিয়ে যেতে চাই।

একজন সামান্য মিষ্টিওয়ালাকে বন্দি করার জন্য এত তোড়জোড়! অবাক হল কোতোয়াল। বলল, বেশ তো, লোক দিয়ে দিচ্ছি। ওদেরকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিন। কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে হুকুম দিল কোতোয়াল, তোমরা এর সঙ্গে যাও। যা

হুকুম দেবেন, পালন করবে। খরবদার, মুখের ওপর কোনো কথা বলবে না, ইনি কায়রোর উজির।

সৈন্যরা সেলাম জানাল সামস আল-দিনকে। চলল তার সঙ্গে।

মিষ্টিওয়ালার দোকান খুঁজে পেতে বেশি দেরি হল না। সামসের নফরেরা তখন বেঁধে ফেলেছে হাসানকে। জটলা করছে দোকানের সামনে। লোকের ভিড় জমে গেছে। নিরীহ লোকটাকে কেন বাঁধা হল, কৈফিয়ত চাইছে লোকেরা। সৈন্যদের আসতে দেখে একজন দুজন করে কেটে পড়ল ওরা। কে অকারণে বিপদে পড়তে চায়?

সৈন্যরা এসে চড়াও হল হাসানের দোকানের ওপর। উজিরের নির্দেশে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল দোকান। জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করল। মিষ্টি-ভরা রেকাবিগুলো ছুড়ে ফেলল রাস্তায়। হাসানের পাগড়ি খুলে সেটা দিয়েই তাকে পিছমোড়া করে বাঁধল উজিরের নফরেরা। তারপর তাকে নিয়ে চলল তাঁবুতে।

সৈন্যদের বিদায় করে দিল সামস আল-দিন। তাঁবুতে ফিরে এল।

গম্ভীর হয়ে তাঁবুতে বসে আছে উজির। নফরেরা হাসানকে নিয়ে এসে তার সামনে খাড়া করল।

উজিরকে সেলাম জানিয়ে বলল হাসান, আমার ওপর এ অত্যাচার কেন, উজির সাহেব? কী আমার অপরাধ?

গর্জে উঠল সামস আল-দিন, বেদানার হালুয়া তুমিই বানিয়েছিলে?

মনে মনে বলল হাসান, হায় হায়, সাধারণ হালুয়ার জন্য আমার এই সর্বনাশ। মুখে বলল, জী হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? হালুয়া বানানোর অপরাধে ফাঁসি হবে নাকি আমার?

কঠোর গলায় বলল উজির, ফাঁসি? ফাঁসি হলে তো ভালোই ছিল। আরামে মরতে পারতে। তারচেয়েও কঠিন শাস্তি পাবে। বলেই নফরদের হুকুম দিল, জলদি একটা বাক্স নিয়ে আয়। বেটাকে ভরে ফেল বাক্সে।

একটা কাঠের বাক্সে ভরে ফেলা হল হাসানকে। সেটাকে উটের পিঠে চাপানোর হুকুম দিল উজির। সে রাতেই তাঁবু তোলা হল। কায়রোর দিকে রওনা হল উজিরের কাফেলা।

পরের দিন একটানা চলল কাফেলা। সাঁঝের দিকে একটা মাঠের ধারে তাঁবু ফেলা হল। আজিবের মা আর দাদির অগোচরে বাক্স থেকে বের করে খাওয়ানো হল হাসানকে! তারপর আবার ভরে ফেলা হল বাক্সে।

রাতটা মাঠের ধারেই কাটিয়ে পরের দিন আবার চলল কাফেলা। সাঁঝের দিকে সুবিধামতো জায়গা দেখে আবার তাঁবু পড়ল! তার পরের দিন সকালে আবার চলা।

হাসানকে আজিবের মা আর দাদির অগোচরে বের করা হয় বাক্স থেকে খাওয়ানো হয়, পায়খানা-পেশাব করার সুযোগ দেয়া হয়। তারপর উজির জিজ্ঞেস করে,

আসলেই কি তুমি বেদানার হালুয়া বানিয়েছিলে? সত্যি কথা বল, সময় আছে এখনও। অন্য কেউ বানিয়ে থাকলে তাকেই শাস্তি দেব।

শান্ত গলায় বলে হাসান, আমিই বানিয়েছিলাম। আমি আর আমার মা ছাড়া এ জিনিস আর কেউ বানাতে জানে না।

সঙ্গে সঙ্গে নফরদের হুকুম দেয় উজির, এই বেটারা, ভরে ফেল একে বাক্সে। কায়রোয় ফিরি আগে। তার দেখাব মজা!

নিরাপদেই একদিন কায়রোয় পৌঁছে গেল উজিরের কাফেলা। সাঁঝ হতে বেশি দেরি নেই। বাড়ির সদর দরজায় এসে থামল কাফেলা। মালপত্র সব নিয়ে তোলা হতে লাগল বাড়িতে। আজিবকে নিয়ে বাড়িয়ে গিয়ে ঢুকল হুসন আর হাসানের মা।

সোজা নিজের ঘরে চলে এল উজির। হুসনকে ডেকে পাঠাল।

হুসন এসে দাঁড়াল উজিরের সামনে। চোখ ফোলা। হাসানের জন্য একটু আগে সে কাঁদছিল। হাসানকে ধরে আনা হয়েছে, জানে না।

হেসে বলল সামস আল-দিন, চোখের পানি মুছে ফেল, মা। যাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, তাকে ধরে এনেছি আমি। সব কথা পরে বলব। এখনি গিয়ে তোর ঘরটা সাজিয়ে ফেল। বাসররাতে যেভাবে সাজানো হয়েছিল ঘরটা, তেমনি করে সাজিয়ে ফেল গিয়ে। তুই গিয়ে সেই সেদিনকার মতোই সাজগোজ করে বাসরঘরে ঢোক। এরপরের ব্যবস্থা সব আমি করব। যা, জলদি যা।

হাঁ করে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হুসন, কিছুই বুঝতে পারছে না।

তাগাদা দিল উজির, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, মা? যা! হাসানকে ধরে এনেছি আমি। বাসরঘরে তার সঙ্গে তোর আবার দেখা হবে। যা।

আনন্দে আবার কেঁদে ফেলল হুসন। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এক দঙ্গল দাসী-বাঁদির সাহায্যে বাসরঘর সাজিয়ে ফেলল হুসন। সিন্দুক থেকে বের করল বিয়ের দিনের পোশাক, গহনাপাতি সব। তারপর সাজতে বসল।

বহুদিন পরে আবার পুরনো সিন্দুক খুলল সামস আল-দিন। হাসানের কাপড়চোপড় যেগুলো তুলে রেখেছিল, সব বের করল। সওদাগরের কাছে জাহাজের মাল বেচার রসিদের নকল, হাসানের বাপের সই করা দলিল, যেটা যেখানে যেমন ছিল, তেমনি করে কোর্তার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। ওগুলো রাখল হুসনের বিছানায়। বাসররাতে যেভাবে ফেলে রেখেছিল হাসান, ঠিক তেমনিভাবে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখল উজির। না, কোনো ভুল নেই। ঠিক সেদিনের মতোই ঘর সাজিয়েছে হুসন। বলল, বাহ্ সব মনে আছে দেখছি, মা! কিছুই ভুলিসনি। আমি যাই। হাসানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকবি। হাসানের ঘুম ভাঙলে ও বিছানা থেকে নামার আগে ঢুকবি না। ও নেমে দাঁড়ালে, ঘরে ঢুকবি। বলবি, গোসলখানায় এতক্ষণ কী করছিলে? কিছু একটা জবাব দেবে সে। তারপরে

কী বলতে হবে, সেটা তুই বুঝবি। তবে একটা কথা, কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করবি না। সারাক্ষণ হাসিগল্পে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করবি। বুঝেছিস?

নিঃশব্দে মাথা কাত করল হুসন, বুঝেছে।

মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল উজির। লোক পাঠিয়ে হকিম সাহেবের কাছ থেকে একটা ওষুধ আনাল।

বাক্সটা উজিরের ঘরেই এনে রাখা হয়েছে। ভিতরে থেকে শ্বাস নিতে যাতে কষ্ট না হয়, এজন্য বেশ কিছু ফুটো আছে বাক্সের গায়ে। ওষুধের শিশির মুখ খুলল উজির। ফুটোর কাছে ধরল শিশির মুখ। কিছুক্ষণ ধরে রাখল। তারপর শিশিটা সরিয়ে রাখল। কয়েকজন নফরকে ডাকল।

বাক্সের ডালা তুলে ধরল নফরেরা। ভিতরে উঁকি দিল উজির। গভীর ঘুমে অচেতন হাসান। তবে বেশিক্ষণ ঘুম থাকবে না। ওষুধের ক্রিয়া কাটলেই সজাগ হয়ে যাবে।

নফরদেরকে হুকুম দিল উজির, হাসানকে তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে হুসনের বিছানায়।

হুকুম তামিল করল নফরেরা। পিছু পিছু গেল উজির। হুসনের ঘরের একটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল।

ওষুধের ক্রিয়া কাটল। ঘুম ভাঙল হাসানের। আস্তে আস্তে চোখ মেলল। মাথার উপরের ঝাড়বাতির দিকে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল চোখ। এই বাতি কোথায় দেখেছে! চেনাচেনা লাগছে! হঠাৎ তড়াক করে উঠে বসল। পাগলের মতো তাকাতে লাগল চারদিকে! এ দৃশ্য তো মিশে আছে তার রক্ত মজ্জায়। সেই নীল চাদরে ঢাকা বিছানা, ফুলের ছড়াছড়ি। স্বপ্ন দেখছে আবার! চোখ ডলল! চিমটি কাটল গায়ে। কই না, জেগেই তো আছে! স্বপ্ন নয়!

লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল হাসান। বিড়বিড় করে বলল, ইয়া আল্লা, এ-ও সম্ভব! এ-ও সম্ভব!

এই সময় পাশের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল হুসন। যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে হেসে বলল, কী হল, এতক্ষণে এলে? গোসলখানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

বিমূঢ়ের মতো হুসনের দিকে তাকিয়ে আছে হাসান। বিড়বিড় করে বলল, সবই স্বপ্ন! আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। সকাল হলেই মিলিয়ে যাবে সব!

ভুরু কুঁচকে বলল হুসন, কী বলছ বিড়বিড়িয়ে? নেশাভাঙ করেছ নাকি গোসলখানায় ঢুকে?

বিমূঢ়তা কাটেনি হাসানের। বলল, কী জানি, হুসন, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। হয় এখন স্বপ্ন দেখছি, নয়তো খানিক আগে দেখছিলাম। মিষ্টিওয়ালা হয়ে গিয়েছিলাম স্বপ্নে।

খিলখিল করে হেসে উঠল হুসন। এগিয়ে গেল হাসানের দিকে।

আর কিছু দেখার দরকার নেই। নিজের ঘরে ফিরে এল উজির।

হঠাৎ এই চমক, তার ওপর ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে হাসানের। টলে উঠল সে। ধরে ফেলল হুসন। ধরে ধরে নিয়ে এল বিছানার কাছে। আদর করে শুইয়ে দিল। পাশে শুয়ে বিলি কেটে দিতে লাগল হাসানের মাথায়। ঘুমিয়ে পড়ল আবার হাসান।

স্বামীর ঘুমন্ত মুখে বার বার চুমু খেল হুসন। আনন্দে চোখ থেকে অনবরত পানি গড়াচ্ছে। মনে মনে লাখো-কোটিবার শুকরিয়া জানাল খোদাকে। সারাটা রাত জেগে কাটাল।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল হাসানের। জানালার বাইরে ধূসর আলো। সেই প্রথম দিনের মতো লাগছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল হাসান। গভীর আবেগে টেনে নিল তাকে বুকে। বলল, আবার তোমাকে পেলাম। এত বছর পরে!

অবাক হবার ভান করল হুসন। বলল, আবার পেলে কোথায়! আজ রাতেই তো বিয়ে হল আমাদের! আজই তো জীবন শুরু করলাম।

হাঁ করে পায়ের কাছে ফেলে রাখা নিজের জামাকাপড়গুলোর দিকে তাকাল হাসান। আবার স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, কী জানি! এত বছর দামেস্কে কাটালাম, হাজী আবদুল্লাকে বাপ ডাকলাম, মিষ্টি বানালাম, শেষমেশ হালুয়া বানিয়ে বন্দি হলাম। বাক্সে ভরে উটের পিঠে চাপিয়ে দূরপথ পাড়ি দেয়ানো হল আমাকে। এক উজির আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। বলল, আগামী কালই আমাকে কোতল করা হবে।

ইচ্ছে করেই চোখ বড় বড় করে ফেলল হুসন। হালকা গলায় বলল, ও মা, তাই নাকি! কী অপরাধ করেছিলে!

হাসান বলল, জানি না। তবে উজির বলছে, হালুয়ায় চিনি কম দিয়েছি।

হাসল হুসন। বলল, সবই স্বপ্ন, বুঝলে? নইলে এই সামান্য কারণে কেউ কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়?

ফুরফুরে ঠাণ্ডা ভোরের কোমল হাওয়া আসছে খোলা জানালা দিয়ে। কিন্তু দরদর করে ঘামছে হাসান। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল হাতটা। ক্ষতটায় আঙুল ঠেকেছে। বলে উঠল, স্বপ্নই যদি দেখব, এই কাটাটা এল কোথা হতে? এক সুন্দর কিশোর ঢিল মেরেছিল এখানে! দামেস্কের পথে তাকে অনুসরণ করেছিলাম বলে...

এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। বাইরে থেকে সাড়া দিল সামস আল-দিন। কাপড় ঠিকঠাক করে বসল হুসন।

ঘরে এসে ঢুকল সামস আল-দিন। দেখেই তড়াক করে উঠে বসল হাসান। বলে উঠল, হুসন, ওই তো! এই লোকই ধরে এনেছে আমাকে! কোতল করবে!

জোর করে হাসি চাপল হুসন।

হাসি চাপতে কষ্ট হল উজিরেরও। অভয় দিয়ে বলল হাসানকে, ভয় পেয়ো না, বাবা! তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিন্তু কারণ ছিল। আমি হুসনের বাবা, সামস আল-দিন। তোমার বাপ নূর আল-দিন আমার ছোট ভাই। কিন্তু তুমি যে আসল হাসান বদর আল-দিন, নিশ্চিত হওয়ার দরকার ছিল। তাই তোমাকে কিছু পরীক্ষা করেছি। এ কারণেই কষ্ট দিতে হয়েছে তোমাকে। তুমি আমাকে মাপ করে দিয়ো। আল্লার অশেষ দয়ায় আবার তোমাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। তবে তোমার ছেলে না থাকলে হয়তো খুঁজে পেতাম না তোমাকে

অবাক হয়ে বলল হাসান, আমার ছেলে!

মাথা দোলাল উজির, হ্যাঁ, তোমার ছেলে। আজিব। তোমার দোকানে মিষ্টি খেয়েছিল। এখনি ডেকে আনছি তাকে। আর হ্যাঁ, বসরা থেকে তোমার মাকেও নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। তাকেও দেখতে পাবে এখনি।

এরপর আর কী? স্বামী-স্ত্রী, বাপ-ছেলে, মা-ছেলের মিলন হল।

সুখে কাটতে লাগল তাদের দিন।

অনেকক্ষণ একটানা গল্প বলে থামল উজির জাফর। তারপর বলল, শুনলেন তো, জাঁহাপনা? কত সহজ কারণে কত অঘটন ঘটে যায় মানুষের জীবনে?

স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ জাফরের গল্প শুনছিলেন খলিফা হারুন অর-রশিদ। মুগ্ধ হয়ে বললেন, দারুণ তোমার গল্প, জাফর! চমৎকার!

হাতজোড় করে বলল জাফর, জাঁহাপনা, রায়হানের কী হবে?

খলিফা বললেন, মিথ্যে কথা বলেছে ও, জাফর। অন্যায় করেছে। আর তার এই অন্যায়ের জন্যই বেচারা যুবক তার বিবিকে হারিয়েছে। তবে যুবকেরও দোষ আছে। কোথায় কী শুনল, অমনি গিয়ে খুন করে বসল বিবিকে, এত বছরের বিশ্বাসী বিবিকে একটিবারের জন্য কোনো প্রশ্ন করল না। এটা তো সে ভালো করেনি! যাকগে, ওদের দুজনকেই সামান্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিচ্ছি। আল্লাহ ওদের মাপ করুন।

থামল শাহরাজাদ। শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল, গল্প কেমন লাগল, জাঁহাপনা?

শারিয়ার জবাব দিল, অপূর্ব! জবাব নেই।

বিনীত গলায় জানতে চাইল শাহরাজাদ, নতুন আর কোনো গল্প কি শুনবেন? চিনের সেই কুঁজোর গল্প।

জোর গলায় বলল শারিয়ার, সেটা আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? নিশ্চয়ই শুনব! বল বল, বলে যাও!

আবার গল্প শুরু করল শাহরাজাদ :

চিনের কুঁজো

এক সময়ে চিন দেশের এক শহরে বাস করত এক দর্জি। দিলদরিয়া মেজাজের লোক। কারোর সাতে-পাঁচে নেই। খাওয়া পরার জন্য যতটা দরকার, রোজগার করে। বাকি সময় হৈ-হল্লা আনন্দ করে কাটায়।

দিনের বেলা দোকানে কাজ করে দর্জি, বিকেল হলে উঠে পড়ে। দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরে। বিবিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। কখনও নদীর ধারে, কখনও অন্য কোথাও ঘুরে ফিরে হাওয়া খেয়ে, কিছু কেনার থাকলে কিনে, বাড়ি ফেরে। রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমোতে যায়। নির্ঝঞ্ঝাট নিরাপদ জীবন।

একদিনের কথা। অন্যান্য দিনের মতো কাজ সেরে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে এল দর্জি। বৌকে নিয়ে বেড়াতে বেরোল নদীর ধারে। খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে বাড়ি ফিরবে, এই সময় এক কুঁজোর সঙ্গে দেখা। কুঁজোটাকে দেখেই হেসে ফেলল দর্জির বৌ। আসলে লোকটার আচার-আচরণ সবই কেমন হাস্যকর।

দর্জির বৌকে হাসতে দেখে মজা পেল কুঁজোও। সে-ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি আর ভাঁড়ামি করে হাসাতে চেষ্টা করল স্বামী-স্ত্রীকে।

হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড় হল দর্জি আর তার বৌয়ের। শেষে কুঁজোকে দাওয়াতই করে বসল দর্জি। বলল, দারুণ লোক তো হে তুমি! খুব হাসাতে পার যা হোক। চল, আজ আমাদের বাড়িতে তোমার দাওয়াত। সন্ধেটা ভালোই কাটবে

রাজি হয়ে গেল কুঁজো।

কুঁজো আর বৌকে বাড়িতে রেখে আবার বেরোল দর্জি। মেহমান নিয়ে এসেছে, কিছু বাজার-সদাই করা দরকার।

দর্জি বাজার করে ফিরলে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করল তার বৌ। খাবার সাজিয়ে ডাকল কুঁজোকে।

খাবার মোটামুটি ভালোই। ভাজা মাছ, রুটি, লেবু আর বেশ বড়সড় এক ফালি তরমুজ।

খেতে বসেও হাসাচ্ছে কুঁজো। ভাঁড়ামি করতে গিয়েই একবার জোর হাঁ করে ফেলল কুঁজো। শয়তানি বুদ্ধি ঢুকল দর্জির বৌয়ের মনে। চট করে বড় এক টুকরো মাছ নিয়ে কুঁজোর মুখে গুঁজে দিল সে।

হাসি বন্ধ হয়ে গেল কুঁজোর। বেঁটেখাটো ছোট্ট মানুষ। মাছের টুকরোটা চিবানোর জায়গা নেই তার ছোট মুখে। ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দর্জির বৌ হাত দিয়ে তার মুখ চাপা দিল। হাসতে হাসতে বলল, উঁহু, ফেল না, ভাই, ফেল না। তাহলে ভীষণ দুঃখ পাব!

কষ্টেসৃষ্টে মাছটা নেড়েচেড়ে গেলার চেষ্টা করল কুঁজো। পারল না। কাঁটাওয়ালা মাছের টুকরো গলায় আটকে দমবন্ধ হয়ে মরে গেল কুঁজো।

চোখের সামনে বেচারা লোকটাকে মরে যেতে দেখল দর্জি আর তার বৌ। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। কপালের লিখন · নইলে কেনই-বা লোকটাকে নদীর ধার থেকে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসবে? আর আনলই যদি, কেনই-বা দুষ্টবুদ্ধি চাপল দর্জির বৌয়ের মনে? যাই হোক, মৃত্যু ওভাবে ছিল, মরল কুঁজো। কিন্তু বিপদে ফেলে দিয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীকে।

দর্জিটা বোকাসোকা গোছের। বৌটা আবার খুব চালাক। দর্জি বলল, মেরে ফেললে! এখন কী করা যায়?

বৌ বলল, এক কাজ কর, কাঁধে তোলো মড়াটাকে। আমি শাল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। দর্জির ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, ঠিক আছে, তোমার দরকার নেই। শালে জড়িয়ে আমিই নিচ্ছি। তুমি শুধু আমার পিছনে থাক। বাকি কাজ আমিই করছি।

শালে জড়িয়ে লাশটাকে কাঁধে নিয়ে পথে নেমে এল দর্জির বৌ। পিছনে রইল দর্জি।

ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতে করতে হাঁটছে দর্জির বৌ। মানুষজনকে কাছাকাছি হতে দেখলেই গলা আরও চড়িয়ে দেয়। বলে, ও গো আমার কী হবে গো! ছেলেটা আর বাঁচবে না গো! আহারে, সোনার চাঁদ ছেলে আমার! শেষে বসন্তেই বুঝি মরল। তোমরা কে কোথায় আছ গো। এসে দেখো, ছেলেটার অবস্থা। সারা গা ছেয়ে গেছে।

বসন্তের নাম শুনেই দশ হাত দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায় লোকেরা। ওরা ধারণা করে, মেয়েলোকটার বাচ্চার বসন্ত হয়েছে। ছেলেকে নিয়ে এখন হকিমের বাড়ি যাচ্ছে। কাজেই সারা পথ নিরাপদেই পেরিয়ে এলে দর্জি আর বৌ।

এক ইহুদি হকিমের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দর্জিকে দরজার কড়া নাড়তে বলল বৌ।

এগিয়ে এসে কড়া নাড়াল দর্জি।

দরজা খুলে দাঁড়াল একটা নিগ্রো বাঁদি। জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

দর্জির বৌ জিজ্ঞেস করল, হকিম সাহেব বাড়ি আছেন?

মাথা দুলিয়ে বলল মেয়েটো, আছেন।

দর্জির দিকে তাকিয়ে বলল বৌ, মেয়েটাকে একটা সিকি দাও।

সিকি বের করে দিল দর্জি। তার বৌ মেয়েটাকে বলল, নাও বাছা, হকিম সাহেবকে গিয়ে দাও। আর বলো নিচে একজন রুগী এসেছে। আমার ছেলেটার খুব অসুখ। একটু তাড়াতাড়ি আসতে বল।

সিকিটা হাতে নিয়ে চলে গেল বাঁদি। উঁকি মেরে দেখল দর্জির বৌ, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি কুঁজোর লাশটাকে সিড়ির ধাপে বসিয়ে রেখে দর্জিকে বলল বৌ, চল, জলদি চল, কেটে পড়ি এখান থেকে। দর্জিকে ঠেলে বের করে আনল তার বৌ। তারপর হনহন করে হেঁটে চলল বাড়ির দিকে।

হকিমের হাতে সিকিটা দিয়ে বলল বাঁদি, নিচে একজন রুগী এসেছে। এই সিকিটা দিয়েছে, আপনার সেলামি।

চকচকে মুদ্রাটা ছোঁ মেরে তুলে নিল হকিম। বলল, বাহ্, খুব ভালো রুগী তো। আগাম পয়সা দিয়ে দিয়েছে। চল তো দেখি।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল হকিম। রুগী খুঁজছে। পিছনে বাতি, হকিমের ছায়া লম্বা হয়ে নেমে এসেছে সিঁড়ির শেষ মাথায়। চোখেও কম দেখে সে। কুঁজোর ছোট্ট লাশটা চোখে পড়ল না তার। রুগী খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নিচে নেমে এল সে। শেষ ধাপে নেমে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

উহ্, মাগো! বলে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে পড়ল হকিম। ইতিমধ্যে বাতি নিয়ে পৌঁছে গেছে বাঁদি। কিসে হোঁচট খেয়েছে, দেখার জন্য ফিরে তাকাল হকিম। কুঁজোর লাশটা চোখে পড়তেই আঁতকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি এসে পরীক্ষা করে দেখল। ভাবল, তার লাথি খেয়েই উল্টে পড়ে মরে গেছে রোগী। খুবই অনুতপ্ত হল ইহুদি। বিড়বিড় করে বলল, হায় প্রভু, এ কী পাপের ভাগী করলে আমাকে!

বসে বসে মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল ইহুদি। বাঁদিটা আর কোনো উপায় না দেখে ছুটে গিয়ে তার মনিবানিকে খবর দিল।

ছুটতে ছুটতে এল ইহুদির বৌ। কুঁজোর মরা লাশটাকে দেখল। তারপর ফিসফিস করে স্বামীকে বলল, রাত দুপুরে মরা লাশ নিয়ে বসে থাকলে চলবে নাকি? এর একটা বিহিত কর

বোকা বোকা চোখে বৌয়ের দিকে তাকাল হকিম। বলল, কী বিহিত করব?

খেঁকিয়ে উঠল বৌ, সেটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে নাকি। নিজেকে তো খুব বাহাদুর মনে কর। এখন? আরও খানিকক্ষণ গজগজ করল বৌ। তারপর বলল, শোন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। লাশটাকে কাঁধে নিয়ে উঠে এস। ছাত থেকে ছুড়ে ফেলে দাও পাশের মুসলমান বাড়িতে। ও বাড়িতে অনেক কুকুর আছে। রাতেই খেয়ে শেষ করবে লাশটাকে।

কুঁজোর লাশটাকে নিয়ে বৌয়ের পিছন পিছন ছাতে উঠে এল হকিম। লাশটাকে ছুড়ে ফেলল পাশের বাড়িতে। হাতমুখ ধুয়ে শুতে গেল নিজেরা।

মুসলমান লোকটা রাজার প্রধান বাবুর্চি। এমনিতেই রাত করে বাড়ি ফেরে। সেদিন রাজার ওখানে ভোজের আয়োজন হয়েছিল তাই ফিরতে আরও বেশি রাত হয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকেই কুকুরগুলোর চেঁচামেচিতে থমকে দাঁড়াল বাবুর্চি। জানোয়ারগুলো চেঁচাচ্ছে, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। গিয়ে দেখে, একটা লোক মরে পড়ে আছে। বাবুর্চি মনে করল, লোকটা চুরি করতে এসেছিল। অন্ধকারে ছাত বেয়ে আসছিল, পা ফসকে নিচে পড়ে গিয়ে মরেছে। মনে মনে অনেক আফসোস করল বাবুর্চি। কিন্তু আফসোসে তো আর মরা জিন্দা হবে না। তা ছাড়া এই অবস্থায় তাকে কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে। খুনের দায় এসে চাপবে ঘাড়ে। কাজেই লাশটার গতি করার কথা ভাবতে লাগল বাবুর্চি।

ভেবেচিন্তে লাশটাকে কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বাবুর্চি। অনেক রাত। পথে লোকজন নেই। অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায় গা ঢেকে বাড়ির কাছে বাজারে চলে এল সে। একটা দোকানের সামনের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রাখল লাশটাকে। শক্ত হয়ে গেছে লাশ! দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে খুব একটা অসুবিধে হল না বাবুর্চির। আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে চাইতে বাড়ি ফিরল সে।

একটু পরেই বাজারে ওই গলিপথ ধরে এগিয়ে এল এক খ্রিস্টান। সাঁঝের বেলায় শুঁড়িখানায় ঢুকেছিল। তখন থেকেই মদ গিলছে। রাত অনেক হয়ে গেছে। তা-ও ওঠার নাম নেই। অনেক বার তাগাদা দিয়েছে শুঁড়িখানার মালিক। কিন্তু ওঠে না খ্রিস্টান। শেষমেশ তার মাথায় এক গ্লাস মদ ঢেলে দিতে বাধ্য হয়েছে মালিক।

টলতে টলতে এগিয়ে আসছে খ্রিস্টান মাতাল। জড়িত কণ্ঠে বিড়বিড় করছে, যিশু এই এলেন বলে। এখনি এসে পড়বেন। তারপর? তারপর দেখব কোথায় পালাও বাছাধন! আমার মাথায় মদ ঢাল? এত সাহস!

দোকানটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল মাতাল। ছায়ায় রাখা কুঁজোর লাশটাকে মনে করল জ্যান্ত মানুষ। খেপে গেল মাতাল, আরে! এ যে দেখছি আরেকটা! বেটা, তোর সাহস তো কম না! আমার পথ আগলে দাঁড়াস! সর্ বলছি, নইলে মারব এক ঘুসি।

মাতালের হুমকি শুনল না ছায়াটা, আগে মতোই দাঁড়িয়ে রইল।

আবার চেঁচিয়ে উঠল মাতাল। গাল দিল ছায়াটাকে। শিগগির পথ ছেড়ে না-দিলে পিটিয়ে তক্তা করার ভয় দেখাল। এরপরও সরল না দেখে অনুমানে ছায়ার মুখ লক্ষ করে মারল এক ঘুসি! গড়িয়ে পড়ে গেল কুঁজোর লাশ।

হেসে উঠল মাতাল। মুখ ভেঙচে বলল, কী, নবাবের বাচ্চা, এবার। এবার কেমন বুঝলি? ওকি, আবার পড়ে রইলি কেন? সর, জায়গা ছাড়।

কুঁজোর লাশটা পড়েই রইল। রেগে গিয়ে সমানে ওটাকে লাথি মারতে লাগল মাতাল। চেঁচিয়ে গাল দিতে লাগল।

মাতালের চেঁচামেচিতে সেখানে এক পাহারাদার এসে হাজির। সে মনে করল, মাতালই কুঁজোকে মেরে ফেলেছে। কোমরে দড়ি বেঁধে মাতালকে কোতোয়ালের বাড়িতে নিয়ে চলল পাহারাদার।

বিড়বিড় করতে করতে চলল মাতাল, হায়, যিশু! এ কী করলে। আমি তো লোকটাকে মেরে ফেলতে চাইনি। শুধু খানিক প্যাঁদানি দিতে চেয়েছিলাম। এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। হে যিশু, পাহারাওয়ালার হাত থেকে বাঁচাও আমাকে।

হাতের লাঠি দিয়ে মাতালের পিঠে জোরে এক গুঁতো মারল পাহারাদার। খেঁকিয়ে উঠল, চুপ, ব্যাটা মাতাল!

চুপ করে গেল মাতাল।

অনেক রাত। কোতোয়াল ঘুমোচ্ছে। চাকর বলে দিল, এতরাতে হুজুরের সঙ্গে দেখা হবে না।

একটা নোংরা ঘরে সারারাত মাতালকে তালাবদ্ধ করে রাখল পাহারাদার। সকালে আবার নিয়ে গিয়ে হাজির করল কোতোয়ালের কাছে।

যে সে অপরাধ নয়। মানুষ খুন। সব শুনে মাতালের ফাঁসির হুকুম দিল কোতোয়াল। তবে তার আগে গলায় দড়ি বেঁধে ছাগলের মতো সারা শহর ঘুরিয়ে আনতে হবে আসামিকে। ভবিষ্যতে যেন এভাবে নিরপরাধ মানুষ খুন করতে সাহস না করে কেউ, তার জন্যই এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা।

মাতালকে সারা শহর ঘুরিয়ে আনা হল। লোকের মুখে ফাঁসির খবরটা শুনল মুসলমান বাবুর্চি। তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে এল সে কোতোয়ালের দপ্তরে। হাতজোড় করে বলল, জনাব, একটা কথা বলতে চাই।

গম্ভীর গলায় জানতে চাইল কোতোয়াল, কী কথা?

বাবুর্চি বলল, যাকে আপনারা ফাঁসি দিতে যাচ্ছেন, সে নিরপরাধ। তার কোনো দোষ নেই। কুঁজোকে খুন আমি করেছি।

অবাক হল কোতোয়াল। বলল, কী বল?

বাবুর্চি বলল, আমি রাজার প্রধান বাবুর্চি। গতকাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছি। দেখি, আমার উঠোনে কুঁজো মরে পড়ে আছে।

ধমকে উঠল কোতোয়াল, কিন্তু তুমি খুন করলে কিভাবে?

বুঝিয়ে দিল বাবুর্চি, জনাব, আমার ছাত থেকে পড়ে মারা গেছে লোকটা। কাজেই, দোষটা আমার ঘাড়েই বর্তায়।

বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাল কোতোয়াল। বলল, হ্যাঁ, ঠিকই বলছ। তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তবে নিজে থেকে এসে দোষ স্বীকার করেছ, তোমাকে আর দড়ি বেঁধে শহর ঘোরানো হবে না। খ্রিস্টান মাতালকে ছেড়ে দিয়ে বাবুর্চিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর হুকুম দিল কোতোয়াল।

চোখে কাপড় বেঁধে বাবুর্চিকে ফাঁসির দড়ির কাছে নিয়ে গেল জল্লাদ। ফাঁস পরাতে যাবে, এই সময় দর্শকদের ভিড় থেকে চেঁচানি শোনা গেল। ওকে ফাঁসি দেবেন না। ওর কোনো দোষ নেই। কুঁজোকে খুন করেছি আমি!

থমকে গেল জল্লাদ।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল লোকটা। সেই ইহুদি হকিম। কোতোয়ালের সামনে এসে বলল, জনাব, আমি খুন করেছি কুঁজোকে। গতরাতে আমার বাড়িতে গিয়েছিল সে। সাংঘাতিক কোনো অসুখ হয়েছিল। আমার বাড়ির সিঁড়ির গোঁড়ায় বসেছিল। অন্ধকারে দেখতে পাইনি। পা দিয়ে ধাক্কা মেরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিই ওকে। সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় লোকটা। পরে আমার বাড়ির ছাত থেকে বাবুর্চির উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিই লাশটা।

গম্ভীর হয়ে মাথা দোলাল কোতোয়াল। বলল, সাংঘাতিক অপরাধ করেছেন আপনি হকিম সাহেব। কিন্তু হকিম বলে তো আর ছেড়ে দিতে পারি না। মানুষ খুন করেছেন। শাস্তি পেতেই হবে। ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে আপনাকে। জল্লাদকে হুকুম দিল কোতোয়াল, এই বাবুর্চিকে ছেড়ে দাও। হকিম সাহেবকে নিয়ে ঝোলাও ফাঁসিতে।

দোকানে বসে কাজ করছিল দর্জি। এই সময় কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে তার দোকানের সামনে দিয়ে চলে গেল। ওদের কথা সব শুনতে পেল দর্জি। আর দেরি না করে কোতোয়ালের বাড়িতে ছুটল সে।

হকিমের গলায় ফাঁস পরানো শেষ। কাজ শেষ করতে যাবে জল্লাদ, এই সময় ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরিয়ে এসে কোতোয়ালের সামনে দাঁড়াল দর্জি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দোহাই, কোতোয়াল সাহেব, জল্লাদকে থামতে বলুন। হকিম খুন করেনি। খুনি আমি।

তাজ্জব হয়ে গেল কোতোয়াল। হল কী? কুঁজোর খুনের বিচার আর হবে না নাকি? একেকজনকে ফাঁসিতে লটকাতে যায়, কোথা থেকে আরেকজন এসে হাজির হয়। নিজের কাঁধে খুনের দায় নিয়ে ফাঁসি নিতে চায়।

ধমকে উঠল কোতোয়াল, এই বেটা, জলদি বল, কী করে খুন করলি।

দর্জি বলল, মাছের কাঁটা গলায় আটকে মারা গেছে কুঁজো।

আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল কোতায়াল, হারামজাদা! শয়তানির আর জায়গা পেলি না। কাঁটা আটকে মরে নাকি কেউ?

আগাগোড়া সব তখন খুলে বলল দর্জি।

শুনে বলল কোতোয়াল, এতক্ষণে আসল ব্যাপার বোঝা গেছে। তাই তো ভাবি, শুধু লাথি খেয়ে একটা লোক মরে কি করে! তবে যতই দোষ স্বীকার কর বাছা, খুনিকে তো ছাড়তে পারি না। তোমার ফাঁসি হবে। আমার এ হুকুমের আর নড়চড় হবে না। এবার আর কাউকে দোষ স্বীকার করার সময় দেব না। এই জল্লাদ, জলদি বেটাকে ঝোলাও। আবার কে এসে হাজির হবে!

টানতে টানতে দর্জিকে ফাঁসির মঞ্চের কাছে নিয়ে গেল জল্লাদ।

মাতালকে শহর ঘোরাতে দেখেছিল রাজার এক নফর। সে গিয়ে সব বলেছে রাজাকে। শুনে কেমন খটকা লাগল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন তিনি কোতোয়ালের বাড়িতে, ফাঁসি যেন বন্ধ করা হয়। সব শুনে বিচার করে রায় দেবেন রাজা নিজে।

রাজার লোক কোতোয়ালের বাড়িতে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কয়েকবার আসামি বদল হয়ে গেল। লোক এসে দেখল, দর্জির গলায় ফাঁস পরানো হচ্ছে। চেঁচিয়ে হুকুম দিল সে, এই, এই জল্লাদ, থাম! থাম!

ডাণ্ডা মেরে ভিড় সরিয়ে কোতোয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল রাজার দূত। কর্কশ গলায় বলল, ফাঁসি হবে না। আসামিকে নিয়ে যেতে বলেছেন রাজা। তিনি এর বিচার করবেন।

মুখ গোমড়া করে ফেলল কোতোয়াল। আসামিকে ফাঁসি দিয়ে আর মজাটা নিতে পারল না সে।

শুধু দর্জিকে নিয়ে গেলে চলবে না। কারণ আগে আরও তিনজনকে আসামি সাব্যস্ত করা হয়েছিল। চারজনকে হাজির করা হল রাজার দরবারে।

মন দিয়ে চারজনের কথাই শুনলেন রাজা। সাংঘাতিক রেগে গিয়ে কোতোয়ালকে ধমকাতে লাগলেন তিনি, বেটা আহাম্মক! এজন্য তোমাকে রেখেছি আমি! যা বুঝতে পারছি, এদের কেউই খুনি নয়। যদি কাউকে খুনি বিবেচনা করতে হয়, সে দর্জির বৌ। কিন্তু ওই মহিলাও ইচ্ছে করে মারেনি কুঁজোকে! আর তুমি কিনা নিরপরাধ লোকগুলোকে ধরে ফাঁসিতে লটকাতে যাচ্ছিলে!

চুপ করে রইল কোতোয়াল। ভয়ে কাঁপছে।

চার আসামির দিকে তাকিয়ে বললেন রাজা, তবে যাই বলো, এভাবে লাশ গুম করতে যাওয়াটা কিন্তু মোটেই উচিত হয়নি তোমাদের। সেজন্য কঠোর শাস্তি পেতে হবে। নকল-নবীসকে ডাকলেন রাজা। বললেন, এই আজব ঘটনার কথা লিখে রাখ খাতায়।

হাতজোড় করে বলল খ্রিস্টান, জাঁহাপনা, একটা কথা বলব?

অনুমতি দিলেন রাজা।

খ্রিস্টান বলল, জাঁহাপনা, এই ঘটনায় আর আজবের কী দেখছেন? এরচেয়ে আজব ঘটনার কথা জানি আমি। অনুমতি দিলে বলতে পারি।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন রাজা, কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে বলো, আমার ভালো লাগলে তোমার শাস্তি মাপ করে দিতে পারি।

বলতে লাগল খ্রিস্টান :

খ্রিস্টানের কাহিনী

হুজুর, আমি এক বিদেশি। কায়রোতে আমার বাড়ি। ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাবার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। অনেক দেশ ঘুরেটুরে এসে শেষে আপনার দেশে হাজির হলাম। দেশটা পছন্দ হয়ে গেল বাবার। এইখানেই ব্যবসা শুরু করলেন তিনি। দালালির ব্যবসা।

বয়স হয়েছিল, দেশে আর ফিরতে পারেননি, এখানেই মারা গেলেন বাবা। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবসায়ের পুরো মালিক হলাম আমি। ব্যবসাটা আমাদের বংশগত। কাজেই কোনো অসুবিধে হল না। খুব ভালোই কাজ চালাতে লাগলাম।

একদিনের কথা। গদিতে বসে আছি। এক যুবককে গাধায় চড়ে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। দেখতে শুনতে বেশ সুন্দর। মনে হল, খানদানি ঘরের ছেলে। দামি আলখেল্লায় গা ঢাকা।

কাছে এসে আমাকে সেলাম জানাল যুবক। সেলামের উত্তর দিলাম। পকেট থেকে রুমালে বাঁধা কিছু তিলের বীজের নমুনা বের করে দেখাল সে। জানতে চাইল, কী দর যাচ্ছে এখন?

দেখে বললাম, একশো দিরহাম।

ঠিকানা লিখে দিল যুবক। বলল, আগামীকাল এই ঠিকানায় আসুন। দাঁড়ি-পাল্লা-বাটখারা আর লোক সঙ্গে নিয়ে আসবেন। বীজ নিয়ে যাবেন।

রুমালে বাঁধা তিলের বীজের নমুনা আমার সামনে ফেলে রেখে চলে গেল যুবক। একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগল। সব কাজই বাঁ হাতে করে যুবক। আলখেল্লার তলা থেকে একবারও বের করল না ডান হাতটা। বীজগুলো নিয়ে তখনি বেরোলাম। সোজা চলে গেলাম মহাজনের ঘরে। নমুনা দেখিয়ে বললাম, কত দেবেন?

মহাজন জিজ্ঞেস করল, কত বলেছ।

জানালাম মহাজনকে। সে বলল, ভালোই বলেছ। আমি তোমাকে একশো দশ দেব।

খুশি মনে গদিতে ফিরে এলাম। ভালো লাভ পাব।

পরের দিন সকাল সকালই বেরোলাম। যুবকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। মাল দেখিয়ে মাপতে বলল যুবক।

মোট পঞ্চাশ মণ মাল। যুবক বলল, সব নিয়ে যান। মণপ্রতি দশ দিরহাম দালালি পাবেন আমার কাছ থেকে। মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে সব টাকা আপনার

কাছে রাখবেন। আমার কিছু জরুরি কাজ আছে। সেরে, এক সময় গিয়ে টাকা নিয়ে আসব।

মালগুলো নিয়ে চলে এলাম। মহাজনকে মাল বুঝিয়ে দিয়ে পুরো দাম নিয়ে নিলাম। একদিনেই হাজার দিরহাম লাভ হল আমার। পাঁচশো মহাজনের কাছ থেকে, পাঁচশো যুবকের কাছ থেকে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত গদিতে বসে রইলাম যুবকের অপেক্ষায়। কিন্তু এল না সে। ভাবলাম, কোনো কাজে আটকে গেছে। পরদিনই এসে টাকা নিয়ে যাবে। সাড়ে চার হাজার দিরহাম, সোজা কথা তো না। কিন্তু পরের দিনও এল না সে। এল না তার পরের দিনও। ব্যাপার কী?

এক মাস পরে এল যুবক। তাড়াতাড়ি তার টাকার থলে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এই নাও, তোমার টাকা।

হেসে বলল যুবক, আরও কিছুদিন আপনার কাছেই থাক। আমার একটু অসুবিধে আছে, পরে একদিন এসে নিয়ে যাব।

আরও এক মাস পরে আবার এল যুবক। তাকে টাকা নিয়ে যেতে বললাম। নিল না সে। আরও কিছু দিন আমার কাছে রাখতে বলল।

আবার এক মাস পরে আবার এল সে। দুপুরবেলা গাধার পিঠে চেপে আমার গদি ঘরের সামনে দিয়ে চলেছে। আমার দিকে চোখ পড়তেই হেসে সেলাম জানাল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালাম। বললাম, আরে ভাই, চলে যাচ্ছ যে! তোমার টাকা নিয়ে যাবে না?

যুবক বলল, থাক না আরও কিছুদিন।

পরের টাকা আর কতদিন পাহারা দেব? অনিচ্ছা থাকলেও বললাম, ঠিক আছে! চলে যাচ্ছিল, বললাম, অনেক বেলা হয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়াটা আমার এখানেই খেয়ে যাও না

বিনীত গলায় বলল যুবক, না, আজ না। জরুরি কাজ আছে। অন্য একদিন এসে খাব। বলে চলে গেল যুবক।

অনেকদিন পরে আবার এল যুবক। কিন্তু টাকা নিল না। এভাবে কয়েকবারই এল সে, কথাও বলল আমার সাথে। কিন্তু তার টাকা আমার কাছেই রয়ে গেল।

এক বছর পেরিয়ে গেল, টাকা নিল না যুবক। দ্বিতীয় বছরে এক কাজ করলাম। এতগুলো টাকা শুধু শুধু পড়ে আছে আমার কাছে। যুবকের তো নেবার কোনো গরজই নেই। শতকরা বিশ ভাগ লাভে সুদে খাটাতে শুরু করলাম পুরো টাকাটা।

এবার অনেক দিন পরে এল যুবক। বললাম, কী ভাই, এতদিনের নেবার সময় হল?

সেই একই রকম ভাবে হাসল যুবক। বলল, না রে ভাই, এখনও বোঝা কমেনি আমার।

বললাম, তুমি কেমনতরো লোক রে বাপু! চেনা নেই শোনা নেই, এক বিদেশি লোকের কাছে এতগুলো টাকা এমনভাবে ফেলে রেখেছ।

আবার হাসল যুবক। বলল, চেনাশোনা নেই বলছেন কেন? দেড় বছর ধরে তো আপনার সঙ্গে চেনাজানা হল। এতদিনেও আমার টাকা মেরে দেবার কোনো ভাবনমুনা দেখাচ্ছেন না আপনি। এরচেয়ে বিশ্বাসী আর কোথায় পাব? বলে গাধার পিঠে চেপে হেলেদুলে চলে গেল যুবক।

দ্বিতীয় বছরের শেষে আরেকবার এল যুবক। পুরো টাকা সুদে-আসলে তখন আদায় করে এনেছি আমি। অনেক বেড়েছে পরিমাণ। সব টাকাই থলিসহ যুবকের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। বললাম, নাও ভাই. তোমার বোঝা নিয়ে আমাকে হালকা কর।

থলের দিকে হাত বাড়াল না যুবক।

বললাম, কী হল, নেবে না?

হাসল যুবক। এমনিতেই সে সুন্দর, সেদিন আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। দামি রেশমের কাপড়চোপড়, মাথায় সোনার জরির কাজ করা টুপি। চোখে সুরমা। বলল, আর কয়েকটা দিন সবুর করুন, ভাই। প্রায় শেষ করে এনেছি। আর দিন কয়েকের ভিতরেই এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন এসে টাকা নিয়ে যাব।

কী আর করব? টাকা নেবার গরজ নেই, এমন লোক এর আগে কখনও দেখিনি। শেষে বললাম, বেশ, টাকা থাক আমার কাছেই। কিন্তু আজ তোমাকে না-খাইয়ে ছাড়ছি না। খেয়ে যেতেই হবে।

যুবক বলল, বেশ, এত করে যখন বলছেন, খাব, তবে এক শর্তে।

বলে উঠলাম, যে কোনো শর্ত মানতে রাজি। তবু না খেয়ে যেতে দিচ্ছি না।

পকেট থেকে টাকা বের করল যুবক। বাঁ হাতেই। ডান হাত সেদিনও দেখলাম না। আমার দিকে টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নিন খরচ।

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কিসের খরচ!

যুবক বলল, বা-রে! এটাই তো আমার শর্ত। আজকের খাবারের সব খরচ আমার।

খুবই দুঃখ পেলাম। বলেই ফেললাম, এতই অহমিকা তোমার, ভাই, আমার টাকায় একবেলা খেতেও অপমান বোধ করছ! ঠিক আছে, তাই যদি তোমার ইচ্ছে...কথাটা শেষ না করেই খাবার আনতে বেরিয়ে গেলাম।

খুব ভালো দেখে মাংস কিনলাম। সবচেয়ে দামি মদ নিলাম এক বোতল। কিছু ভালো ফল আর মিষ্টিও নিলাম। ফিরে এলাম গদিতে। বাবুর্চিকে ডেকে মাংসটুকু দিয়ে ভালো করে রাঁধতে বললাম।

চমৎকার রাঁধল বাবুর্চি। পেট ভরে খেলাম আমরা। অবাক হয়েই খেয়াল করলাম, বাঁ হাত দিয়েই খেয়েছে যুবক। একবারের জন্যও ডান হাতটা বের করেনি আলখেল্লার তলা থেকে।

কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। যুবককে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, আচ্ছা, ভাই, কিছু মনে কোরো না। সবকাজই বাঁ হাতে কর তুমি। ডান হাতটা কি...

আমার কথা শেষ হবার আগেই উঠে দাঁড়াল যুবক, ভাবলাম, রাগ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু না, যাচ্ছে না সে। আস্তে করে গা থেকে আলখেল্লাটা খুলে ফেলল। দেখলাম, তার ডান হাত কবজি থেকে কাটা।

দুঃখ লাগল। এত সুন্দর ছেলেটার অঙ্গহানি করে দিল, এ কোন নিষ্ঠুর লোক! জানতে চাইলাম, হাতটা কাটল কী করে ভাই?

মলিন হাসি হাসল যুবক। বলল, আপনার হয়তো শুনতে ভালো লাগবে না।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, খুব লাগবে। তা ছাড়া, রাত তো এমন কিছু হয়নি। তোমার কোনো অসুবিধে না থাকলে বল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল একবার যুবক। তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আবার বসে পড়ল। বলল, শুনুন তাহলে আমার দুঃখের কাহিনী।

বাগদাদে আমার জন্ম। বাপ ছিলেন ওখানকার এক লাখোপতি সওদাগর। খুব অল্প বয়সে নিজের ব্যবসায়ে আমাকে জড়িয়ে নিলেন বাবা। বেশ তাড়াতাড়িই শিখে নিতে লাগলাম ব্যবসার খুঁটিনাটি।

কী সব দিন যে ছিল রে ভাই, তখন! পয়সা যেমন রোজগার করতেন, তেমনি খরচাও করতেন বাবা। রাজ্যের যত মুসাফির, তীর্থযাত্রী আর সওদাগরেরা এসে উঠত আমার বাড়িতে। রাত কাটাত। দেশ-দেশান্তর থেকে আসত তারা। কত অদ্ভুত গল্প শোনাত, খাওয়াদাওয়া হত, আমোদ-উৎসব হত।

হাসি-আনন্দে কেটে যাচ্ছিল দিন. এই সময় একদিন আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন বাবা। তাঁর সব সম্পত্তির মালিক হলাম আমি। যেখানে যত দেনা ছিল শোধ করলাম, যা পাওনা ছিল আদায় করলাম। নতুন ব্যবসা শুরু করলাম আমি। কাপড়ের ব্যবসা।

বাগদাদ আর মসুল কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। হাতে পুঁজি যা ছিল, সব দিয়ে নানারকম দামি কাপড়চোপড় কিনে ফেললাম। তারপর দিনক্ষণ দেখে একদিন সব মাল উটের পিঠে চাপিয়ে কায়রো রওনা হলাম। কয়েক দিন পরে নিরাপদেই পৌঁছলাম কায়রোতে।

সাঁঝ হয়ে গেছে। এক সরাইখানায় উঠলাম। একটা ঘর ভাড়া করলাম কাপড়ের গাঁটগুলো রাখার জন্য। মালপত্র নামানো হলে সঙ্গী নফরটার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে ভালো খাবার কিনে আনতে বললাম।

হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেলাম। নফরটাকে সরাইখানায় রেখে শহর ঘুরতে বেরোলাম। তরুণ বয়েস। প্রথমেই খোঁজ নিলাম মদের আড্ডা কোথায় বসে। খোঁজ পেতে দেরি হল না। সন্ধ্যাটা বেশ ভালোই কাটল। সরাইখানায় ফিরে এলাম অনেক রাতে। বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকাল সকাল উঠলাম ঘুম থেকে। নাস্তা সেরে নিয়ে নফরটাকে কাপড়ের গাঁট খুলতে বললাম। সব রকমের কাপড়ের একটা করে নমুনা নিয়ে গাঁটরি বাঁধলাম। রওনা হলাম বাজারে। যে কাজে এসেছি, সে কাজ সারতে হবে আগে। তারপর আমোদ-ফুর্তি করা যাবে চুটিয়ে।

বিদেশ বিভুঁই। কাউকে চিনি না, কোথায় কী হয় জানি না। খুঁজেপেতে একদল দালাল ঠিক করলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, বাগদাদ আর মসুলের বাহারি কাপড়চোপড় এনেছি। দামদর কেমন পাওয়া যাবে?

কয়েকটা নমুনা দেখল দালাল। বলল, ভালোই জিনিস এনেছেন। দাম ঠিক করতে পারছি না। চলুন, বাজারে যাই আগে। মহাজনদের দেখাই। তেমন বুঝলে বেচে শেষ করে দেব আজই।

দালালের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাজার ঘুরলাম। কোনো লাভ হল না। মাল বেচতে পারলাম না। মহাজনেরা যা দাম বলে, তারচেয়ে বেশি দামে কেনা আছে আমার। তার ওপর রয়েছে পথখরচ, দালালি, লাভ। তবে কি কাপড় কিনে ভুল করলাম? ভাবতে ভাবতে ফিরলাম দালালের গদিতে।

আমি মনমরা। দালালও ভাবছে। শেষে এক বুদ্ধি বের করল সে। বলল, একটা উপায় আছে। বাকিতে বেচে দিন সব মাল। নগদের চেয়ে অনেক বেশি দাম পাবেন। ভালো মুনাফা হবে আপনার। মাল নিয়ে হুণ্ডি করে দেবে আপনাকে মহাজনেরা। এক মাস পরে প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার কিস্তি দেবে। হপ্তায় দুদিন গিয়ে কিস্তি আদায় করবেন, বাকি দিনগুলো হেসে-খেলে আমোদ-ফুর্তি করে কাটাবেন। এই শহর আর নীলনদের শোভা আপনার খারাপ লাগবে না।

দালালের প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। কিস্তি যদি কথামতো ঠিকঠাক পেয়ে যাই, বাকিতে দিলেও ক্ষতি নেই। তা ছাড়া হাতে সময় পাব। শহরটা ভালো করে দেখতে পারব। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরেই-বা কী করব? রাজি হয়ে গেলাম।

দালাল সঙ্গে করে আবার মহাজনদের কাছে গেলাম। সেদিনই বিক্রি হয়ে গেল সব মাল। নগদ কিছু পেলাম না, ঠিক, তবে একগাদা হুণ্ডি পেলাম। আমাকে অভয় দিল দালাল, টাকা মার যাবে না। আদায় করে দেবার ভার তার ওপর।

খুশি মনেই সরাইখানায় ফিরলাম। পরের একটা মাস শুধু খাওয়া, ঘুমানো, ফুর্তি করা, ব্যস। আর কোনো কাজ নেই।

রোজ সকালে উঠে রুটি, মাখন, ডিম, আপেল, বেদানা, আঙুর, মিষ্টি দিয়ে নাস্তা সেরে নীলনদের ধারে বেড়াতে যাই। দুপুরে রুটি, মাংস, সবজি দিয়ে খাওয়া সারি। একটানা ঘুম দিয়ে বিকেলে উঠি। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে বেরিয়ে যাই। দুপুররাত পর্যন্ত ফুর্তি করে আবার সরাইখানায় ফিরি। কানের কাছে তখন রিনিঝিনি বাজে নুপুরের নিক্কন, সুমধুর গানের সুর তখনও কানে মধু ঢালতে থাকে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। সারারাত রঙিন স্বপ্ন দেখে ঝরঝরে মেজাজ নিয়ে ঘুম ভাঙে সকালে। এমনি করেই দারুণ সুখে কাটছিল দিন।

দেখতে দেখতে যেন চোখের পলকে কেটে গেল একটা মাস। তারপর থেকে শুরু হল কিস্তি আদায়। মহাজনেরা ভালোই, ফাঁকি দেবার প্রবণতা নেই কারো মাঝে। সময়মতো দিয়ে দেয় পাওনা। সোম আর বৃহস্পতিবার। একেক দিন একেক দোকানে গিয়ে বসি। আমার কিছু করতে হয় না। দোকানে দোকানে ঘুরে টাকা আদায় করে আনে আমার দালাল। নিজেরও বেশ মোটা রকমের বখরা আছে, তাই কাজে কোনো আলসেমি নেই তার।

বাজারের বেশ বড়সড় একটা রেশমের দোকানের মালিক, আমারই বয়েসি। ওর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। বেশির ভাগ সময় ওর দোকানেই বসি। কিস্তির দিন ছাড়াও ওখানে যাই, বেচাকেনা দেখি, আড্ডা দিই। নাম ওর বদর আল-দিন।

মেয়েমানুষের প্রতি বেজায় লোভ বদরের। বেশির ভাগ সময় মেয়েদের আলাপ নিয়ে মেতে থাকে আমার সঙ্গে। আমারও বয়স কম, ভালোই লাগে ও-সব আলোচনা। প্রায়ই বলে সে, আমার চেহারা নাকি খুবই সুন্দর। মেয়েভোলানো রূপ। তার চেহারা আমার মতো ভালো নয় বলে কতদিন আফসোস করেছে।

একদিনের কথা। বদরের দোকানে বসে আছি। এই সময় দোকানে এসে ঢুকল এক যুবতী, বোরখায় ঢাকা গা। মুখে নেকাব। পাতলা নেকাবের ভিতরে তার চেহারার আদলটা ভালোই আন্দাজ করতে পারলাম। টানা টানা চোখ, ধারাল নাক, ফুটফুটে গায়ের রঙ। ভুরভুর করে বাতাসে ছড়াচ্ছে যুবতীর গায়ে মাখা দামি আতরের সুবাস। নেশা ধরে যায়।

আমার কাছাকাছিই এসে বসেছে যুবতী। খেয়াল করলাম, আড়চোখে আমাকে দেখছে। ওর চোখের দিকে আমার চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি নজর সরিয়ে নিল। কিন্তু চোখের তারায় ক্ষণিকের ঝিলিক নজর এড়াল না আমার। খচ করে ছুরি বিঁধল যেন আমার কলজেতে

বদরকে বলল মেয়েটা, কিছু ভালো কাপড় দেখান তো।

খুব মিষ্টি গলার স্বর, মধু ঝরল যেন। হৃদয়ে ঝড় উঠল আমার।

অনেকগুলো ভালো ভালো পোশাক দেখাল বদর। একটাও পছন্দ হল না মেয়েটার। বলল, সোনার জরির কাজ করা আরও ভালো কিছু আছে?

দোকানের এক কোণ থেকে একটা লম্বা কাঠের বাক্স বের করে নিয়ে এল বদর। ভিতর থেকে কয়েকটা কাপড় বের করে দেখাল। তার একটা পছন্দ হল মেয়েটার। দাম জিজ্ঞেস করল।

দাম শুনে মেয়েটা বলল, এত টাকা তো সঙ্গে আনিনি। কাপড়টা দিন, বাড়ি গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেব।

মাথা নাড়াল বদর। বলল, মাপ করবেন, মালকিন, এই কাপড় আমি বাকি বেচতে পারব না। এই যে, পাওনাদার বসে আছে। আজ তাকে টাকা দিতেই হবে।

রাগ করল মেয়েটা। বলল, কী বলছেন, আমি কি আপনার আজকের খদ্দের! কত কাপড় কিনি। বাকিতেও নিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাঠিয়ে দিইনি?

নরম গলায় বলল বদর। দিয়েছেন। এটা ছাড়া অন্য কাপড় নিন যত টাকার খুশি বাকিতে দেব আমি। কিন্তু এই একটা কাপড় নিয়ে চাপাচাপি করবেন না। অন্য একজন পছন্দ করে রেখে গেছে। টাকা আনতে গেছে। কিন্তু আপনি আমার পুরনো খদ্দের বলে আরেকজন খদ্দরের সঙ্গে কথার বরখেলাপ করছি। এটা বাকিতে যদি চান, আমি অক্ষম। আমাকে মাপ করবেন।

রেগে কাপড়টা এক পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। বলল, ওসব আপনাদের বোলচাল! আসলে বাকি দেবেন না, সেটা বলুন। আরেক খদ্দের দেখে গেছে, এই কথাটাও মিথ্যে! বলেই গটগট করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আমার খুব খারাপ লাগল। পছন্দের জিনিস হাতে পেয়ে না নিতে পারা খুব দুঃখের ব্যাপার। দারুণ মন খারাপ লাগে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম মনে মনে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালাম মেয়েটার কাছে। পিছন থেকে ডাকলাম, শুনছেন?

চলতে চলতেই ফিরে তাকাল মেয়েটা। আমাকে দেখে দাঁড়াল। চোখে জিজ্ঞাসা।

আবার বললাম, আপনাকেই বলছি। ওভাবে রাগ করে বেরিয়ে এলেন। চলুন দোকানে।

ভুরু কোঁচকাল মেয়েটা। জানতে চাইল, কেন?

হেসে বললাম, কেন আবার? আপনার কাপড়টা নেবেন না?

মেয়েটা বলল, টাকা সঙ্গে থাকলে তো নিয়েই আসতাম। ওভাবে অপমান হতাম নাকি?

বললাম, কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে টাকাটা ধার দেব। নেবেন?

কী যেন ভাবল মেয়েটা। মিষ্টি করে হাসল। বলল, কিন্তু আপনি ধার দেবেন কেন? আমাকে চেনেন না, জানেন না...

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, তাতে কী হয়েছে? দরকার হলে চিনে নেব। তা ছাড়া দোকানি তো আপনাকে চেনেই। চলুন, চলুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা ভালো দেখায় না। লোকজন কিভাবে তাকাতে শুরু করেছে, দেখেছেন?

আবার হাসল মেয়েটা। ভুরু নাচিয়ে বলল, ঠিক আছে। শুধু আপনার কথায়ই ওই দোকানে আবার ফিরে যাচ্ছি। চলুন।

আমার সাথে আবার এসে দোকানে ঢুকল মেয়েটা। আগের জায়গায় বসল। আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকাল বদর। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল।

বললাম, কাপড়টা আবার বের কর তো।

আবার কাপড় বের করে দিল বদর।

বললাম, বেঁধেছেদে ঠিক করে দাও। আর হ্যাঁ, এগারোশো দিরহামের একটা রশিদ বানিয়ে দাও, সই করে দিচ্ছি। আমার পাওনা থেকে কেটে নেবে।

সুন্দর করে বেঁধে নীরবে কাপড়টা মেয়েটার হাতে তুলে দিল বদর।

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সম্মান বাঁচালেন আজ। আপনার ঠিকানা দিন। আমি নিজে গিয়ে টাকা শোধ দিয়ে আসব।

হেসে বললাম, আমি বিদেশি। স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই। এই দোকানে খোঁজ করলেই পাবেন আমাকে। রোজই সকালে একবার ঢুঁ মেরে যাই বদরের দোকানে।

আর কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেল মেয়েটা।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল বদর। ধমকে উঠলাম, এই বেটা, মিথ্যে কথা বললি কেন? ওই মেয়েটাই তো তোর দোকানের প্রথম খদ্দের আজ। কে আবার আগে এসে দেখে গেল কাপড়টা!

মিটমিট করে শয়তানি হাসি হাসল বদর। বলল, আরে দোস্ত, যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম, কোথায় আদর-আপ্যায়ন করে মিষ্টি খাওয়াবি, তা না, গালমন্দ শুরু করেছিস। এজন্যই বলে : উপকারীকে বাঘে খায়!

চোখ বড় বড় করে বদরের দিকে তাকালাম। বললাম, মানে?

আবার বলল বদর, মেয়েটার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিলি...কী আর করব? ভালোবাসাবাসির একটা সুতো বানিয়ে দিলাম। মেয়েটার কাছে ধারে বেচে দিলে কি ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতি? কায়দা করে ওকে কৃতার্থ করে দিলাম তোর কাছে।

এতক্ষণে বদরকে মনে মনে ছোটলোক বলে গাল দিয়েছি বলে নিজের কাছেই লজ্জা পেলাম। এক লাফে ওর কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলাম, দারুণ দোস্ত, দারুণ! একটা কাজের কাজ করেছিস। চল, তোকে মোরগ মোসাল্লাম খাওয়াব!

দুপুরের খাওয়া সেরে সরাইখানায় ফিরে এলাম। সেদিন আর বাইজিপাড়ায় গেলাম না। সারাটা সন্ধ্যা বসে বসে শুধু মেয়েটার কথাই ভাবলাম।

পরদিন সকাল হতে না হতেই ছুটলাম বাজারে। তখনও দোকান খোলেনি বদর। দোকানের সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম।

আরও অনেকক্ষণ পরে এল বদর। আমাকে রাস্তায় দেখে হেসে উঠল। ঠাট্টা করে বলল, জনাবের মাথাটা দেখছি পুরোপুরি গেছে! শেষকালে মজনু বনে গেলেন একেবারে!

চুপ করে রইলাম।

দোকান খুলল বদর। আমিও ঢুকলাম। আগের দিনের জায়গাতেই গিয়ে বসলাম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মেয়েটা এসে হাজির। সোজা এসে দাঁড়াল আমার সামনে। থলে থেকে এগারোশো দিরহাম বের করে বাড়িয়ে ধরল। বলল, নিন।

টাকাটা নেবার কোনো চেষ্টা করলাম না। মিনমিনে গলায় বললাম, সামান্য টাকা, ফেরত দেয়ার আর কী দরকার ছিল। যদি উপহার হিসেবে নিতেন কাপড়টা, খুব খুশি হতাম।

মধুর হাসি হাসল মেয়েটা। বলল, এখন নিন। পরে দরকার মনে করলে, অনেক উপহার দিতে পারবেন।

বুকের ভিতর ছলকে উঠল রক্ত। এ কিসের ইঙ্গিত! ফ্যাকাসে মুখে বললাম, পরে!

বদরের দিকে তাকাল একবার মেয়েটা। আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, একটু বাইরে আসবেন? আপনার সঙ্গে দুয়েকটা কথা আছে।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বোকার মতো তাকালাম মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর বদরের দিকে তাকালাম। মিটিমিটি হাসছে সে। চোখের ইশারা করল, মানে : যাও।

বেরিয়ে গেল মেয়েটা। পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম আমিও। পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। চলতে চলতেই বলল আমাকে, আপনি সত্যিই ভালো! কী বলে শুকরিয়া জানাব।

কিছু বলার নেই আমার। জবাবে মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম।

আবার বলল মেয়েটা, কী হল? কিছু বলছেন না যে?

বললাম, কী বলব?

ফিক করে হাসল মেয়েটা। বলল, আপনি ভারি বোকা!

তোতলাতে শুরু করলাম, ইয়ে হ্যাঁ, মানে না...নিজেকে বোকা বানিয়ে দিয়ে বোকার মতোই হাসলাম। কী বলবেন, বলছিলেন?

মেয়েটা বলল, আপনি আমার এতবড় উপকার করলেন। একটু কৃতজ্ঞতা বোধ আর কি! যদি দয়া করে আমার গরিবখানায় একবার পায়ের ধুলো দেন!

খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। এত তাড়াতাড়ি আশা করিনি! বলে উঠলাম, তার জন্য এত বিনয়ের কী দরকার। আসব, অবশ্যই আসব!

মেয়েটা বলল, কবে?

আমার তো ইচ্ছে, তখনি তার সঙ্গে চলে যাই। কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করা বোধহয় ঠিক হবে না, ভেবে, বললাম, আসব একদিন। আসলে কী উদ্দেশ্য মেয়েটার, একটু বাজিয়ে দেখে নেয়াও দরকার। কখন আবার কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ি, কে জানে!

জোর করল মেয়েটা, কবে আসবেন?

বুঝতে পারলাম, কথা আদায় করে ছাড়বে সে। বললাম, ঠিক আছে, কালই যাব না-হয়।

খুশি হল মেয়েটা। বলল, ঠিক আছে, কাল এই সময়ে ওই যে মোড়টা, ওখানে আমার একটা বাঁদি অপেক্ষা করবে। তার কাছে নিজের পরিচয় দেবেন। আপনাকে

আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে সে। তাহলে ওই কথাই রইল। বরখেলাপ করবেন না আবার। বলে আরেক প্রস্থ হাসি উপহার দিয়ে, আরেকবার চোখের বাণ ছুড়ে আমার কলজে রক্তাক্ত করে দিয়ে বিদায় নিল রূপসী।

ফিরে এলাম বদরের দোকানে। সব কথা জানালাম তাকে। আমি কোথায় কী করছি, পরিচিত কারো গোচরে থাকা ভালো।

বদর বলল, বলেছিলাম না তোমাকে, তোমার ওই চাঁদমুখ দেখলেই জালে পড়বে যে কোনো মেয়ে। কাজ তো বাগিয়ে ফেললে। এখন যাও, চুটিয়ে প্রেম করোগে। তা আমার দোকানে মজনুর পায়ের ধুলো আর পড়বে তো?

সেদিনও দুপুরের খাওয়া বদরের ওখানেই সারলাম। তারপর ফিরে এলাম সরাইখানায়। সন্ধ্যায় বেরোলাম না কোথাও। মেয়েটার কথা ভেবেই কাটিয়ে দিলাম। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না চোখে। রক্তে তুফান, বুকে উথালপাথাল ঢেউ। ছটফট করতে করতে কাটল রাত। ভোর হতে না হতেই উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। গোসল করলাম। নাস্তা সেরে দামি কাপড়চোপড় পরলাম। সুরমা টানলাম চোখে। দামি আতর মাখালাম গায়ে। তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে লোকজন তেমন নেই। এত সকালে নেহায়েত দরকার ছাড়া পথে বেরোয়নি কেউ। ভাবলাম, আরও পরে বেরোলেই হত। এত সকালে আসবে না বাঁদি।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল। মোড়ের কাছে অপেক্ষা করছে বাঁদি। আমাকে জানাল, অনেক আগেই এসে বসে আছে সে। ভোর হবার আগেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার মালকিন।

খুশিতে দুলে উঠল বুকের ভিতরটা। আমার প্রেয়সীও তাহলে আমারই মতো ঘুমোয়নি সারারাত, ছটফট করে কাটিয়েছে!

তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

আমারই জন্য দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল প্রেয়সী। বাঁদি ডাকতেই খুলে গেল দরজা। কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের বালাই নেই। সোজা এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল। বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, এত দেরি করে এলে, সোনা! কী জাদু করেছ! সারারাত ঘুমোতে পারিনি!

ওকে জড়িয়ে ধরে আবেগে বলে উঠলাম, আমারও একই অবস্থা। রাতের বেলায়ই ছুটে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঠিকানা তো জানি না।

গভীর আবেগে চুমু খেলাম ওর ঠোঁটে।

চুপ করে থেকে আমার আদর নিল প্রেয়সী। তারপর জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। আমার হাত ধরে টানল। বলল, এখানে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। এস ভিতরে এস।

প্রেয়সীর হাত ধরে সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। বিশাল উঠোন। উঠোন ঘিরে সাতমহলা ঘর। অনেক ঘরে সাতটা করে দরজা, চোদ্দটা করে জানালা।

ঘরগুলোর সামনে ফুলের বাগান, নানা রঙের নানা আকারে দেশি বিদেশি ফুলে ভরা। বড় বাগানটার ঠিক মাঝখানে একটা ফোয়ারা ঘিরে শান-বাঁধানো বিশাল চৌবাচ্চা।

পুরো বাড়িটা শ্বেতপাথরে তৈরি। আমাকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল মেয়েটা। দেয়ালে টাঙানো নামী শিল্পীর দামি দামি ছবি। মেঝেতে পারস্যের গালিচা বিছানো। সুন্দর করে সাজানো গোছানো আসবাবপত্র। সব মেহগনি কাঠে তৈরি। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা কাউচে বসিয়ে দিল আমাকে সে।

এতক্ষণে ভালো করে তাকালাম প্রেয়সীর দিকে। বদরের দোকান থেকে নিয়ে আসা নতুন কাপড়টা পরেছে সে। মণিমুক্তা খচিত গহনা ঝকঝক করছে শরীরে। সেদিন প্রথম খোলাখুলিভাবে দেখলাম তার চেহারা। বেহেশতের হুরি কখনও দেখিনি। কিন্তু আমার মনে হল হুরিও তার রূপের কাছে লজ্জা পাবে। পটলচেরা কাজলকালো চোখে রাজ্যের মায়া, খাড়া তীক্ষ্ণ নাক, কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট। মেঘের মতো কালো চুল ছড়িয়ে আছে সারা পিঠে। সুঠাম দেহের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে আছে দুরন্ত যৌবন। ঢোক গিললাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দুরুদুরু করছে বুকের ভিতর। নিজেকে সামলানোই দায় হয়ে উঠল।

আমার দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসল সে। জিজ্ঞেস করল, মানিয়েছে?

কী বলব? মুখে কিছুই বলতে পারলাম না। একটানে কোলের উপর এনে ফেললাম তাকে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম চোখ-মুখ নাক-ঠোঁট।

একবার থরথর করে কেঁপে উঠল সে। দুই বাহু দিয়ে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল আমার গলা। নিজের দিকে টানল। মাথা গুঁজে দিলাম ওর কুসুম-কোমল বুকে।

কানের কাছে ফিসফিসানি শুনলাম, আমাকে...আমাকে ভালোবাসো তুমি।

রাজ্যের যত কথা বাঁধভাঙা বন্যার মতো একসঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। নরম বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বললাম, মেয়েমানুষ আমার জীবনে তুমিই প্রথম না। দেহের প্রয়োজনে চেয়েছি, পয়সা দিয়ে কিনেছি, মজা লুটেছি। পরমুহূর্তেই ভুলে গেছি তাদের। কিন্তু তুমি! তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার সব কিছু কেমন যেন উলটপালট হয়ে গেছে। ঘুম-নিদ্রা হারাম হয়ে গেছে, খাওয়ায় রুচি নেই। কিছুতেই তোমার চেহারা সরাতে পারছি না মন থেকে। একে যদি ভালোবাসা বল, তাহলে তাই।

সে বলল, আমারও একই অবস্থা। একবার বিয়ে হয়েছিল আমার। জোর করে বিয়ে করেছিল সুলতানের প্রিয়পাত্র এক বুড়ো আমির। টাকাপয়সা ধনদৌলত কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার। অভাব ছিল একটা জিনিসের। নারীকে আনন্দ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না তার। তবু কেন যে আমার জীবনটাকে নষ্ট করল! যাকগে, বুড়ো মরে আমাকে বাঁচিয়েছে। তোমাকে প্রথমবার দেখেই ভালোবেসে ফেলেছি। আমার যা কিছু আছে, সব আজ উজাড় করে দেব তোমার কাছে। নিয়ে ধন্য করবে আমাকে। তার আগে চল, খাওয়া-দাওয়া সারি।

হুকুম পেয়ে নতুন ফরাস পাতল বাঁদিরা। খাবার সাজাল। মুরগি মোসাল্লাম, তন্দুরি রুটি, ভেড়ার গোশতের কাবাব, পনির, নানারকম ফল আর মিষ্টি।

দুজনে একসাথে খেতে বসলাম। ও যা খেল, তারচেয়ে অনেক বেশি খাওয়াল আমাকে। পাতে তুলে তুলে দিল। না করতে পারলাম না। করার ইচ্ছেও ছিল না। বেহেশতি স্বাদ পাচ্ছিলাম যেন।

খাওয়া শেষ হল। তামার গামলায় করে গোলাপের গন্ধ-দেয়া পানি নিয়ে এল বাঁদি। আমার হাত মুখ ধুইয়ে দিল প্রেয়সী। তুরস্কের তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল।

খোলা জানালার পাশে এসে বসলাম দুজনে। বাইরে বাগানে ঝলমলে রোদ। ফুলের চোখধাঁধানো রঙ। ওগুলোর উপর বিচিত্র রঙিন পাখা মেলে উড়ছে হাজারো প্রজাপতি। ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে বাতাস। প্রকৃতি এত সুন্দর, এর আগে এমনভাবে অনুভব করিনি কখনও। যা দেখছি, সবই নতুন লাগছে।

দুজনে দুজনের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এলাম। মন খুলে কথা বললাম একে অন্যের সঙ্গে। এমন সব কথা, যা শুধু নিজের সঙ্গেই বলা যায়! কারো মন কারো কাছে আর গোপন রইল না।

রক্তে তুফান উঠেছে অনেক আগেই। উদ্দাম হয়ে উঠল আরও। আরও কাছাকাছি হলাম দুজনে দুজনের। এবার আর মন নয়। দেহও কাছাকাছি হল আমাদের। ধীরে ধীরে মিশে গেল এক হয়ে।

কী করে কাটল সময়, বলতে পারব না। যখন হুঁশ হল, দেখলাম জানালা দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে ঘরে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম না। সাঁঝ হল। রাত নামল। গভীর হল রাত। কখন এক সময় মোমের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে বাঁদি, খেয়াল করিনি। গলে গলে শেষ হয়ে গেল মোম। আবার জ্বালানো হল নতুন মোম। আবার গলল, আবার জ্বলল। ভোরের দিকে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল। হামামে ঢুকলাম দুজনে। গোসল সেরে, খাওয়া সেরে বিদায় নিলাম প্রেয়সীর কাছ থেকে।

ছলছল চোখে, ভেজা গলায় জানতে চাইল প্রেয়সী, আবার কবে দেখা হবে, মানিক?

বললাম, বাজারে যাব। মহাজনদের কাছে থেকে টাকা আদায় করতে হবে। সেখান থেকে সরাইখানায় যাব একবার। কাজ আছে। সাঁঝের আগেই ফিরব আবার।

আমার বুকের কাছ ঘেঁষে এল প্রেয়সী। আদুরে গলায় বলল, পারলে আরও আগে ফিরে এস।

সঙ্গে করে রেশমি রুমালে বেঁধে পঞ্চাশটা সোনার মোহর নিয়েছিলাম। ওর অলক্ষে বালিশের তলায় রেখে দিলাম রুমালটা। বেরিয়ে চলে এলাম।

বদরের সাথে দেখা করলাম। মহাজনদের কাছ থেকে কিস্তির টাকা আদায় করে ফিরে এলাম সরাইখানায়। নফরটাকে ডেকে বাজার থেকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে

আসতে বললাম। সাঁঝের বেলা আবার যেতে হবে প্রেয়সীর ওখানে। সারারাত ঘুম যে কী হবে, তা তো জানিই। কাজেই ঘুমানো দরকার। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বিকেল শেষ। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে নিলাম। ও বলেছিল তাড়াতাড়ি যেতে, আর আমি করে বসে আছি দেরি! নফরটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, জিনিসগুলো এনেছে কিনা। জানাল, এনেছে! একটা খচ্চর ভাড়া করতে বললাম তাকে। জিনিসগুলো গুছিয়ে খচ্চরের পিঠে তুলে দিতে বললাম। চলে গেল সে। আরেকটা রুমালে আবার পঞ্চাশটা মোহর বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সুন্দর একটা খচ্চর। গলায় বাঁধা দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে সহিস। কমবয়সি একটা ছেলে। আমাকে দেখে সেলাম জানাল।

খচ্চরে উঠে বসলাম। কোথায় যেতে হবে, বললাম। দড়ি ধরে টেনে টেনে এগিয়ে চলল ছেলেটা, পিছনে খচ্চরে সওয়ার হয়ে আমি।

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজন বাঁদি। আমাকে দেখেই সেলাম জানিয়ে বলল, এত দেরি করে এলেন, মালিক। ওদিকে অস্থির হয়ে উঠেছেন বিবিজান।

তাড়াতাড়ি নামলাম খচ্চর থেকে। গাঁটরিটা এক বাঁদির হাতে তুলে দিয়ে সহিসের দিকে ফিরলাম। একটা মোহর বের করে তুলে দিলাম ওর হাতে। বললাম, কাল সকালে এসে আবার নিয়ে যাবি আমাকে।

সোনার মোহর পেয়েছে। খুব খুশি হল ছেলেটা। লম্বা সেলাম দিল আমাকে। খচ্চরের দড়ি ধরে টান দিল।

আগের দিনের মতোই সদর দরজার ওপাশে অপেক্ষা করছে প্রেয়সী। আমাকে দেখে কেঁদে ফেলল, এত দেরি করে এলে! আমি তো ভেবেই সারা। দুশ্চিন্তা তাড়াতে পারছিলাম না মন থেকে। মনে হচ্ছিল, তুমি আর আসবে না। ফাঁকি দিয়ে গেছ আমাকে।

কাছে টেনে নিলাম ওকে। বললাম, আমি ফাঁকি দেব! তোমাকে! মনটাই তো বাঁধা পড়ে গেছে তোমার কাছে। বাইরের এই যে আমি, এটা তো এখন শুধু আমার খোলস।

হাত ধরাধরি করে ঘরে এসে ঢুকলাম আমরা। পুরো বাড়িটা ধোয়ামোছা হয়েছে। নতুন করে সাজানো হয়েছে আসবাবপত্র। মেঝেতে নতুন ফরাস।

আমাকে জিজ্ঞেস করল প্রেয়সী, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে? খাবে তো?

মাথা দুলিয়ে বললাম, হ্যাঁ, খাব।

খাবার সাজানোর হুকুম দিল সে।

বাঁদিরা খাবার সাজাতে লাগল। আমার গাঁটরিটা খুলতে বললাম। খুলল দুজন বাঁদি। বেরোল ভেড়ার মাংসের এক হাঁড়ি কোরমা। আর বেশ কয়েক রকমের মিষ্টি। দেখে খুব খুশি হল আমার প্রেয়সী।

দুজনে একসঙ্গে বসে খেলাম। তারপর এল দামি মদ। ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে ও, গ্লাসের পর গ্লাস পান করে গেলাম আমি। চোখে গোলাবি নেশা লাগল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম পালঙ্কের দিকে।

আগের রাতের মতোই অবস্থা হল। সারাটা রাত দুজনে দুজনকে নিয়ে মেতে রইলাম। মোম গলে গলে পড়ল, বাতি নিভু নিভু হল, আবার জ্বলল, আবার নিভল। মনোরম এক স্বপ্নের ঘোরে যেন কেটে গেল রাতটা।

সকাল হল। উঠলাম। বাঁদির কাছে খবর পেলাম, বাইরে খচ্চর নিয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেটা। তাড়াতাড়ি গোসল সেরে নাস্তা করলাম। আগের দিনের মতোই রুমালে বাঁধা মোহরগুলো রেখে দিলাম বালিশের নিচে। প্রেয়সীর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সরাইখানায় ফিরেই ঘুমোতে গেলাম। বিকেলে ঘুম ভাঙল। নফরকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালাম। ভালো দেখে মুরগির বিরিয়ানি, খাসির মাংসের চপ, ফলের হালুয়া, আপেল, আঙুল, বেদানা নিয়ে এল সে।

গোসল সেরে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হলাম। নিচে খচ্চর তৈরি! খাবারের গাঁটরিটা নিয়ে খচ্চরে চাপলাম। সাঁঝের আগে আগে পৌঁছে গেলাম প্রেয়সীর বাড়িতে। আগের দু'রাতের মতই কাটল এই রাতও।

পরদিন সকালে আবার ফিরে এলাম সরাইখানায়। তারপর বিকেলে ঘুম থেকে উঠে খাবারদাবার আর পঞ্চাশটা সোনার মোহর নিয়ে আবার প্রেয়সীর বাড়িতে গেলাম।

নিয়ম হয়ে গেল। কিস্তি আদায়ের দিনে বাজারে যাই, নইলে সোজা প্রেয়সীর বাড়ি থেকে সরাইখানায় ফিরে আসি। রোজই কিছু না কিছু খাবার নিয়ে যাই। পঞ্চাশটা করে সোনার মোহরও নিয়ে যাই। সকালে বেরিয়ে আসার সময় রেখে আসি বালিশের তলায়।

সুখেই কাটছে দিন, এই সময়েই বাজারে গিয়ে একদিন খালি হাতে ফিরতে হল সরাইয়ে। মহাজনদের কাছে যা পাওনা ছিলাম, সব আদায় করে নিয়েছি। সব খরচা হয়ে গেছে। হাতে আর কিছুই নেই আমার। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে শেষে বদরের কাছে হাত পাতলাম।

কিন্তু কয়দিন আর লোকের কাছে হাত পাতা যায়? খালি হাতে প্রেয়সীর বাড়িতেই-বা যাই কী করে? একদিন ভারি চিন্তায় পড়ে গেলাম। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মহাজনদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি ধারের আশায়, পেলাম না। ভাবতে ভাবতে বাজারের একটা গলি দিয়ে হাঁটছি। একটা জায়গায় খুব ভিড়। ধাক্কাধাক্কি করে ভিড় ঠেলে বেরোতে গিয়ে হাতে শক্ত মতো কী ঠেকল। আমার পাশের লোকটির পকেটে রয়েছে জিনিসটা। ভালো করে দেখলাম লোকটাকে। ছোটখাটো ব্যবসা করে হয়তো। টাকার ধান্দায় ঘুরছি সকাল থেকে, হিতাহিত জ্ঞান রইল না আর। দিলাম ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে। থলেতে বাঁধা মোহরের অস্তিত্ব আগেই টের পেয়েছি। কোনোরকম ভাবনাচিন্তা ছাড়াই থলেটা বের করে আনতে গেলাম। কিন্তু পেশাদার

চোর না আমি। পকেট কাটার বিদ্যাও জানা নেই। টের পেয়ে গেল লোকটা। খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।

হাতেনাতে বমাল ধরা পড়েছি। আর যাব কোথায়? শুরু হল মার। কথায় বলে বাজারে মার! হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যাবার জোগাড় হল।

সেদিন ওই সময়ে বাজারে এসেছিল শহরের কোতোয়াল। হৈ চৈ শুনে এগিয়ে এল সে। লোকজন সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল। কয়েকজন লোক তখনও পেটাচ্ছে আমাকে। হাতের লাঠি দিয়ে ওদেরকে কয়েক ঘা লাগাল কোতোয়াল। ছিটকে সরে গেল লোকগুলো।

ঘোড়া থেকে নামল কোতোয়াল। মাটিতে পড়ে আছি আমি। টেনে আমাকে দাঁড় করাল সে। আমার মুখের দিকে ভালো করে দেখল একবার। তারপর জনতার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, কী হয়েছে? একে মারছ কেন?

কয়েকজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, পকেট কেটেছিল। চোর ও, চোর!

ভুরু কোঁচকালো কোতোয়াল! জানতে চাইল, কার পকেট কেটেছে?

ব্যবসায়ী গোছের লোকটা এগিয়ে এল। বলল, আমার।

লোকটার কাছে এগিয়ে গেল কোতোয়াল। কোর্তার পকেটগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, কোন পকেট কেটেছে?

লোকটা বলল, কাটেনি! পকেটে হাত ঢুকিয়ে থলে তুলে নিয়েছিল।

কোতোয়াল জানতে চাইল, থলেটা কোথায়?

বের করে দিল লোকটা, এই যে, আমার পকেটে রয়েছে।

ধমকে উঠল কোতোয়াল, থলে রয়েছে তোমার পকেটে। পকেট কাটা নেই। তাহলে চুরি করল কিভাবে?

আমতা আমতা করে বলল লোকটা, তুলে নিয়েছিল, হাত ধরে ফেলেছি। থলেটা কেড়ে নিয়ে আবার পকেটে রেখে দিয়েছি।

খেয়াল করলাম, যারা পেটাচ্ছিল, একজন দুজন করে কেটে পড়ছে।

আবার ধমকে উঠল কোতোয়াল, মিথ্যে কথা! ভিড়ের মাঝে কে না কে পকেটে হাত দিয়েছিল, আর নির্দোষ একটা লোককে ধরে পেটাচ্ছ! তোমাকেই ধরে নিয়ে যাব আজ! সোজা গারদে ঢোকাব। একে দেখেছ? দেখতে কী সুন্দর চেহারা। কাপড়চোপড়ে বড় বংশের ছেলে মনে হচ্ছে। এ চোর হতে পারে না কিছুতেই।

কোতোয়ালের সাথের সিপাইরাও এসে হাজির হয়েছে। তাদেরকে হুকুম দিল কোতোয়াল, বেটাকে ধরে বেঁধে ফেল।

নির্দোষ একটা লোক আমার জন্য শাস্তি পাবে। সত্যিই তো চুরি করতে গিয়েছিলাম আমি। অন্যায় আমার। আমারই শাস্তি হওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, দোহাই কোতোয়াল সাহেব, ওকে ছেড়ে দিন। ও মিথ্যে বলেনি। সত্যিই ওর পকেট থেকে থলে সরাতে চেয়েছিলাম আমি।

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল কোতোয়াল। বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই।

আবার বললাম, বিশ্বাস হচ্ছে না? আল্লাহর কসম, ওর কোনো দোষ নেই। সত্যিই ওর টাকা চুরি করতে চেয়েছিলাম আমি।

আল্লার কসম খেয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছে আসামি। ওর ওপর আর কথা নেই। হতাশভাবে মাথা দোলাল কোতোয়াল। ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিল। আমার দিকে ফিরে বলল, আর আমার করার কিছুই নেই, বাবা। শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। জানো তো, চুরির শাস্তি হাত কেটে ফেলা?

হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না। কী বলব? অন্যায় করেছি, শাস্তি পেতেই হবে।

বাজারের প্রকাশ্য জায়গায়, লোকজনের সামনে কোতোয়ালের হুকুমে আমার ডান হাত কবজি থেকে কেটে ফেলল সিপাইয়েরা। বাঁ হাতটাও কাটতে যাচ্ছিল, কেঁদে পড়ল ব্যবসায়ী, যার টাকা আমি চুরি করেছিলাম। আমার অন্য হাত না-কাটার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করল। আমার জন্য অনেকেরই মায়া হয়েছিল, তারাও ব্যবসায়ীর পক্ষ নিয়ে অনুরোধ জানাল কোতোয়ালকে। ফলে মাপ পেয়ে গেলাম আমি। একটা হাত বেঁচে গেল।

খোলা আকাশের নিচে উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। একে একে লোকজন সব চলে গেল! ব্যবসায়ী লোকটা রয়ে গেল আমার কাছে। হকিমের কাছে নিয়ে গেল আমাকে।

হকিম মলম লাগিয়ে আমার কাটা জায়গার রক্ত বন্ধ করল। বেঁধেছেদে ঠিক করে দিল।

বার বার আমার কাছে মাপ চাইল লোকটা। অনুতপ্ত হয়ে বলল, তার জন্যই আজ আমার একটা হাত গেল। মাত্র বিশটা মোহর ছিল থলেতে। ওই কয়েকটা মোহরের জন্য এতবড় একটা অভিশাপের বোঝা মাথায় নিল।

বার বার বললাম, তাকে এক বিন্দু অভিশাপ দিইনি আমি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না সে।

কোথায় যাব, জিজ্ঞেস করল ব্যবসায়ী। জানালাম। একটা খচ্চর ডেকে প্রেয়সীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল আমাকে।

সাঁঝের আগে তার বাড়িতে যাই না আমি। সেদিন আগে আগে পৌঁছে যাওয়ায় খুব খুশি হল সে। আদর করে নিয়ে গেল আমাকে তার ঘরে।

কাপড়চোপড়ে ধুলোবালি, তার ওপর মনমরা দেখে, কী হয়েছে আমার জানতে চাইল। বলতে পারলাম না। কী করে বলব, চুরি করে মার খেয়েছি? হাত কাটা গেছে!

কিছু হয়নি বলতে গিয়ে অভ্যাস মতো ডান হাতটা নাড়াতে গেলাম। আস্তিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল কাটা হাত।

আঁতকে উঠল প্রেয়সী। আমার কাটা হাত চেপে ধরে বলল, ও কী! কি হয়েছে?

মিথ্যে বলে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। আসল কথাটা আমার পেট থেকে বের করে নিল সে। গুম মেরে রইল।

পরিবেশটা সহজ করে তোলার চেষ্টা করলাম, প্রেয়সীর জন্য প্রাণ দিয়ে দেয় লোকে আর আমি তো একটা হাত দিয়েছি মাত্র।

আর চুপ করে থাকতে পারল না সে। কেঁদে ফেলল হুহু করে। কপাল চাপড়ে বিলাপ করতে লাগল, আমি এক পিশাচী। আমার জন্যই তোমার কপাল পুড়ল! হাত কাটা গেল! হায় হায়, কেন তোমার মোহর প্রথমদিনই ফিরিয়ে দিলাম না। কেন! কেন!

অনেক বলেকয়ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে শান্ত করলাম।

বলে উঠল সে, আর না! আর তোমাকে একলা থাকতে দেব না। আজই বিয়ে হবে আমাদের। আমার বাড়িতেই থাকবে তুমি। আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন। তুমি আমি বসে খেলেও কয়েকশো বছর কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু পুরুষ মানুষের ঘরে বসে থাকা ভালো দেখায় না। টাকা আমি দেব, ব্যবসা করবে তুমি। দিনের বেলা কাজ করবে, রাতে আমার কাছে এসে থাকবে। ব্যস, কথা শেষ।

আর একটাও কথা না বলে উঠে চলে গেল সে। বাঁদিদেরকে ঘরদোর সাজানোর হুকুম দিল।

দেখতে দেখতে সাজানো হয়ে গেল বিয়েবাড়ি। শহরের বড় বাবুর্চিকে তলব করা হল। দাওয়াত দেয়া হল অনেক গণ্যমান্য লোককে।

লোকজনে ভরে গেল বাড়ি। কাজি সাহেব এলেন। বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। মেহমানরা খেয়েদেয়ে আমাদের দোয়া করে বিদায় হলেন একে একে।

দিনরাত সেবাযত্ন করে গেল আমার বিবি। খুব তাড়াতাড়িই সেরে গেল হাতের ক্ষত। আবার ব্যবসায়ে নামলাম আমি। অনেক টাকা পুঁজি। তা ছাড়া কাপড়ের ব্যবসাটা বুঝিও ভালো। দেখতে দেখতে লালে লাল হয়ে গেলাম। হুড়মুড় করে টাকা আসছে। ধনরত্নের পাহাড় বানিয়ে ফেললাম।

খুব সুখে কাটছিল আমাদের দিন। কিন্তু নসিবে বেশিদিন সইল না। অসুখে পড়ল বিবি। কঠিন অসুখ। কত হকিম এল, কবিরাজ এল। কত ওষুধ, কত দাওয়াই দিল। কিছুতেই কিছু হল না। আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে এই দুনিয়া থেকে একদিন চিরবিদায় নিল আমার প্রাণের প্রাণ বিবি।

ঘরে আর মন টিকল না। ঠিক করলাম, বেরিয়ে পড়ব। ঘুরে বেড়াব দেশে দেশে। তাতে হয়তো ভুলে থাকতে পারব তাকে। কাপড়ের ব্যবসা দেখাশোনার কথা বললাম বদরকে। অবশ্যই লাভ দেব বললাম। রাজি হল সে। দায়িত্বটা তার হাতে তুলে দিলাম। কিছু ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে বাকিগুলো রেখে দিলাম লোহার সিন্দুকে। একজন বিশ্বস্ত খোজাকে বাড়ি পাহারার দায়িত্ব দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একদিন।

সেই থেকে দেশ দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সঙ্গে টাকা আছে। গায়ে ব্যবসায়ীর রক্ত। যে দেশে যখন যে জিনিস দেখে পছন্দ হয়, কিনে ফেলি। অন্য কোনো

দেশে নিয়ে গিয়ে লাভে বেচে দিই। এই যেমন পঞ্চাশ মন তিলের বীজ বেচলাম আপনার কাছে।

চুপ করল যুবক।

খ্রিস্টান দালাল বলে যাচ্ছে, আমিও চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। যুবকের দুঃখ তখন আমারও হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। অনেক কিছু বলে তাকে সান্ত্বনা দিলাম। কী বুঝল সে, কে জানে! তবে হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। অনেক রাত হয়ে গেছে তখন। উঠল সে। আমি তাকে তার টাকাটা নিয়ে যেতে বললাম। আমার হাত ধরে বলল, ভাই, টাকা আমার আছে। একলা মানুষ, খরচ করে কোনোদিন শেষ করতে পারব না। মাত্র তো সাড়ে চার হাজার দিরহাম। ওগুলো তোমার কাছেই থাক। তোমার এক মুসলমান ভাইয়ের উপহার। তুমি শুধু একটু দোয়া কোরো আমার বিবির আত্মার জন্য। বেহেশতে গিয়ে যেন শান্তিতে থাকতে পারে সে। বলে আর একটাও কথা না বলে বেরিয়ে গেল যুবক। হাঁ করে বোকার মতো দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। এরপর কত খুঁজেছি তাকে, কিন্তু পাইনি। আর কখনও আসেনি সে আমার গদিতে। তার টাকা আজো আমার কাছেই রয়ে গেছে। সুদে খাটাই, সুদে-আসলে টাকা শুধু বাড়ছেই।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলেছে। থেমে একটু জিরিয়ে নিল খ্রিস্টান দালাল। তারপর বলল, আমার কাহিনী শেষ হয়েছে, হুজুর। এমন আজব ঘটনার কথা কখনও শুনেছেন!

মাথা দুলিয়ে স্বীকার করলেন রাজা, হ্যাঁ, আজব ঘটনাই! তবে কুঁজোর ঘটনার চেয়ে আজব নয়! কী সামান্য কাণ্ড থেকে কী হয়ে গেল! মাছের কাঁটা আটকে লোকটা মরে গেল। তারপর চারজন লোক জড়িয়ে পড়ল তার মৃত্যুর সঙ্গে! চারজনই গলায় পড়ল ফাঁসির দড়ি। তারপর চারজনই বেঁচে গেল আবার। না হে, দালাল, তোমার কাহিনীর চেয়ে কুঁজোর ঘটনাটা আরও আশ্চর্য!

হাতজোড় করে এক পাশে সরে দাঁড়াল খ্রিস্টান।

খ্রিস্টান সরে দাঁড়াতেই এগিয়ে এল বাবুর্চি। বলল, আমি একটা কাহিনী শোনাতে চাই, হুজুর। আপনার ভালো লাগলে আমাদেরকে মাপ করে দেবার আর্জি জানাচ্ছি।

অনুমতি দিলেন রাজা।

কাহিনী শুরু করল বাবুর্চি :

এক রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াত ছিল আমার। বিয়ের দাওয়াত। গেলাম। আরও অনেকেই এসে হাজির হয়েছে বাড়িতে। অনেক জ্ঞানীগুণী লোকও ছিল তাদের মাঝে। আসর জমজমাট।

বিয়ের আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষ হল। এবার খাবার পালা। জায়গা দেখে গিয়ে বসে পড়লাম।

খাবার এল, প্রচুর খাবার। কয়েক পদের রান্না করা মাংস, বিরিয়ানি, সবজি, মিষ্টি, ফল। তার ভিতর একটা খুব মুখরোচক খাবার রয়েছে, জিরবাজা। এটা আমাদের দেশের খুব নামকরা খাবার। মাংস আর সবজির সঙ্গে প্রচুর মসলা মাখিয়ে তৈরি হয়। জিরার ভাগটা এতে খুব বেশি থাকে। মসলার গন্ধটা একটু তীব্র হলেও দারুণ মুখরোচক এই খাবার।

পাতে অনেকখানি করে জিরবাজা তুলে নিয়ে খাচ্ছি আমরা। খেতে খেতেই খেয়াল করলাম, একজন মেহমান জিরবাজা ছুঁয়েও দেখছে না। বিয়েবাড়িরই একজন এসে তার পাতে জিরবাজা তুলে দিতে চাইল। কিন্তু লোকটা নিল না। বলল, আমাকে মাপ করবেন। আমি এই জিনিস খেতে পারব না।

আমার পাশেই বসেছে লোকটা। বললাম, নিন না। খেয়ে দেখুন, ভালো হয়েছে!

লোকটা বলল, আমি জানি, জিরবাজা খেতে কেমন। গন্ধেই জিভে পানি এসে যায়। কিন্তু তবু আমি খাব না। এই জিনিস খাবার জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। আমি খাব না।

কাছেই দাঁড়িয়েছিল বাড়ির মালিক, আমার বন্ধু। এগিয়ে এল সে। লোকটার সামনে এসে বলল, জনাবের কি জিনিসটা পছন্দ হচ্ছে না? রান্না খারাপ হয়েছে ভাবছেন?

জোরে মাথা নেড়ে বলল লোকটা, না না, রান্না খারাপ হবে কেন? যা দারুণ খোসবু ছড়াচ্ছে। আসলে আমি কসম করেছি, যতদিন বেঁচে থাকব, কোনোদিন ওই জিনিস মুখে তুলব না।

কৌতূহল জাগল, তবে তখনকার মতো চেপে রাখলাম।

আমার বন্ধুও অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। কী ভাবল। তারপর সরে গেল সেখান থেকে।

খাওয়া সারলাম। আমার পাশের লোকটিও খাওয়া শেষ করেছে। দুজনেই উঠে পড়লাম। হাতমুখ ধুয়ে এসে ঢুকলাম বসার ঘরে, ফরাস পাতা মেঝেতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিক-ওদিক বসে আছে অনেক মেহমান। একেক জায়গায় কয়েকজন করে বসে গল্প করছে।

লোকটাকে ডেকে নিয়ে ঘরের এক কোণে চলে এলাম। বসলাম। দেখি, ঘরে এসে ঢুকছে আমার বন্ধুও। আমাদের কাছে এগিয়ে এল সে। বসে পড়ল। লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু যদি মনে না করেন, জনাব, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

লোকটা বলল, কী কথা?

বন্ধু বলল, আচ্ছা, আপনি জিরবাজা খান না কেন?

হাসল লোকটা। হাত দুটো তুলে দেখাল আমাদেরকে। অবাক হয়ে দেখলাম, দুই হাতের বুড়ো আঙুল কাটা। পা দেখাল এবার। পায়ের বুড়ো আঙুল, কাটা।

বন্ধু বলে উঠল, হায় হায়! এটা হল কী করে? কোনো দুর্ঘটনা?

লোকটা বলল, দুর্ঘটনাই বলতে পারেন।

আমি বলে উঠলাম, কী রকম?

লোকটা বলল, সে অনেক কথা। শোনার ধৈর্য হবে আপনাদের?

আমি বলে উঠলাম, নিশ্চয়ই, হবে!

বন্ধু বলল, আপনি বলে যান। এই আমি বসলাম। সব না শুনে আর উঠছি না।

নিজের কাহিনী বলতে শুরু করল লোকটা :

আমার বাড়ি বাগদাদে। বাবা ওখানকার এক নামকরা সওদাগর ছিল। তবে কিছু বদস্বভাব ছিল তার। মদে ভীষণ আসক্তি ছিল। আর খারাপ মদ খেত না কখনও। দেশ-বিদেশের নামকরা মদ আনাত প্রচুর, ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে বসে খেত, মৌজ করত।

ফল যা হবার হল। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এল তার অঢেল ধনরত্ন। এই সময়ই একদিন মারা গেল বাবা। রেখে গেল পাহাড়-সমান ঋণের বোঝা। সব এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। বাবাকে কবর দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখি পাওনাদাররা হাজির।

তাদেরকে বোঝালাম। বললাম, বাপের ঋণ আমি রাখব না। যেমন করে পারি, যেভাবে পারি, ঋণ আমি শোধ করবই। তবে আমাকে সময় দিতে হবে। প্রতি হপ্তায় একবার করে আসবেন প্রত্যেকে। ব্যবসার লাভ থেকে কিছু কিছু করে দিয়ে দেব আমি।

পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, তবে ব্যবসাটা একেবারে নষ্ট হয়নি বাবার। তখনও কোনোমতে ধুঁকে ধুঁকে চলছে। শক্ত হাতে ধরলাম সেটা। যা আয় হয়, হপ্তাশেষে পাওনাদারদের মাঝে ভাগ করে দিই।

এমনি করে দিন যায়। আস্তে আস্তে পাওনাদারদের সব দেনা শোধ করে দিলাম। এরপর থেকে যা আয় হতে লাগল সব ব্যবসায় খাটালাম। দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে উঠল ব্যবসা। অনেক বড় হয়ে গেল কারবার। পুঁজি বেড়ে চলেছে দ্রুত।

একদিনের কথা, দোকানে বসে আছি। এই সময় একটা খচ্চর এসে থামল দোকানের সামনে। পিঠে বসে আছে এক তরুণী। মুখে নেকাব টানা। তবু বোঝা যায়, অপরূপ সুন্দরী। খচ্চরের আগেপিছে একজন করে খোজা পাহারাদার। বড় ঘরের মেয়ে, অনুমান করতে কষ্ট হল না।

গাধা থেকে নামল তরুণী। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল একবার। চোখাচোখি হয়ে গেল আমার সঙ্গে। ধক করে উঠল আমার বুকের ভিতরটা। চোখ ফিরিয়ে নিল রূপসী। ভাবলাম, আমার দোকানে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকল না। মুখ ফিরিয়ে সোজা সামনের দিকে হাঁটা দিল।

সামনের খোজাটা বলে উঠল, মালকিন, ওদিকে যাবেন না। জায়গাটা ভালো না। ভিড়ও বেশি। অপমান হতে পারেন।

খোজার কথায় কানই দিল না তরুণী। ঢুকে গেল বাজারের ভিতর। পাশপাশি কয়েকটা কাপড়ের দোকান। এ দোকান সে-দোকান ঘুরল। কাপড় দেখল, দাম-দর করল। কিন্তু কোনোটাই পছন্দ হল না। শেষে এসে ঢুকল আমার দোকানে।

তাড়াতাড়ি গদি থেকে উঠে এগিয়ে গেলাম।

তরুণী বলল, বেশি দামি কী কাপড় আছে, দেখান তো।

কী মিষ্টি গলা! আর কী চেহারা! পাতলা নেকাবের ভিতর দিয়ে রূপ যেন ফুটে বেরোচ্ছে। জোর করে ওর মুখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে আনলাম। বাক্স খুলে দামি দামি কাপড় ছড়িয়ে দিলাম সামনে।

একটা কাপড়ও পছন্দ হল না তার। বলল, এরচেয়ে ভালো আর কিছু নেই?

এরচেয়েও ভালো কাপড়! খুব পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে, বুঝলাম। বললাম, আমার কাছে তো নেই। তবে আপনি একটু বসুন। আমার পাশের দোকানটা এই বাজারে সবচেয়ে বড় কাপড়ের দোকান। দেশি-বিদেশি হরেক রকম দামি কাপড় আছে। পছন্দ হয় কি-না, দেখবেন।

বসল মেয়েটা। যেমনি মিশুক, তেমনি রসিক। বলল, কেন, অন্যের দোকানে যাবেন কেন? মেয়েদের কাপড়ের দোকান করেছেন, আর তারা কী চায় জানেন না?

নরম গলায় বললাম, কী জানি, মেয়েদের সঙ্গে মিশিনি তো কখনও। তারা কী চায়, জানি না। ওসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই।

চোখ বড় বড় করে তাকাল মেয়েটা, জানেন না! কেন বিয়ে করেননি এখনও?

হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালাম। নাহ্, তেমন সুযোগ এখনও হয়ে ওঠেনি। আর আমার মতো বুদ্ধুর গলায় ঝুলে মরতে আসবে কোন মেয়ে, বলুন?

চোখের বাণ ছুড়ল মেয়েটা। ও-মা, কিছু না জানেন না বললেন! এই তো বেশ কথা বলতে পারেন! কথার তীরেই তো ঘায়েল হয় মেয়েরা।

মুখ ফসকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, আপনি ঘায়েল হয়েছেন?

চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটা বলল, ও-মা, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল! ওই যে, দোকান খুলেছে। যান, একবার দেখে আসুন। ভালো কিছু থাকলে নিয়ে আসবেন। আমি এখানেই বসছি।

পাশের বড় দোকানটাতে গিয়ে ঢুকলাম। দোকানের সেরা কয়েকটা কাপড় নিয়ে ফিরে এলাম আবার। খুবই ভালো কাপড়, কয়েকটা পছন্দ করল মেয়েটা। মনে মনে হিসাব করলাম, দাম পাঁচ হাজার দিরহামের বেশি।

কাপড়গুলো আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল মেয়েটা, এগুলো বেঁধে দিন। সবগুলো নেব।

অবাক হলাম! এত টাকার কাপড় একসঙ্গে নিচ্ছে। কত ধনী!

সুন্দর করে বেঁধে কাপড়গুলো বাড়িয়ে দিলাম মেয়েটার দিকে। নিয়ে খোজা নফরের হাতে ওগুলো তুলে দিল সে। তারপর আর একটাও কথা না বলে উঠে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। খচ্চরের পিঠে চেপে চলে গেল। ফিরেও তাকাল না আর আমার দিকে।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, একেবারে বোকা বনে গেছি। কাজটা হল কী! দাম-দরের কথা কিছুই জিজ্ঞেস করল না, দিলও না। আমিও কিছু বলতে পারলাম না। আসলে বলার সুযোগই দেয়নি সে।

কম টাকার কাপড়! পাঁচ হাজার দিরহাম! তা ছাড়া অন্য দোকানের মাল। ভর্তুকি তো আমাকেই দিতে হবে। অনেক ভেবে পাশের দোকানে গিয়ে বাকি কাপড়গুলো ফেরত দিয়ে বললাম, কাপড়ের দাম এক হপ্তা পরে দেব।

ভাবলাম হয়তো দামের কথা ভুলে গেছে মেয়েটি। মনে পড়লেই কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে, কিংবা নিজে এসে দিয়ে যাবে। রোজই আশায় আশায় থাকি। আজ আসে কাল আসে করি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল সাত দিন। এল না সে। তাগাদা দিল পাশের দোকানদার। বলে কয়ে আরও এক হপ্তা সময় নিলাম তার কাছে।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল আরও ছদিন। এল না মেয়েটি। পরের দিন যদি না আসে, তাহলে দোকানদারের টাকা কোথা থেকে দেব, চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

পরের দিন খুব সকালে দোকান খুলে বসলাম। কী জানি, যদি এসে ফেরত যায় সে! সেদিন বেশি অপেক্ষা করতে হল না। এল সে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। দোকানে ঢুকেই একটা সোনার গয়না বের করে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বলল, নগদ টাকা তো আনিনি। এটা বেচে দোকানদারের পাওনা দিয়ে দিন।

গয়না বেচে দোকানদারের দেনা শোধ হয়ে গেল।

আরও কিছু কাপড় দেখতে চাইল মেয়েটা। পাশের দোকান থেকে আবার এনে দেখালাম। কিছু কাপড় পছন্দ করল সে। দাম হবে দশ হাজার দিরহাম। কাপড়গুলো বেঁধে দিলাম। নিয়ে আগেরবারের মতোই খচ্চরে চেপে চলে গেল মেয়েটা। না জিজ্ঞেস করল কাপড়ের দাম, না বলল কবে আসবে। আমিও মুখ ফুটে দাম চাইতে পারলাম না! বারবার ভেবেছি, বাকিতে আর দেব না কাপড়। কিন্তু সময়মতো কে যেন আমার মুখ চেপে ধরে রেখেছিল।

মেয়েটা চলে যাবার পর আফসোস করতে লাগলাম মনে মনে। গতবারে ছিল পাঁচ হাজার, এবারে দশ হাজার দিরহাম। নগদ টাকা আনেনি। গয়না বেচে দাম শোধ করল। কত রকমের ঠগ-জোচ্চোরের কথা শুনেছি। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কায়দা করে আমাকে ঠকিয়ে গেল না তো! ঠিকানাও রাখিনি! যদি আর না ফেরে, তো দেনার দায়ে লাটে উঠবে আমার দোকান। ভেবে, মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

যাই হোক, পাশের দোকানের যে কয়েকটা কাপড় তখনও রয়েছে আমার দোকানে, গিয়ে ফেরত দিয়ে এলাম। দামের কথা বলে এলাম। পরের সপ্তাহে দেব।

পরের সপ্তাহে দিতে পারলাম না টাকা। পারলাম না তার পরের সপ্তাহ, এমনকি তার পরের সপ্তাহেও। টাকার জন্য তাগাদা দিয়ে দিয়ে অস্থির করে তুলেছে আমাকে দোকানি। রীতিমতো ভাবনায় পড়ে গেলাম। আর এক সপ্তাহ সময় দিল

আমাকে দোকানি। যদি এই সময়ের ভিতর টাকা দিতে না পারি, আমার দোকান নিলাম করে নেবে সে।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল আরও এক সপ্তাহ। আগামী দিন দোকান নিলামে উঠবে আমার। মন খারাপ করে বসে আছি। নিজের বোকামির জন্য কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কী গাধামোই না করেছি! রূপ-যৌবন আর শাহী চালবোলে আমাকে মাত করে দিয়ে, দশ হাজার দিরহাম নিয়ে কেটে পড়ল কী সুন্দর!

নিজের কপালকে দোষ দিচ্ছি বসে বসে, এই সময় এসে হাজির হল খচ্চর। আগে পিছে দুই খোজা নফর। খচ্চরের পিঠে সেই রূপসী : গভীর কালো আয়ত দুই চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে।

খচ্চরের পিঠ থেকে নামল তরুণী। দোকানে ঢুকল। একটা থলে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বলল, সোনার মোহর। আপনার কাপড়ের দাম হয় কিনা দেখুন।

আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়িয়ে থলেটা নিয়ে খুলে ফেললাম। গুণলাম মোহরগুলো। কাপড়ের দাম হয়েও আরও অনেক বেঁচে যায়। সেগুলো আমাকে দান করে দিল মেয়েটা। খুশিতে ভরে গেল মন। এই মেয়েটাকে ঠগ ভেবেছিলাম! নিজের কাছেই লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দোকানির দশ হাজার দিরহাম বুঝিয়ে দিয়ে এলাম।

উসখুস করছে মেয়েটা। কী যেন বলি বলি করেও বলতে পারছে না।

জিজ্ঞেস করলাম, আরও কাপড় চাই?

হাসল মেয়েটা। এদিক-ওদিক মাথা দোলাল। বলল, না। তবে...তবে অন্য একটা জিনিস চাই।

বললাম, বলে ফেলুন। এই বাজারে থাকলে এখনি গিয়ে নিয়ে আসছি।

দ্বিধা করতে লাগল মেয়েটা। মনস্থির করে নিয়ে বলল, আপনি, আপনি বিয়ে করবেন না?

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরে যাওয়ায় একটু অবাকই হলাম, সে কপাল কি আমার আছে!

মেয়েটা বলল, কেন? এমন সুন্দর চেহারা...মেয়েরা তো পাগল হয়ে যাওয়ার কথা!

বললাম, কিন্তু কেউ তো হল না আজতক! কী করে বুঝব? বলতে বলতেই চোখ পড়ল একটা খোজার ওপর। এদিকেই তাকিয়ে আছে।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখ নামিয়ে মিটিমিটি হাসছে সে। আমার শেষের কথাটারই জবাব ঠিক করছে হয়তো মনে মনে।

খোজাটাকে দেখেই একটা কথা মনে হল। মেয়েটাকে বললাম, আপনি একটু বসুন। আমি আসছি।

বাইরে বেরিয়ে এক পাশে সরে ইশারায় ডাকলাম খোজাটাকে। কাছে এসে দাঁড়াল সে। আড়চোখে একবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একমুঠো মুদ্রা বের

করলাম। গুঁজে দিলাম তার হাতে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ভাই, একটা কাজ করতে পারবে?

মুদ্রাগুলো তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে খোজা জিজ্ঞেস করল, কী কাজ, মালিক?

বললাম, তোমার মালকিনকে বলবে, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। পারবে বলতে?

হাসল খোজা। বলল, বলার আর দরকার নেই, মালিক। ও তো আপনার প্রেমেই পাগল। ও কি কাপড় কিনতে আসে? আসলে কাপড় কেনার ওছিলায় দেখা করতে আসে আপনার সঙ্গে। কাপড়-গয়নার কোনো অভাব নেই ওর। এত আছে, রোজ একবার করে একটা কাপড় পরলে, সারাজীবন পরে শেষ করতে পারবে না।

আর কিছু শোনার দরকার মনে করলাম না। ফিরে এলাম গদিতে।

আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মেয়েটা। বলল, কী আলোচনা হল?

হেসে বললাম, আলোচনা আর কী? জানতে চাইছিলাম, আপনি কোথায় থাকেন?

মেয়েটা হাসল। বলল, সেটা তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন। শুধু শুধু এতগুলো পয়সা দিতে গেলেন কেন ওকে?

ভেবেছিলাম, খোজাকে যে পয়সা দিয়েছি দেখতে পায়নি ও। কথা কাটানোর চেষ্টা করে বললাম, না, এই সামান্য ঘুষ আর কি। আপনি আমার দোকানের বড় খদ্দের। কাপড় কিনতে এলেই যেন আপনাকে আমার দোকানে নিয়ে আসে...

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। কথা বলতে বলতে থেমে গেলাম আমি। সে বলল, খুব কাঁচা মিথ্যুক আপনি। আবার হাসল মেয়েটা। ভুরু কোঁচকাল। বলল, কেন? আমি না এলে খুব ক্ষতি হবে নাকি আপনার?

বললাম, তা তো কিছুটা হবেই। এতবড় খদ্দের আপনি...

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, কী জিনিস চাই, বললেন না?

চোখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটা। বলল, আরেকদিন বলব। আজ চলি। অনেক দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই।

বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরল মেয়েটা। পিছন থেকে ডেকে বললাম, ইয়ে...মানে, একটা কথা বলার ছিল...

ঘুরে তাকাল মেয়েটা বলল, কী কথা?

ইতস্তত করতে লাগলাম। বলতে গিয়েও পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, আপনার নফরকে বলেছি। সে-ই বলবে। আমি বলতে বলেছি তাকে। ওর ওপর চটবেন না।

স্থির চোখে আমাকে দেখল মেয়েটা। বলল, এমন কী কথা, সামনাসামনি আমাকে বলতে পারলেন না!

জবাবের অপেক্ষা করল মেয়েটা। কিন্তু আমি আর কিছু বললাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সে। চলে গেল খচ্চরে চেপে।

কয়েকদিন কেটে গেল। রোজই আশায় আশায় থাকি, আসবে মেয়েটা। সে আসতে না পারলে খোজাকে তো পাঠাবেই। কিন্তু কেউ আসে না।

কী জানি কী হল আমার, মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না মেয়েটাকে। তাকে এক নজর দেখার জন্য সারাক্ষণই পথের দিকে চেয়ে বসে থাকি। দোকানে খদ্দের এসে মাল চেয়েও আমার সাড়া পায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য শিকেয় ওঠার জোগাড়। বিরহ আর সইতে পারছি না, ঠিক এই সময় একদিন এসে হাজির হল খোজা।

খোজাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলাম। সে দোকানে ঢোকার আগেই আমি গিয়ে ধরলাম তাকে। উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলাম, তোমার মালকিন কোথায়? সে এল না?

খোজা বলল, আসবে কী করে মালিক, মালকিনের তো খুব অসুখ।

কলজেতে ছুরির খোঁচা খেলাম যেন। বুঝলাম, ভালোবাসা কাকে বলে। প্রেয়সীর অসুখের খবর শুনেই মোচড় দিয়ে উঠেছে বুকের ভিতরটা। উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলাম, কী...কী অসুখ?

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল খোজা। বলল, তা তো জানি না। হকিম সাহেব বলতে পারবেন।

এটা-ওটা আরও দুয়েকটা কথা বলে খোজাকে জিজ্ঞেস করলাম, তা তোমার মালকিনটি কে? কার মেয়ে? বাপের নাম কী?

খোজা বলল, সুলতানের বড় বেগমের পালিত মেয়ে। বড় মালকিনের কোনো সন্তান নেই, তাই ছোট মালকিনকে দত্তক নিয়েছেন। বেগমের বড় আদরের মেয়ে। তার কোনো আবদারেই না করতে পারেন না বেগম সাহেবা। এই তো কিছুদিন আগে মাকে ডেকে বলল ছোট মালকিন : আম্মা, এভাবে আর ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। খোজা দুটোকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি? রাজি হয়ে গেলেন বেগম সাহেবা। আমাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মালকিন। চলে এল বাজারে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাপড় কিনে বাড়ি ফিরে গেল মালকিন। কাপড় দেখে তার মা-ও খুব খুশি। তারপর থেকে কাপড় কেনার নাম করে দু'দিন বেরিয়ে এসেছে মালকিন। আপনার সাথে দেখা করেছে। আপনার প্রেমে সে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে।

একটু থামল খোজা। দম নিয়ে আবার বলল, শেষবার আপনার দোকান থেকে গিয়েই মনমরা হয়ে রইল মালকিন। খায় না দায় না, কারো সাথে কথা বলে না। সারাক্ষণই বসে বসে ভাবে। চিন্তিত হয়ে পড়লেন বেগম সাহেবা। মন খারাপ করে রাখে কেন, জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে। মেয়ে আপনার কথা জানাল। বেগম সাহেবা বললেন, আগে তিনি ছেলে দেখবেন। তাঁর যদি পছন্দ হয়, তবেই মেয়েকে বিয়ে দেবেন আপনার সঙ্গে। মালিক, আপনার কী মত? দেখা করবেন বেগম সাহেবার সাথে?

বলে ফেললাম, করব। কোথায়, কিভাবে তাঁর সাথে দেখা করব?

খোজা বলল, তাহলে আজ সন্ধ্যায় নদীর ধারে আসুন। বড় মসজিদে নামাজ পড়বেন। নামাজ শেষে শুয়ে থাকবেন মসজিদের বারান্দায়। তারপরের কাজ আমার।

মাথা কাত করে বললাম, ঠিক আছে। থাকব।

আমাকে সেলাম জানিয়ে চলে গেল খোজা।

বিকেলেই চলে গেলাম নদীর পাড়ে। মাগরেব পড়লাম, এশার নামাজ পড়লাম, তারপর শুয়ে রইলাম মসজিদের বারান্দায়। মুসুল্লিরা নামাজ শেষ করে যে যার মতো চলে গেছে। আমি একা। মনে মনে আল্লাকে ডাকছি, তিনি যেন আমার মনের আশা পূরণ করেন। রাত বাড়ছে। গভীর হল রাত। এই সময় প্রধান ফটকের কাছ থেকে ডাক শুনলাম, মালিক।

উঠে বসলাম। ফটকের দিকে তাকালাম।

আবার ডাক শোনা গেল, মালিক, আমি এসেছি।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলাম। খোজা দাঁড়িয়ে আছে ফটকের কাছে। আমাকে দেখেই বলল, চলুন।

খোজার পিছু পিছু চলতে লাগলাম।

মসজিদের ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল খোজা। ফিরে তাকিয়ে আমাকে আসুন বলেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল সে।

পানির ধারে এসে দাঁড়ালাম। কাছেই একটা নৌকা বাঁধা রয়েছে। শাহী বজরা।

খোজা ডাকল। জবাব শোনা গেল নৌকার ভিতর থেকে। বাইরে এসে দাঁড়াল এক কাফ্রি ক্রীতদাস। ভয়ঙ্কর চেহারা। কোমরে তলোয়ার ঝুলছে। ভয় পেয়ে গেলাম। মিথ্যে কথা বলে আমাকে এখানে আনেনি তো খোজা! সুলতানের বেগমের হুকুমে খুন করে নদীর পানিতে ফেলে দেবে না তো!

নৌকায় উঠে গেল খোজা। ডাকল, আসুন, মালিক।

উঠব কি-না, দ্বিধা করতে লাগলাম।

আবার ডাকল খোজা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, মালিক? আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

খোজার হাত ধরে নৌকায় উঠে এলাম। জনাকুড়ি গোলাম রয়েছে নৌকার ভিতর। আমি উঠতেই নৌকা ছেড়ে দিল মাঝি।

ছইয়ের ভিতরে না গিয়ে বাইরেই বসে রইলাম। সতর্ক থাকলাম। যদি দেখি আমাকে খুন করতে আসছে ওরা, আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব পানিতে।

কিন্তু না, আমাকে খুন করার কোনো ইচ্ছেই দেখাল না ওরা। অনেকক্ষণ পরে নৌকা এসে ভিড়ল মহলের ঘাটে। আমাকে নামতে বলল খোজা।

খোজার পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম। কত গলি কত ঘুপচি পেরিয়ে একটা বিশাল ঘরে এনে তুলল আমাকে খোজা। মেঝেতে ফরাস পাতা। ছাদ

থেকে ঝুলছে বিরাট ঝাড়বাতি। রঙিন মোম জ্বলছে। দামি আতরের সুবাস ভুরভুর করছে বাতাসে।

আমাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল খোজা।

বসে রইলাম। এরপর কী হবে, জানি না। অজানা আশঙ্কায় দুরুদুরু করছে বুক। যদি আমাকে পছন্দ না হয় বেগমের? যদি না হয়?

হঠাৎ খুলে গেল এক পাশের বিশাল দরজা। দুই সারিতে ঘরে এসে ঢুকল বিশজন বাঁদি। রূপের কমতি নেই এদেরও। ষোল থেকে বিশের ভিতরে সব ক'জনের বয়স। রঙিন আলোয় পরীর মতো লাগছে ওদেরকে। তফাৎ শুধু ডানা নেই।

দুই সারি বাঁদির মাঝ দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন বেগম। চোখ-ঝলসানো রূপ। গায়ে অনেক দামি পোশাক, অলংকার। চলনে বলনে প্রচণ্ড দাম্ভিকতা ফুটে বেরোচ্ছে। দেখে, ভয়ই পেয়ে গেলাম।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বিনীতভাবে সেলাম জানালাম।

গম্ভীর মুখে আমার সেলামের জবাব দিলেন বেগম। তীক্ষ্ণ চোখে আমার ওপর চোখ বোলালেন একবার। শান্ত গলায় হুকুম দিলেন, বস।

বসে পড়লাম। আমার খানিক দূরে বসলেন বেগম।

একে একে আমার নাম-ধাম, বংশ পরিচয়, পেশা সব জেনে নিলেন বেগম। সব জানা হয়ে গেলে বললেন, ভালোই মনে হচ্ছে।

বাঁদিদের একজনকে শরবত আনার হুকুম দিলেন বেগম। শরবত এনে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, শোন বাবা, আমার বড় আদরের মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেব। দেখো, তার যেন কোনো কষ্ট না হয়। সেটা আমি সইতে পারব না। দশ দিন পরে তোমাদের বিয়ে। এই দশ দিন তুমি এখানেই থাকবে।

মহলেই কাটিয়ে দিলাম দশটা দিন। এক মনোরম ঘরে আমার থাকার জায়গা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেবা-যত্নের কোনো অভাব নেই। রোজই আশা করি, এসে দেখা দেবে আমার প্রেয়সী। কিন্তু দশটা দিনে একবারের জন্যও এল না সে।

ঠিক দশ দিন পরে আমাকে তৈরি হতে খবর পাঠালেন বেগম। বাঁদিদের সঙ্গে হামামে গিয়ে ঢুকলাম। গোসল করলাম। আমাকে বরের সাজে সাজিয়ে দিল ওরা।

সারা মহল আনন্দে মুখর। মহা ধুমধামে বেগমের পালিতা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আমার। সুলতান বিয়েতে যৌতুক দিলেন দশ হাজার সোনার মোহর। বেগম সাহেবা দিলেন পঞ্চাশ হাজার।

সুলতানের মেয়ের বিয়ে, হোক না পালিতা, ধুমধামের কোনো কমতি রইল না। বিরাট সামিয়ানা টানানো হয়েছে। ফরাস পেতে দস্তরখান বিছানো হয়েছে। মেহমানরা সব সারি দিয়ে বসেছে দস্তরখানের সামনে। আমাকে নিয়ে গিয়ে বসানো হল মঞ্চে। সে এক এলাহি কাণ্ড। যেদিকে তাকাই, শুধু খাবারের স্তূপ। এর আগে

চোখেও দেখিনি এমন ব্যাপার। মাংস দিয়ে তৈরি নানারকম খাবার, পোলাও, বিরিয়ানি, মিষ্টি, ফল এনে জমিয়ে রেখেছে গোলামেরা।

খাওয়া শুরু হল। শাহী খাবার। যেটা মুখে দিই, সেটাই ভালো লাগে। সব খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এই সময় এল, আমার প্রিয় খাবার জিরবাজা। অন্যসব খাওয়া বাদ দিলাম। যত পারলাম, জিরবাজা খেতে লাগলাম। খেতে খেতে পেটে আর এক বিন্দু জায়গা রইল না। আড়চোখে অনেকেই আমার খাওয়া দেখছে। দুয়েকটা মন্তব্যও কানে এসেছে, একটা আস্ত রাক্ষস!

খাওয়া শেষ হল। এত খেয়েছি, উঠে গিয়ে হাত ধুতে ইচ্ছে হল না। রুমাল দিয়ে হাত-মুখ মুছে চুপ করে বসে রইলাম।

বিয়ে শেষ, খাওয়া শেষ। একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল মেহমানরা। রাত বাড়ল। আমাকে নিতে এল বাঁদি আর শাহজাদির সখীর দল।

বাসরঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ফুলের বিছানায় ফুটে আছে যেন ফুলের রানী। আমি ঢুকতেই মুখ তুলল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার গাল। মুখ নিচু করল আবার।

সখীরা গিয়ে পাকড়াও করল তাকে। হেসে ঠাট্টা করল, কী লো, সই, মনের মানুষকে দেখে এত লজ্জা পাবার কী আছে? আর খানিক পরেই তো মিলেমিশে এক হয়ে যাবি!

ওড়নার ঘোমটার আড়াল থেকে মৃদু ধমক লাগাল শাহজাদি, এই তোরা যাবি এখান থেকে!

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়ের দল। বলল, যাচ্ছি লো, যাচ্ছি! তা এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন? সারাটা রাতই তো পড়ে আছে সামনে।

নানারকম হাসিঠাট্টা করতে করতে চলে গেল মেয়ের দল। বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল বাঁদি।

বিছানায় গিয়ে উঠলাম। দু'হাতে নতুন বিবিকে টেনে নিলাম বুকে।

আমার বুকে এলিয়ে পড়ল বিবি।

দু'হাতে ওর মুখ তুলে ধরে চুমু খেতে গেলাম। আগ্রহের সাথে মুখ উঁচু করল সে-ও। পরক্ষণেই এক ঝটকায় আমার হাত সরিয়ে দিয়ে ছিটকে সরে গেল দূরে। চেঁচিয়ে উঠল, ও মাগো! কী বিচ্ছিরি গন্ধ! ওয়াক থুহ্! বমি করে ফেলব!

এক ঝটকায় খুলে গেল ঘরের চারপাশের সব দরজা। ছুটে এল দাসী-বাঁদিরা। উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল, কী...কী হয়েছে, মালকিন?

নেচে-কুঁদে বাড়ি মাথায় তুলেছে তখন শাহজাদি। চেঁচাচ্ছে, ওটা একটা অসভ্য জংলি জানোয়ার! হাতেমুখে কী বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ! বমি এসে যাচ্ছে আমার! আগে কি জানতাম, ওটা একটা বনমানুষ! ওলো, তোরা এই গাধার বাচ্চার হাত থেকে বাঁচা আমাকে! খাটাশটার কাছে থাকলে নির্ঘাত মরব আমি! হায় হায় আল্লা, এ কী করলাম! একটা শয়তান বদমাইশ জানোয়ারকে বিয়ে করে বসলাম!

থ হয়ে গেছি আমি তখন। নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এই কি একটু আগের শাহজাদি, লজ্জাবতী লতা, ফুলের রানী! একে দেখেই কি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম! আমার দোকানে শুধু আমাকে এক নজর দেখার জন্য, দুয়েকটা কথা শোনার জন্য হাজার দিরহামের কাপড় কিনতে যেত।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শাহজাদি।

এগিয়ে গেলাম। কিছু একটা বলে শান্ত করতে চাইলাম ওকে, বোঝাতে চাইলাম।

কিন্তু আমার মুখ থেকে কথা বেরোতেই সাপের মতো হিসিয়ে উঠল, শাহজাদি। তুই চুপ কর্ ইতরের বাচ্চা। তোর কোনো কথাই আর শুনতে চাই না আমি! জিরবাজা খেয়েছিস, রাক্ষস কোথাকার! জানিস না, জিরবাজা দেখতে পারি না আমি! আর খেয়েছিস যদি, ভালো করে হাত-মুখ ধুসনি কেন?

আমি কী করে জানব, জিরবাজা খেতে পছন্দ করে না শাহজাদি? কী করে জানব মসলার গন্ধে বমি এসে যায় তার? চুপ করে রইলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও খেপে গেল শাহজাদি। চেঁচিয়ে হুকুম দিল বাঁদিদের, জলদি যা, একটা চাবুক নিয়ে আয়!

একজন বাঁদি চাবুক নিয়ে এল। তার হাত থেকে চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল শাহজাদি। হাঁ করে তাকিয়ে আছি ওর দিকে, ওর হাতের চাবুকের দিকে। হঠাৎ নড়ে উঠল শাহজাদির হাত, বিষাক্ত গোক্ষুরের মতো হিসিয়ে উঠল চাবুক। তীব্র ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলাম।

মাথার উপর ঝাড়বাতি উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে, কিন্তু আমার চোখে সব আঁধার। কানে আসছে শুধু চাবুকের তীক্ষ্ণ শনন। প্রথমবার আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, তারপরে একেবারে চুপ করে গেলাম। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছি সব যন্ত্রণা। হঠাৎ আমার দু'পায়ের ফাঁকে এসে আছড়ে পড়ল চাবুক। আর সইতে পারলাম না, হুঁশ হারালাম।

হুঁশ ফিরলে দেখলাম, মেঝেতেই পড়ে আছি আমি। মাথার উপরে তেমনি জ্বলছে ঝাড়বাতি। রঙিন মোম মায়াময় স্বপ্নপুরী সৃষ্টি করে রেখেছে তখনও ঘরটাকে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। পালঙ্কে উঠে বসেছে শাহজাদি। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে বাঁদিরা।

আমাকে তাকাতে দেখেই আবার চেঁচিয়ে উঠল শাহজাদি, কুকুরটার হুঁশ ফিরেছে। যা, ওকে কোতোয়ালের কাছে দিয়ে আয়। যে হাত দিয়ে জিরবাজা খেয়েছে, ওই হাতটা কেটে ফেলতে বলবি।

শাহজাদির রায় শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

আমার অবস্থা বুঝতে পারল বাঁদিরা। অনুরোধ করল শাহজাদিকে, এবারের মতো ছেড়ে দিল, মালকিন। প্রথমবার তো, যথেষ্ট সাজা হয়েছে। এরপরে আর যদি কখনও খায়, তো যা খুশি সাজা দেবে।

বাঁদিদের কথায় একটু নরম হল শাহজাদি। বলল, বেশ সবাই যখন বলছিস, হাত কাটাব না ওর। তবে একবারে ছেড়ে দেয়া যায় না। কিছু একটা শাস্তি দিতেই হবে, যেন জীবনে জিরবাজা খাবার নামও মুখে না আনে।

যে মার খেয়েছি এমনিতেই জিরবাজা খাবার নাম আর মুখে আনতাম না জীবনে।

শাহজাদি হুকুম দিল, দড়ি নিয়ে আয়। ধার দেখে একটু ছুরিও আনবি।

হাত কাটবে না শুনে ভয় একটু কমেছিল, ছুরি আনার কথায় আবার দুরুদুরু করে উঠল বুকের ভিতর। না জানি কী কাটে এবার!

বাঁদিরা ফিরে আসতেই আমাকে বেঁধে ফেলার হুকুম দিল শাহজাদি। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করল বাঁদিরা। একজনকে বলল শাহজাদি, ওর হাত-পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে ফেল।

হাত কাটার চেয়ে কম কী হল, বুঝতে পারলাম না। ছুরি হাতে এগিয়ে এল বাঁদি। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

কচ্ করে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে নিল বাঁদি। আর্তনাদ করে উঠেই আবার হুঁশ হারিয়ে ফেলাম।

দ্বিতীয়বার হুঁশ ফিরলে দেখলাম, পালঙ্কে পড়ে আছি। হাত-পায়ে বাঁধন নেই। বুড়ো আঙুলগুলোও নেই। পরে শুনেছি, ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছে আমার বিবি। রাত শেষ হয়ে এসেছে। বাকি রাতটুকু ওই বিছানায়ই পড়ে পড়ে কোঁকালাম। এভাবেই কাটল আমার বাসররাত।

দশ দিন দশ রাত ওই ঘরেই কাটিয়ে দিলাম। আমার দেখাশোনা করে যায় বাঁদিরা, খাবার দিয়ে যায়। আস্তে আস্তে ক্ষত শুকিয়ে গেল। ভালো হয়ে উঠলাম।

দশ দিনের দিন রাতে এল শাহজাদি। বাঁদিরা তো এলই, সখীরাও এল সঙ্গে। সবাই এসে ঘিরে ধরল আমাকে।

আঙুল তুলে শাসিয়ে বলল শাহজাদি, কি? আর খাবে জিরবাজা?

জবাব দিতে দেরি করলে আবার কোন শাস্তি দিয়ে বসে কে জানে? ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, শাহজাদি, না। আর কখনও জিরবাজা খাব না। আল্লাহর কসম!

ধমকে উঠল শাহজাদি, কি, অ্যাঁ! বিবিজান বলতে মুখে বাধছে?

হেসে উঠল সখীরা। শাহজাদিকে ওই ঘরে রেখে সবাই চলে গেল। শাহজাদির ইচ্ছেতেই সে রাতে তার সঙ্গে রাত কাটালাম।

কয়েক মাস কেটে গেল। এই কয়েক মাস মহলেই রয়ে গেলাম। তারপর একদিন শাহজাদি বলল, এভাবে ঘরে বসে বসে খাচ্ছ, লজ্জা করে না? নিজে কিছু করার চেষ্টা কর।

বললাম, তাহলে আজই দোকানে গিয়ে বসি?

খেঁকিয়ে উঠল শাহজাদি, এহ্, যা দোকান! ওসব বাদ দাও। টাকা দিচ্ছি। অন্য কোনো ভালো ব্যবসা ধরো। তা ছাড়া এ মহলেও আর থাকা চলবে না। ঘরজামাই থাকতে লজ্জা করে না?

বিয়ের সময় যৌতুক পেয়েছিলাম ষাট হাজার মোহর। আরও অনেক টাকা দিল বিবি। সেই টাকায় ভালো দেখে একটা ইমারত কিনলাম। বড় ব্যবসা ফাঁদলাম বাজারে।

মাঝে মধ্যে এক-আধটু শাসন করে বটে বিবি, তবে ভালোই কাটছিল আমার দিন। হঠাৎই কঠিন অসুখে মারা গেল আমার বিবি। শোকে-দুঃখে মন ভেঙে গেল আমার। বাড়িঘর-ব্যবসা সব বেচে দিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতেই একদিন এদেশে এসে পৌঁছেছি।

বাবুর্চি বলল, যুবকের কাহিনী এখানেই শেষ, হুজুর। তাজ্জব ব্যাপার না?

ঠোঁট ওল্টালেন রাজা। বললেন, দূর দূর, এ আবার আশ্চর্য হল নাকি? একটা কাপুরুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে আরেকটা অহঙ্কারী মেয়েমানুষ, এ তো জানা কথাই। এতে আশ্চর্যের কী দেখলে?

মুখ কালো করে একপাশে সরে দাঁড়াল বাবুর্চি।

বাবুর্চি সরে দাঁড়াতেই হকিম এগিয়ে এল। হাতজোড় করে বলল, 'দুজনের গল্প তো শুনলেন, হুজুর। এবার আমাকে যদি বলতে দেন...

হকিমের কথায় বাধা দিয়ে বললেন রাজা, 'আপনার গল্প কি আগের দুজনের চেয়ে ভালো হবে?'

হকিম বলল, 'হুজুর আগে শুনুন। তারপর বিচার করবেন, ভালো কি মন্দ।'

অনিচ্ছা থাকলেও মাথা নেড়ে বললেন রাজা, 'ঠিক আছে, বলুন। তবে কম কথায় শেষ করবেন।'

তার কাহিনী শুরু করল হকিম :

(পরের কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডে)

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET